চরিত্র

মানিকপুর

বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জে - অবস্থাপন্ন গৃহস্থ
বাসনাময়ী—বেণীমাধবের স্ত্রী
নীরোদাসুন্দরী—বেণীমাধবের বোন, স্বামী—শ্রীধর চাটুজ্জে
স্বর্ণমঞ্জরী—বেণীমাধবের ভাগ্নী, শ্রীধর চাটুজ্জের মেয়ে
কালিদাসী—বেণীমাধবের ঝি
যশোমতী ও হরিমতী—গাঙ্গুলীবাড়ির অনূঢ়া কুলীন-কন্যা
কৃপাসুন্দরী—যশোমতীদের মা
চণ্ডীচরণ মিত্র—গরীব গৃহস্থ
মোক্ষদাসুন্দরী—চণ্ডীচরণের স্ত্রী
মানময়ী—চণ্ডীচরণের মেয়ে
ভবতারণ ঘোষ—চণ্ডীচরণের জামাই
গোবিন্দ—চণ্ডীচরণের ছেলে, সর্বময় চৌধুরীর জামাই
গিরিবালা—মানময়ীর সখী (বিধবা)
দীনু কোবরেজ—গ্রামের কবিরাজ
উমাচরণ—দীনু কোবরেজের সেজছেলে
মনোমোহিনী—দীনু কোবরেজের স্ত্রী
প্রাণকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান

বল্লভপুর

লোহারাম বাঁড়ুজ্জে—অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ গৃহস্থ
বিরাজমনি—লোহারামের স্ত্রী
ইন্দুমতী—লোহারামের বড়মেয়ে
কাশীনাথ গাঙ্গুলী—ইন্দুমতীর স্বামী
বিন্দুবাসিনী—লোহারামের ছোটমেয়ে
মানিক মুখুজ্জে—বিন্দুবাসিনীর স্বামী, গানাবাবুর মোসাহেব
গোপীচরণ—লোহারামের কর্মচারী (ডানহাত কাটা)

চরিত্র

ফুলপুর

সর্বময় চৌধুরী—ফুলপুরের জমিদার
কৃপাময়ী – সর্বময়ের স্ত্রী
স্নেহলতা—সর্বময়ের মেয়ে
পরাণ মিত্তির—জমিদারের গোমস্তা
রাধারাণী—সর্বময়ের আশ্রিতা (বিধবা)
শ্রীধর চাটুজ্জে—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ
মানদাসুন্দরী শ্রীধরের স্ত্রী
লাবণ্যপ্রভা—শ্রীধরের আর এক স্ত্রী
চঞ্চলা—মানদার মেয়ে
অভয়চরণ—গ্রামের মুদী
পদ্ম বৌ—ভরার মেয়ে
ঈশান গাঙ্গুলী, দীনু বিশ্বাস,
হরিহর চাটুজ্জে, হালদার খুড়ো,
শম্ভুচরণ, গৌর—গ্রামবাসীরা
কার্তিক, গণেশ, মহেশ, কালিচরণ,
গোবর্ধন, জগন্নাথ, পতিতপাবন—গ্রামের ছেলেরা

গৌরহাটি

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়,
বংশীবদন—গ্রামবাসী

কলকাতা

জনসন—পদস্থ ইংরাজ কর্মচারী
কিটি—জনসনের বোন
রাধাবল্লভ শেঠ—ধনী আড়তদার
সতীশ সরকার, রাখাল, ব্রজেশ্বর, হরেকৃষ্ণ
—রাধাবল্লভের কর্মচারীরা
গানাবাবু—কলকাতার বাবু
ফুলবাবু—গানাবাবুর মোসাহেব

পথে

রাখাল, মধুভাতী, ঘোড়াওলা, হারান, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি

"এক বর অনেক কনে"
কুমারেশ ঘোষ

এক বর অনেক কনে-র যুগে—
স্বনামধন্যা সুলেখিকা
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী
প্রীতিভাজনেষু—

এই লেখকের অন্য বই

উপন্যাস ॥ নীল ঢেউ সাদা ফেনা, সাগর-নগর, বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস,
দেখা-অদেখা, মধুরেণ, হবে তবে পরে, কলকাতা কলকাতাই,
জলযৌবনা।

গল্প ॥ কাঠের ঘোড়া, হাস্যকর গল্প, ফোঁটা ফোঁটা গল্প,
ছোটদের মজার গল্প, ছোটদের আজগুবি গল্প।

অনুবাদ ॥ সালোম, ফার্স্ট-ফার্স্ট, বেনহুর ও লাণ্টডেজ অব পম্পিয়াই।

নাটক ॥ যম, চক্র, ম্যানিয়া, ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল, মনীষী নাটিকা,
চারণকবি মুকুন্দদাস।

রম্যরচনা ॥ ইত্যাদি, স্বামীপালন পদ্ধতি, যদি গদি পাই, ফলন্ত ফুটপথ।

ভ্রমণ কাহিনী ॥ পথ চলাতেই আনন্দ, নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস, ইংরেজের দেশে,
সবুজ রাশিয়ায়, দমদম থেকে দামাস্কাস, জাপান-জাপানী।

কবিতা ॥ কটাক্ষ, নতুন মিছিল, কখনো মেঘ কখনো তারা।

বিবিধ ॥ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (গদ্যরূপ), একালের কার্টুন, চিন্তন (প্রবন্ধ),
চালচলন (ভদ্রতার বই), আড্ডার অভিধান (রক-ভাষা)।

১

মানিকপুর গ্রামে বামুনপাড়ার বেণীমাধব বাড়ুজ্জের বাড়িতে শাঁখ বেজে
উঠলো। বিয়ে।

বেণীমাধবের ভাগ্নী স্বর্ণমঞ্জরীর বিয়ে আজ। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়ের
শাঁখ বাজাবার সৌভাগ্য খুব কম গৃহস্থেরই হয়। ঘরে পাত্রী মজুত থাকলেও
পাত্র কোথায়, কুলীন পাত্র? কুলীন পাত্রের দর অনেক, কদর আরো বেশি।
আদর যত্ন এক সমারোহের ব্যাপার।

২

বেণীমাধব তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের কথা বহুবার তাঁর ভগ্নীপতিকে মনে করিয়ে
দিয়েছেন। বহুদিন হাঁটাহাঁটিও করেছেন, প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ দূরে ফুলপুর
গ্রামে মহাকুলীন শ্রীধর চাটুজ্জের বাড়িতে। কয়েকবার গিয়ে দেখাও হয়নি,
শুনেছেন ক'দিন হলো তিনি অন্য কোনো গ্রামে গেছেন কোনো কুলীন-কন্যার
আইবুড়ো নাম ঘোচাবার জন্যে। অবশ্য সেই কন্যার পিতার করুণ আবেদনে
এবং মোটা দক্ষিণায় বিগলিত হয়েই তিনি ঐ সৎকার্যে শুভযাত্রা করেছেন।
অগত্যা বেণীমাধবকে দু'একদিন ভগ্নীর শ্বশুরবাড়িতে ভগ্নীপতির আগমনের
অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, কারণ অতটা পথ ফিরে গেলেও আবার তো সেই
আসতেই হবে স্বর্ণর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করতে। অতএব থেকে
যাওয়াটাই ভালো।

ভালো খুব নয়। কারণ, ভগ্নী নীরোদাসুন্দরী ফুলপুরে তার শ্বশুর-
বাড়িতে থাকে না, বিয়ের পর থেকেই আছে ভাইয়ের কাছে—বেণীমাধবের
গৃহেই। এক্ষেত্রে ভগ্নীহীন ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ি কোনরকমেই আকর্ষণীয় নয়।
তবু দায়ে পড়ে থেকে যাওয়া। বিশেষ করে এই যে এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসা,
তা শুধু তাঁর ঘরণী শ্রীমতী বাসনাময়ীর সরোষ এবং তীব্র বাসনায় তাড়নায়।
কাজেই ভাগ্নী স্বর্ণর বিয়ের ব্যাপারে কোনো আশান্বিত খবর না-নিয়ে ভগ্নদূতের
মত বাড়ি ফিরে যাওয়া মানে শ্রীমতী বাসনাময়ীর ধারালো রসনার সামনে গিয়ে
দাঁড়ানো। তার চাইতে বুঝি ফাঁসির ফাঁসের সামনে দাঁড়ানো ঢের সহজ।

কুলীনপ্রবর শ্রীধর চাটুজ্জে বাইরে বহু কুলরক্ষা করলেও নিজের পৈ ভিটেয় 'কুললক্ষ্মী'র আসন পাততে ভোলেননি। একটি নয়, একজো 'কুললক্ষ্মী' সাদরে এবং সসম্মানে তাঁর ভিটেয় প্রতিষ্ঠিতা। এঁদের একজ অর্থ ও অলংকারের বাক্সের উপর অধিষ্ঠিতা, অন্যজন রূপের সিংহাসনে। রাত্রে শয্যায় এবং দিনে রান্নাঘরের জন্যেও তো সেবাদাসী দরকার। মানদা-সুন্দরী ধনী কুলীনের একমাত্র কন্যা। রূপ যত না থাকুক, যায়-যায়-যৌবন এখনো ওঁর সর্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত। আটবছরের চণ্ডসার মা তিনি। চণ্ডুকে ভালোবাসেন শ্রীধরও। তাই বাছুরের মায়ায় গাভীকেও ঘরে রেখেছেন। আর লাবণ্যপ্রভা রীতিমত রূপসী, যৌবনবতীও—অতএব শ্রীধর চাটুজ্জে তাঁ শ্রী-[illegible]রই পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মাঝখানে শ্রীধর [illegible] [illegible]াল তবিয়তেই বিরাজমান। আর এঁদের মাঝখানে গরীব কুলীন ব্রাহ্মণের ভগ্নী রূপে-গুণে অতি সাধারণ নীরোদাসুন্দরীর আসন না থাকারই কথা। তবে দুই সপত্নী যখন এঁর-ওঁর কেশরাশি প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কাংস্যকণ্ঠে সরবে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় ধরাশায়িনী হয়ে সতীনোচিত আচরণ পালন করেন তখন তাঁদের স্বামীদেবতা বুদ্ধিমানের মত কিছুক্ষণের জন্যে ভিটেছাড়া হয়ে থাকেন, (অবশ্য, কোন বিবাহ উপলক্ষে বাড়ি না থাকলে তো কথাই নেই।) সতীন-শ্রাদ্ধ বর থেকে উঠোন পর্যন্ত গড়ালেও প্রায় ঘরোয়া হয়েই থাকে। অন্যথায় গৃহে অপার শান্তি।

শ্রীধরের গৃহে ভগ্নী না থাকলেও বেণীমাধব যে কয়বার এ বাড়িতে এসেছেন, তেমন আদর না পেলেও অন্নের অব্যবস্থা হয়নি। অমন যুগল কুলবধূ থাকায় অতিথির অকূলে পড়বার কথা নয়। তাছাড়া ঘরেই যখন মরাইভরা ধান আছে, পুকুরে মাছ আছে, গোয়ালে গরুও আছে। আর বাড়িতে সরকার, মহুরী রাখাল প্রভৃতি আর পাঁচজন পোষ্যেরও অভাব নেই। তাদেরও তো পা' পড়ে বাইরের বারান্দায়।

তা শেষপর্যন্ত শ্রীধর চাটুজ্জের সঙ্গে দেখাও হয়েছে বেণীমাধবের। কিন্ শ্রীধর সহজে আমল দেননি তাঁকে। এঁড়িয়ে গেছেন। প্রথমবার তো বলেই বসেছিলেন, ভাগ্নীর সম্বন্ধের জন্যে এসেচো বাঁড়ুজ্জে, কিন্তু বলো দেখি মেয়েটা কি সত্যি আমারই?

শুনে বেণীমাধব কপালে চোখ তুলে বলেছিলেন, বলেন কি চাটুজ্জেমশায় সেই যে সেবার আষাঢ় মাসে বড় বানের সময় কাছেই হরিপুরে কুলরক্ষা ক ফেরবার পথে বিষ্টি মাথায় করে এলেন আমাদের বাড়িতে, রাত্তিরটা

ছিলেনও, তারপরেই তো নীরোদা হলো গর্ভবতী—তা প্রায় পাঁচ-ছ বছর হলো বৈকি।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখি খাতাখানা। 'ঘরে গিয়ে শ্রীধর পুরোনো জাবদা খাতাখানা দেখলেন ভালো করে এবং বাইরে দাওয়ায় এসে বললেন, হ্যাঁ দেখচি বটে খাতায় লেখা আছে।

—আর আমি তো পরে এসে খবরও দিয়ে গেচি নীরোদার একটি মেয়ে হয়েচে। কাঁচা সোনার মত রং হয়েচে গায়ের। নাম রেখেচি সন্ন—সন্নমঞ্জরী।—বেণীমাধব মুখর হয়ে উঠলেন।

কিন্তু শ্রীধর বললেন, আমার কি আর অতশত মনে-টনে থাকে বাপু। বয়েস তো বাড়চে, সব গুলিয়ে যাচ্চে ভায়া।

বেণীমাধব হেসে বললেন, তা তো বটেই।

তার পরের বার বেণীমাধব শ্রীধরের কাছে এসে বললেন, সন্ন তো ডাগর-ডোগরটি হলো, গিন্নী পাঠালেন আপনার কাছে, এবার একটা বিয়ের চেষ্টা করা তো দরকার—

শ্রীধর নির্লিপ্ত প্রশ্ন করলেন, বয়েস কত হলো?

—এই আটেতে পা দিয়েচে।—বেণীমাধব বললেন।

শুনে ঠোঁট উলটে শ্রীধর বললেন, মাত্তর!

—মাত্তর কি চাটুজ্জেমশায়!—বেণীমাধব বললেন, এখন কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ। জানেন তো ব্যাসদেব বলে গেছেন—

যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা
ভ্রূণহত্যাশ্চ তাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ॥

মানে—

—রাখো তোমার মানে!—শ্রীধর থামিয়ে দিলেন বেণীমাধবকে: কুমারী অবস্থায় মেয়ে যতবার রজস্বলা হবে ততবার তার বাপের ভ্রূণহত্যার পাপ হবে, এই তো বলতে চাও? কিন্তু মনুও নির্গুণ পাত্রে কন্যাদান অবিধেয় বলেচেন, তা জানো?

—তা বলে!—বেণীমাধব মাথা চুলকোতে লাগলেন।

—তা বলে মুচি মেথর বা ডোমের হাতে তো মেয়ে দিতে পারিনে।—শ্রীধর বললেন।

থতমত খেয়ে বেণীমাধব বললেন, তা তো বটেই। তবে কিনা গৌরীদানের পুণ্য···

শ্রীধর হেসে বললেন, সে কি আর আমি বুঝিনে বাঁড়ুজ্জে। গৌরীদান করতে পারলে আমার পুণ্য হয় আর তোমার সংসারেও খাওয়া-থাকার একটা লোক কমে। এক ঢিলে দিব্যি দু'পাখি—

বেণীমাধব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ও কি বলচেন চাটুজ্জেমশায়! সন্ন চলে যাবে, সে তো স্বপ্নেও এতদিন ভাবিনি—

শ্রীধর হাসলেন: স্বপ্নে কেন বাস্তবেও তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। স্বর্ণ তোমার স্বর্ণমন্দিরেই আজীবন কাটাবে হয়তো—কুলীনের মেয়ে না সে!

বেণীমাধব মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ, সে তো আমার ভগ্নীও আমার ওখানেই···। আপনি তো তাকে আনালেনও না—

—কী করবো?—শ্রীধর বললেন, কতজনকে ঘরে এনে রাখি, বলো? তোমার ভগ্নীকে যদি আনি, তাহলে এ বলবে আমিও যাবো, ও বলবে আমিও যাবো, তখন? শেষে হাট বসে যাবে যে!

—তা বটে!—সায় দিলেন বেণীমাধব।

—আর আমি এমন নবাব-বাদশা নই যে তাদের জন্যে আলাদা মহল তৈরি করে সেখানে খোজা-পাহারা বসাবো আর দু'বেলা বসে খাওয়াবো।—বলেই শ্রীধর প্রশ্ন করলেন, আর সে রকম কি কথা ছিলো?

—না, তা নয়।—থতমত খেলেন বেণীমাধব।

—গৃহস্থের কুলরক্ষা করতে যাই, কুলরক্ষা করে আসি, দক্ষিণাও পাই। ব্যস্—শ্রীধর বললেন, তবু তো তোমাদের ওখানে এক রাত্তির কাটিয়েছিলাম।

—তাইতো সন্নকে পেলাম।—বেণীমাধব বললেন, তা আর একদিন গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো—

শ্রীধর হো হো করে হেসে উঠলেন: এইবার হাসালে বাঁড়ুজ্জে! খাতাটা দেখবে, খাতা? পরশু যেতে হবে এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে এক গাঁয়ে। তারা মোটা দক্ষিণে দিয়ে অনেক করে সেধে গেচে। সেখানে এক রাত্তির থেকে যেতে হবে আরো পশ্চিমে ক্রোশ দুয়েক দূরে আর এক গাঁয়ে—তারাও টাকাকড়ি দিয়ে সাধাসাধি করে গেলো। আর পারিনে বাপু, বয়েস তো হচ্চে।

—তা তো ঠিকই।—বেণীমাধব ঘাড় নাড়লেন।

—আর তুমি তো বাঁড়ুজ্জে নিজেও কুলীন। সবই তো জানো। তোমাকে আর বুঝিয়ে বলবো কি?—বলেই শ্রীধর হেসে বললেন, বলি তোমার ক'ঘর হলো?

—তা এক কুড়ি পাঁচ সাত ঘর হবে।

—মাত্তর!—শ্রীধর ঠোঁট ওলটালেন: এখনো নাবালক আছো বলো! আমি এ পর্যন্ত কটা করেচি জানো?

—কটা চাটুজ্জেমশায়?—উৎসুক হলেন বেণীমাধব।

—কিন্তু তার আগে বলো তো আমার বয়স কত?—প্রশ্ন করলেন শ্রীধর।

—কত আর হবে, এই ষাটের কাছাকাছি—

শুনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন শ্রীধর: কী যে বলো! কেন, চেহারা কি আমার এতই বুড়োটে বলে মনে হয়?

—তা না, তবে—

—তবে শোনো—শ্রীধর বললেন, বয়েস আমার পঞ্চাশের এপারেই। তাই ঘরে দুটিকে সামাল দিয়েও বাইরে কুলরক্ষা করতে পারি। এ বয়েসে তাইতো দু'কুড়ি চারটে কুলীন-কন্যার জাত-মান রেখেচি—এখনো কটা···! আর আমার ঠাকুর কটি করেছিলেন জানো?

বেণীমাধব জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শুধু।

শ্রীধর বললেন, পিতৃদেব মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়েসেই চার কুড়ি তিনটে বিবাহ করেছিলেন।

বেণীমাধবের কিন্তু এসব আলোচনায় মন ছিলো না ততো। নিজে কুলীন, কাজেই কুলীনের ব্যাপার তাঁর কাছে অজানা নয় কিছু। বরং এতটা পথ যেজন্যে কষ্ট করে আসা, সে আলোচনা হতে-হতেও মোড় ঘুরে যাচ্ছে। তাই বেণীমাধব বললেন, কিন্তু সন্নর বিয়েটা—

উত্তরে শ্রীধর বললেন, দেখো বাঁড়ুজ্জে, স্বর্ণর বিয়ে দেওয়া দরকার তা আমি বুঝি। কিন্তু ধেড়ে ধেড়ে সব আইবুড়ো কুলীনের মেয়েদের তাল সামলাতেই পারচে না কুলীনের ছেলেরা, কাজেই কে যাবে বলো ঐ পুঁচকে মেয়ের মাথায় সিঁদুর পরাতে। আর আমিই বা কোথায় পাত্র পাই বলো? কুলীনের মেয়ের খোঁজ যদি চাও, বরং দিতে পারি, কুলীন পাত্তর কোথা পাই এখন? আর কার পায়েই বা ধরতে যাবো বলো?

—কিন্তু মেয়ে তো আপনার!

—আহা, সেটা আর কে অস্বীকার করচে!—শ্রীধর বললেন, বললে যখন আমার মেয়ে, মেনেই তো নিলাম। ওসব তুমিই একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখো বাপু। বরং বিয়ের সময় সামনে দাঁড়িয়ে আসবো কিছুক্ষণ, তাতে লোকসমাজে দেখাবে ভালো।

বেণীমাধব বুঝলেন মাটি বেশ শক্ত। পাকা কুলীনের মতই বিয়ে করার কর্তব্যটুকু সেরে প্রাপ্য দক্ষিণা নিয়েই শ্রীধর চাটুজ্জে খালাস। তার বেশি গলা বাড়াতে রাজি নন। অতএব এখানে আর সময় নষ্ট করা বৃথা। তাই উঠে দাঁড়ালেন বেণীমাধব।

—তবে আসি এখন চাটুজ্জেমশায়।

—সেকি!—শ্রীধর বললেন, এখনি উঠবে কেন? এই সন্ধ্যের মুখে বেরুলে তোমাদের গ্রামে পৌঁছুতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে। বরং রাতটা এখানেই কাটিয়ে ভোরের দিকে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রওনা দিয়ো।

—না দাদা, এখনিই যাই।—বেণীমাধব বললেন, পথে একটু কাজ আছে। যদি দরকার মনে হয় তো সেখানেই রাতটা—

—অ। তা বেশ বেশ!—শ্রীধর হেসে উঠলেন: সেখানেই বরং কাজ সেরে রাত কাটিয়ে বাড়ি যেয়ো। তাঁরাও খুশি হবেন। আচ্ছা ভাই, তাহলে আর দেরি করাবো না।

বেণীমাধব উঠে দাঁড়ালেন।

এবং ক্রোশ দুয়েক দূরে যশাই গ্রামে হরিহর মুখুজ্জের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন বেণীমাধব। সেখানে যথারীতি আদর-আপ্যায়ন ও হাসি-গল্পে সময়টা কাটিয়ে এবং রাত্রে শ্বশুর-কন্যা অনঙ্গমোহিনীর নরম শয্যায় পরম শয্যাসুখ উপভোগ করে ভোররাত্রে রওনা দিলেন মানিকপুরের দিকে।

অবশ্য বিদায় নেবার সময় রাত্রিবাসের প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিতে ভুল হলো না তাঁরও।

৩

ভরদুপুরের রোদ মাথায় করে মানিকপুরে বাড়ির উঠোনে পা দিতেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো বেণীমাধবের। অবশ্য বাড়ির আমবাগানের মধ্যে ঢুকতেই তাঁর কানে এসেছিলো গৃহিণী বাসনাময়ীর ঝংকার। বাড়িতে ঢুকে দেখেন উঠোনে রীতিমত জেনানা-যুদ্ধ। জেনানা-যুদ্ধ ঠিক নয়, একতরফা আক্রমণ আর রণহুংকার। ভগ্নী নীরোদাসুন্দরীর চুলের মুঠি ধরে বাসনাময়ী ক্রমাগত তাকে কিল চড় লাথি মেরে চলেছে। নীরোদাসুন্দরীর ময়লা শতচ্ছিন্ন বেশবাস এলোমেলো, খালি গা। তার সুস্পষ্ট স্তনদুটিও যেন ভয়ে থরোথরো কম্পিত। সর্বাঙ্গ তার ধুলো মাখা। আর দর্শকেরও অভাব নেই। আশেপাশের মেয়েরা হয়েছে জড়ো। তাদের অনেকেই বাসনাময়ীরই পক্ষে।

আর যারা নয় তারা নির্বাক। তার কারণ আছে। এমন উপভোগ্য দৃশ্য থামিয়ে দেওয়া বোকামি। তাছাড়া মুখ খুললে বাসনাময়ী এমনিই মুখ খুলবে যে তখন তার মুখ বন্ধ করাই দায় হবে। বাসনাময়ীর মুখ তো সকলের জানা। আর মুশকিল হচ্ছে, প্রায় সকলের ঘরের খবর বাসনাময়ীরও অজানা নয়। প্রায় সব ঘরেই যে কিছু না-কিছু…। অতএব মুখ বুজে দেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া এ দৃশ্যও তো নতুন নয়।

কিন্তু বছর আষ্টেকের মেয়ে হলেও স্বর্ণ তো মুখ বুজে থাকতে পারে না। হাজার হোক মা তো। সে পেছন থেকে মামীর কোমর ধরে আপ্রাণ কাঁদছে আর চেঁচাচ্ছে ঃ মাকে ছেড়ে দাও মামী, তোমার পায়ে ধরি। মা মরে যাবে, ছেড়ে দাও মামী।

—কোমর ছাড় ছুঁড়ি, হারামজাদী। আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।—বলেই বাসনাময়ী তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে আচমকা একটা ধাক্কা দিতেই স্বর্ণ উঠোনে চিৎপাত হয়ে পড়লো।

—বল শীগগির হারামজাদী, আমার খোকনের দুধের ঝিনুক কোথায়? অমন ভারি রুপোর ঝিনুক!—এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক লাথি।

—তুই বিশ্বাস কর বৌ, আমি নিইনি ঝিনুক।—নীরোদা করুণ সুরে আবার বললো।

—নিসনি তো গেলো কোথায় রে হতভাগী? উড়ে গেলো?—বাসনাময়ী ধমকে উঠলো। উপস্থিত মেয়েদের লক্ষ্য করে বললো, ওলো শোন তোরা মাগীর কথা! খোকনকে ঝিনুকে দুধ খাইয়ে যেই একটু ঘরে গেচি অমনি চিলের মতো ছোঁ মেরে—

নীরোদা বললো, ঝিনুক নিয়ে কী করবো বৌ তাই বল।

—কি করবি আবার! বিক্রি করবি!—বাসনাময়ী দাঁত খিঁচিয়ে বললো, সেদিন পয়সা চেয়েছিলি, দিইনি, তারই শোধ তুলতে চাস, না?

—পয়সা চেয়েছিলাম চড়কের মেলায় ঐ খোকনের জন্যেই খেলনা কিনবো বলে।

—বটে, এখন সোহাগ দেখানো হচ্চে!—বলেই মুখ ভেংচে ছড়া কাটলেন বাসনাময়ী ঃ বলি মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসির! আহা রে, মরে যাই!—বলেই হ্যাঁচকা টান মারলো নীরোদার চুলে।

এতটা না হোক তবে এমনতরো অত্যাচার নীরোদার প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশেষত কুলীনের ঘরে ননদিনী রায়বাঘিনী অনেক থাকলেও

রণরঙ্গিনী বৌয়েরও অভাব নেই। কাজেই এমন সব ব্যাপার কষ্টের হলেও লজ্জার নয়। কাজেই নীরোদা একেবারে ভেঙে না পড়ে আবার বোঝাতে চেষ্টা করলো বাসনাময়ীকে : আমার তো কোনো দুঃখই তোরা রাখিসনি বৌ! আমার কিসের অভাব যে ঝিনুক চুরি করবো? তোদের সংসারে প্রাণ দিয়ে খাটচি, মেয়েটাও খাটে—

—খাটবি না তো খাটে শুয়ে থাকবি?—ননদের মুখের কথা কেড়ে নিলো বাসনাময়ী : এখন বার কর হারামজাদী ঝিনুক। খোকনের ভাতে বাবা রুপোর ঝিনুক বাটি দিয়েছিলো, ও ঝিনুক নিলে তোর একদিন কি আমার একদিন—

ততক্ষণে স্বর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে মামীর আঁচল টেনে ধরে চীৎকার শুরু করলো আবার : মা তো বলচে মা ঝিনুক নেয়নি। রুপোর বাটিটা থাকলো দাওয়ায়, আর মা ছোট্ট ঝিনুক নিয়ে কী করবে?

—চুপ কর হারামজাদী! শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল! ছেড়ে দে আঁচল!

—আমার মাকে ছেড়ে দাও আগে—

—দাঁড়া দিচ্চি!—বলেই বাসনাময়ী এবার তার কনুই দিয়ে স্বর্ণর পাঁজরে একটা জোরে গোঁত্তা দিতেই সে 'ওরে বাবাগো, মাগো' বলে আঁচল ছেড়ে দিয়ে বুক চেপে বসে পড়লো মাটিতে। একজন প্রৌঢ়া তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত বোলাতে লাগলেন তার পাঁজরে।

বাসনাময়ী সেদিকে নজর না দিয়ে ননদকে ফের বললো, তাহলে বার করবিনে ঝিনুক? দাঁড়া, তবে আমিই বার করচি। দেখুক লোকে—।

বলেই বাসনাময়ী সহসা নীরোদার চুল ছেড়ে দিয়ে তার পরনের শাড়ি ধরে টান দিলো।

—ওকি করছিস বৌ! পরনের কাপড় খুলে যাবে যে!—তাড়াতাড়ি শাড়ি চেপে ধরলো নীরোদা।

বাসনাময়ী আবার একটা হ্যাঁচকা টানে নীরোদার শাড়িটা প্রায় আলগা করে ফেললো : কাপড়ই তো খুলবো তোর! দেখি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ঝিনুক!

বাসনাময়ীর কথায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো সবাই। এবার আর এক দৃশ্যের দর্শন পাওয়া যাবে।

কিন্তু এমনি এক চরম মুহূর্তে অরসিকের মত উদয় হলেন সেখানে বাড়ির কর্তা বেণীমাধব। দর্শকরা নাটকের শেষ অংক না দেখে ঘোমটা টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো এদিক-ওদিক।

বেণীমাধব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন উঠোনে। কিন্তু ভগ্নীর অর্ধনগ্ন অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। রেগে বললেন, এসব কী হচ্ছে ইতরোমি কাণ্ডকারখানা ?

—খোকনের ঝিনুক চুরি করেচে তোমার বোন।—ননদের শাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাসনাময়ী দাবি করলেন : ওকে বার করতে বলো ঝিনুক।

নীরোদা ততক্ষণে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়িখানা কোনরকমে সামলে নিয়ে বললো প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে : তুমি বিশ্বাস করো দাদা, খোকনের ঝিনুক আমি চুরি করবো কিসের দুঃখে ? তামা তুলসী যা নিয়ে আমাকে দিব্যি করতে বলো করচি।

বেণীমাধব একেই পথক্লান্ত, তাছাড়া তাঁর ভগ্নীর উপর স্ত্রীর মনোভাবটা বেণীমাধবের অজানা নয়। ঝড়-ঝাপটা লেগেই থাকে প্রায়। কাজেই সবটা ভালো করে না বুঝে হঠাৎ একটা রায় দিতে গেলে অবিচার হওয়া সম্ভব। তাই তখনকার মত ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্যেই বললেন বাসনাময়ীকে : বেশ তো, গয়লাপাড়ার হারু ঘোষকে ডেকে চালপড়া খাওয়ানো যাবে'খন। তখন আপনিই বেরিয়ে আসবে ঝিনুক। এখন ক্ষেমা দাও দিকি—

বেণীমাধব আর দাঁড়ালেন না সেখানে, চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু বাসনাময়ী তখনও গেলো না। শিকার আচমকা হাতছাড়া হয়ে যাবার ক্ষোভে কটমটিয়ে তাকালো সে নিরোদার দিকে। মুখ নেড়ে, নথ দুলিয়ে বললো, ওরে আমার রে, ভাইকে দেখে নালিশ করা হলো! এখন ইঁদুরে গর্ত খুঁজিগে—

—নালিশ কোথায় করলাম বৌ! বললাম—

—চুপ কর হারামজাদী ভাই-ঢলানী! বুঝিনে ভাবচিস।—বাসনাময়ী ঝটকা মেরে কোমরের গোট নাচিয়ে চলে গেলো তার ঘরের দিকে।

—এ কি বললি তুই…?—আর কথা বেরুলো না নীরোদার মুখ থেকে। হঠাৎ এমন একটা বুলি যে বুলেটের মতো তার বুকে এসে লাগবে তা সে ভাবতেও পারেনি। বুকখানা তার ধড়ফড় করে উঠলো। জলে ভরে এলো তার দু'চোখ। শেষে হাউমাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো উঠোনে।

স্বর্ণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো, সব শুনেছে, সব দেখেছে। নাটকের শেষ দৃশ্যেরও দর্শক সে-ই। বেগে প্রস্থান ও ভূতলে পতন—সবটাই দেখে সেও কম অভিভূত হয়নি। কিন্তু যবনিকা পতনের পরও কাজ থাকে। রঙ্গমঞ্চের জিনিসপত্র তুলে রাখতে হয়। স্বর্ণ তার শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে মায়ের

হাত ধরে টানলো : ওঠ—এই মা ওঠ। কেঁদে কি করবি বল। চল ঘরে চল।

কিন্তু নীরোদা তেমনি পড়ে রইলো।

—কই, ওঠ না মা!—স্বর্ণ নাড়া দিলো মাকে।

তবু মা চুপ।

তবে আর একবার ঠেলা দিতেই নীরোদা উঠেই আঁচলে মুখ ঢেকে দৌড়ে চলে গেলো নিজের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকেই ঘটাং করে দিলো দরজায় খিল।

স্বর্ণ মায়ের কান্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। পরে সেও দৌড়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো : দরজা খোল। দরজা খোল না মা!

খুললো না দরজা।

৪

ঘরের দরজা বন্ধ করলো বাসনাময়ীও। শোবার ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সে স্বামীর চোখে চোখ রেখে। তার চোখে জল আসার কথা নয়, তবু কী করে যেন তার ডাগর চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো। মাথার কাপড় গেছে খুলে, বুকের আঁচলের খানিকটা। সুগোল বক্ষের বেশ খানিকটা অনাবৃত। মাথার কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার কাঁধে বুকে পিঠে।

বাসনাময়ীর ঠোঁট কাঁপছে। পাতলা ঠোঁট। পানে রাঙানো। নথের মুক্তোটাও দুলছে।

দুলতে লাগলো বেণীমাধবের বুকও।

—কী হলো তোমার?—প্রশ্ন করলেন বেণীমাধবই।

—কিন্তু তার আগে বলো—বাসনাময়ী পালটা প্রশ্ন করলো, এ বাড়িতে তোমার ঐ বোন থাকবে, না আমি থাকবো? ঐ রাক্ষসীর ছেলে নেই বলে নজর পড়েচে আমার খোকনের ওপর। বলো তুমি, এ সংসার আমার না ওর?

—তোমার।—বেণীমাধব এগিয়ে গেলেন বাসনাময়ীর কাছে।

—তবে কোন সাহসে ও আমাকে হেনস্তা করে, অপমান করে?—বাসনাময়ী বিষ ঢালতে লাগলো।

—কাল আমি এর বিহিত করবো।—বেণীমাধব আরো কাছে এসে বাসনাময়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই সে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিলো হাত : থাক, আর আদর কাড়াতে হবে না!

বেণীমাধব অনুনয় করলো : আমাকে বিশ্বাস করো বৌ।

বাসনাময়ী বললো, তোমাকে বিশ্বাস করেই তো আমার এই দুর্দশা !

শুনে বেণীমাধব হাসলেন : কী দুর্দশা হলো তোমার ? কই দেখি।—বলেই তিনি সবল দুই হাতে বাসনাময়ীর নরম নিটোল দেহবল্লরী জড়িয়ে ধরলেন।

—আহা! আদিখ্যেতা হচ্চে মিনসের। - কৃত্রিম কোপ দেখালো বাসনাময়ী : ছাড়ো বলচি। এই ভরদুপুরে এলে, চান করবে, খাবে তা নয়, এখন এলেন রঙ্গ করতে। কেন, কোথাও রাত কাটিয়ে এলেই তো পারতে। জায়গার তো আর অভাব নেই।

বেণীমাধব বাসনাময়ীর থুতনি নেড়ে আদর করে বললেন, এমন জিনিস ঘরে থাকতে কোন ভাগাড়ে মরতে যাবো বলো তো বৌ ?

—থাক থাক আর অমঙ্গুলে কথা বলতে হবে না। খুব হয়েচে। দিন-দিন বয়েস বাড়চে আর কচিখোকা হচ্চেন।

বাসনাময়ীকে তেমনই জড়িয়ে ধরে বেণীমাধব বললেন, আমি কচি খোকা নই, খোকার বাপ!

বলেই প্রবল আবেগে বেণীমাধব বাসনাময়ীর দুই গালে ঠোঁটে চোখে কানে কপালে গলায় চুমুর পর চুমু দিয়ে চললেন। বাসনাময়ীর নাকের নথ, নথের চেন, কানের মাকড়ি, গলার চন্দ্রহার কিছুই তাকে বাঁচাতে পারলো না বেণীমাধবের পুরুষালী দুই পুরু ঠোঁটের আক্রমণ থেকে। আত্মরক্ষার জন্যেই যদি সাজসজ্জা হয় তবে তা বৃথাই হলো।

—বাবা রে বাবা, খেয়ে ফেললে আমাকে!—বাসনাময়ী মৃদু আর্তনাদের অভিনয় করলো।

বেণীমাধব এবার বাসনাময়ীকে ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, বেশ করেচি খাবার জিনিস খেয়েচি!

বাসনাময়ী উত্তরে জিব ভেংচে হেসে বললো, ইস্ আর কি! কত শখ যায় লো চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে।—বলেই শাড়ি গুছিয়ে পরে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেলো সে।

বেণীমাধব হেসে চৌকির ওপর বসলেন। হাতের কাছে তালপাতার পাখাখানা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। স্নানের আগে একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

দুপুরে ঐ রুদ্ররসের পর প্রেমরসের অবতারণার দরকার ছিলো বৈকি। দরকার ছিলো বাসনাময়ীর। দুপুরের নাটকের চরম দৃশ্যের মাঝখানে হঠাৎ বেণীমাধবের আবির্ভাব বাসনাময়ী আশা করেনি। এবং দৃশ্যটা মাঠে মারা গেলেও সে ততটা দুঃখিত হলো না বটে, তবে পরবর্তী দৃশ্যটা করুণ হবে, না আরো কড়া হবে সে ভেবে উঠতে পারলো না। তাই হাতের শিকারকে শেষ কামড় দিয়ে বাসনাময়ী ঘর সামলাতে ছুটলো স্বামীর পেছনে। এসেই ঘরের দরজা বন্ধ করে একটা রীতিমত করুণরসের অভিনয় করতে গিয়ে দেখে তার সহ-অভিনেতাটি, ভুল করে কিনা কে জানে, প্রেমের পার্ট আওড়াতে শুরু করেছেন। অবশ্য পুরুষকে বশ করবার এবং অবশ করবার যে অপরূপ রীতিতে নারী অভ্যস্ত তা প্রয়োগ করতে বাসনাময়ী এ দুর্বিপাকের মধ্যেও ভুললো না। আর দেখলো যখন ওষুধ ধরেছে, প্রতিপক্ষের হৃদয় যারপরনাই ভিজে জবজবে, তখন অযথা নিজের চোখ সজল করবার দরকার মনে করলো না সে। বাসনাময়ী তাড়াতাড়ি তার চোখের জলের জাল গুটিয়ে মেলে ধরলো দেহের ফাঁদ। তানপুরাটায় ধাক্কা লাগায় বেসুরো বাজবে ভেবেছিলো সে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে বাজিয়ে দেখে সুরটা যেমন তেমনি আছে। বেণী-মাধব বিগড়োননি। বাসনাময়ী নিশ্চিন্ত হলো।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পানের কৌটো হাতে বাসনাময়ী স্বামীর কাছে এসে পাশে বসে হাতপাখাখানা হাতে নিলো। তাঁকে বাতাস করতে করতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগলো ফুলপুরের শ্রীধর-সংবাদ। সব শুনে বাসনাময়ী বললো, তা মিনসেকে বললে না কেন, তার মাগ-মেয়েকে তো অনেকদিন ভাত-কাপড় দিয়ে পুষলাম, এবার নিয়ে যাক না?

বেণীমাধব পান মুখে মৃদু হাসলেন: হুঃ, জানো না কুলীনের মেয়েদের জন্ম মৃত্যু বিয়ে সব বাপের বাড়িতেই, স্বামীর ঘর ক'জনা করতে পারে? আমিই কি আর সবাইকে এনে রেখেচি, না এনে রাখতে পারি?

বাসনাময়ী ঠোঁট উলটে বললো, কেন, এনে রাখলেই তো হতো। দেবীদের পালা করে পা ধোয়াবার দাসী তো মজুতই আছে।

—বলি সেইজন্যেই কি এনেচি তোমাকে বৌ?—বেণীমাধব বললেন, তোমার রূপে-গুণে মজে গিয়ে আর চোখের আড়াল করতে পারলাম না বলেই তো—

বেণীমাধবের কথাটা সত্যি হলেও খাঁটি নয় একেবারে, একটু মিথ্যের খাদ মেশানো ছিলো। বাসনাময়ীর গুণে নয় রূপে তিনি মজেছিলেন। তাছাড়া

বেণীমাধবের বহুদিনের গৃহলক্ষ্মীটি যখন পাঁচদিনের বেহুঁশ জ্বরের মধ্যেই হঠাৎ হুস করে পরপারে চলে গেলেন তখন গৃহ তাঁর ফাঁকা হয়ে গেলো যেমন, মনটাও। যাবারই কথা। বাইরে আরো পাঁচটা স্ত্রী থাকলেও তারা ঠিক গৃহলক্ষ্মী নয়। সাধারণ কুলীন-কন্যা। বেণীমাধবের কৃপায় তারা বিবাহিতা, এবং পিতৃকুল রক্ষা করে পিতৃকুলেই অধিষ্ঠিতা। তাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা নেহাতই দেহের, মনের নয়—অন্তত বহু-সীমন্তিনীর স্বামী বেণীমাধবের দিক থেকে। কোনো শ্বশুরবাড়ি থেকে আমন্ত্রণ আর দক্ষিণা পেলে এবং সেই সঙ্গে বিনীত অনুরোধ-উপরোধ ঠেলে ফেলতে না পারলে তবেই শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া এবং সেখানে চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় উপভোগ করে, রাত্রে তাঁর সিঁদুর-চিহ্নিতা স্ত্রী নাম্নী একটি পুরুষ-বুভুক্ষু যৌবনবতী নারীর দেহের চরম খিদে ও মনের বহুদিনের আশা মিটিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসা। রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা আরোগ্য করে দক্ষিণা নিয়ে বৈদ্যের ঘরে ফিরে আসার মতোই।

বিসর্জনের পর প্রতিমার আসনচৌকি খালি থাকার মতোই বেণীমাধবের গৃহে গৃহিণীর আসন শূন্য হয়ে রইলো। হাহাকার করতে লাগলো গোটা সংসারটা। তাছাড়া ঘরে সেবা ও আদর-যত্নের জন্যেও তো লোক দরকার বেণীমাধবের। বেণীমাধব তাঁর বিয়ের ফর্দ দেখে মনেমনে ঠিক করেছিলেন তাঁরই কোন কৃপাধন্যা কুলীন-কন্যাকে ঘরে আনা যায় কি না, এমন দিনে সুযোগ একটা জুটে গেলো।

কয়েক ক্রোশ দূরেই মেঘনা গ্রামের কুলীন করালী মুখুজ্জে বেণীমাধবের শরণস্থ হলেন তাঁর পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যা বাসনাময়ীকে পাত্রস্থ করবার প্রার্থনা নিয়ে। অবশ্য উপযুক্ত উপঢৌকনের উল্লেখ করতেও ভুললেন না তিনি। কারণ, পাত্র হিসাবে বেণীমাধবের বয়েস তখন চল্লিশের কাছাকাছি হলেও কুলীন পাত্র হিসাবে ও বয়সটা কিছুই নয়। উপরন্তু পাত্র স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, অন্নবস্ত্রের অভাব নেই, বংশও বনেদী।

বেণীমাধব পাকা ব্যবসাদারের মত নিজের বংশের গৌরব-গান করলেন, সময়ের অভাবের কথা জানালেন, বিবাহে অনিচ্ছার কথা জানাতেও ভুললেন না।

উলটো হাওয়া বইতে দেখে সংসার-অভিজ্ঞ পাকা কুলীন বৃদ্ধ করালী মুখুজ্জে সুকৌশলে টাকার অংক আরো কিছু বাড়াতেই দেখা গেলো শীতের উত্তুরে হাওয়া যেন মোড় ঘুরে দখিনের মলয় বাতাসের মতোই বইছে।

এবং বেণীমাধব ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টির সময় নোলক পরা সুন্দরী কিশোরী কন্যার রূপে মোহিত হয়ে মন-প্রাণ সবকিছুই তাকে সমর্পণ করে বসলেন।

বাসনাময়ী বেণীমাধবের গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে আলতারাঙা পায়ে ঢুকলেন এসে স্বামীর সংসারে। ভাগ্যবতী কুলীন-কন্যা রূপের জোরে গৃহিণীর শূন্য আসনে জাঁকিয়ে বসলেন এবং স্বামীর আদরে-সোহাগে মৎস্যলোভী ভীরু বিড়াল কখন যেন রক্তলোভী হিংস্র বাঘিনীর রূপ ধরলো।

বেণীমাধবের সংসারে তটস্থ হয়ে রইলো সবাই।

৬

নীরোদা তার ঘরের দরজা সারাদিনেও খুললো না। স্বর্ণ কেঁদে কেঁদে ঘরের সামনে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লো। মা-মেয়ে কারোর মুখেই কিছু পড়লো না সারাদিন। শেষে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির পুরোন ঝি কালিদাসী তাকে টেনে তুলে তার মুখে কিছু গুঁজে দিয়ে রাত্রিটা নিজের কাছে শুইয়ে রাখলো।

বাসনাময়ী তো নয়ই, বেণীমাধবও ভগ্নীর কোনো খোঁজখবর নিলেন না, নেওয়ার দরকারও মনে করলেন না। কিংবা ধরে নিলেন, এ এমন কিছু ঘটনা নয় যা তিল থেকে তাল হতে পারে। অথবা সব বুঝেও না বোঝার ভান করে রইলেন ও বাসনাময়ীকে আর ঘাঁটালেন না। বাসনাময়ীও পুরুষের দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিতে ছাড়লো না। সে রাত্রেই কথা আদায় করলো, ঐ রাক্ষসীটাকে এ বাড়ি ছাড়া করতেই হবে, মেয়েটাকেও। নইলে ঐ ডাইনীর পক্ষে তার খোকনের গলা টিপে মারতেই বা কতক্ষণ। উঃ, সে আর ভাবাও যায় না।

বেণীমাধব তখন রসে টইটম্বুর, ও সব বিরস আলোচনা নেহাতই বেমানান। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, বলচি তো, এ বাড়ি যাতে ছাড়ে ওরা তার ব্যবস্থা হবে'খন।

কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেলো নীরোদা তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছে। বেণীমাধবের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে। শুধু নগ্ন ভরাযৌবনা মরদেহখানা ঝুলছে ঘরের বাঁশের আড়ে লটকানো শাড়ির ফাঁসে। বীভৎস সে দৃশ্য। চোখ উলটে জিভ বার করে ঝুলছে সে। যেন জিব ভেংচে বলছে, যেমন এসেছিলাম তেমনি গেলাম এখান থেকে। তোমাদের দেওয়া শাড়িখানাও রেখে গেলাম।

অনেক বেলা পর্যন্ত নীরোদা ঘরের দরজা না খোলায় বাসনাময়ীরই কেমন যেন সন্দেহ হলো। তখন ঝি কালিদাসীকেই ডেকে বললো, বলি, মাগী যে

কাল থেকে মটকা মেরে খিল এঁটে পড়ে রইলো ঘরে, তার কাজগুলো সারবে কে ? আমি ? যা, মহারানীর ঘুম ভাঙাগে যা ।

কালিদাসী নীরোদার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলো । স্বর্ণও কাঁদো-কাঁদো হয়ে ডাকতে লাগলো : খোল না মা ! তোর পায়ে পড়ি—

কিন্তু দরজা আর খোলে না । শেষে ব্যাপারটা বেণীমাধবের কানে তুলতে হলো এবং শেষপর্যন্ত ভাঙতে হলো দরজা । দেখা গেলো মহারানীর এ ঘুম ভাঙবার নয় ।

সবাই আঁতকে উঠলো আতংকে । বেণীমাধব সরে গেলেন সেখান থেকে । সজল হলো চোখদুটো তাঁর ।

বাড়ির সকলে 'আহা' করে উঠলো ।

দেখে শুনে সরে গেলো বাসনাময়ীও । মনেমনে ভাবলো সে, শেষের গালাগালিটা একটু কড়াই হয়েছিলো হয়তো ।...তা বলে মরবি তো মর্ বাইরে গিয়ে মর ।

আর স্বর্ণ ! মায়ের এই বীভৎস মূর্তি দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলো । শেষে 'ওরে মা রে' বলে এক বিকট চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে ঠাস করে পড়লো মাটির দাওয়াটায় ।

আর আশ্চর্য এক ঘটনার কথা জানা গেলো একটু পরেই । তখনও নীরোদার মৃতদেহ বেণীমাধবের বাড়িতেই ঘরে ঝুলছে । বেণীমাধব ক্রোশখানেক দূরে থানায় খবর দিয়ে গেছেন লোকজন ডাকতে । এমন সময় কালিদাসী এলো হাঁকপাক করে উঠোনে জড়ো-হওয়া পাড়া-পড়সীর সামনে । তার হাতে হারানো সেই রুপোর ঝিনুক ! বললো, হ্যাদ্যে, দেখো একবার কাণ্ডখানা ! কুয়োতলায় রেতের এঁটো বাসনগুলো মাজবো বলে গিয়ে দেখি প্যায়রাগাছ-তলায় কী একটা চকচক করচে । কাছে গিয়ে দেখি, ওমা, খোকনের ঝিনুক যে ! কোন মুখপোড়া কাগের কম্মো ।—কেঁদে উঠলো সেও : হায়গো দিদিমণি, চোরের অপবাদ নিয়ে গেলে—

কথাটা বোধহয় বাসনাময়ীর কানে গেছলো । ঘর থেকে বেরিয়ে কাছে আসতেই পাড়ারই একটি মেয়ে কালিদাসীর হাত থেকে ঝিনুকটা ছিনিয়ে নিয়ে বাসনাময়ীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেললো : নাও গো রাঙাবৌ তোমার হারানিধি !

নীরোদার অসাড় দেহটা ঈষৎ দুলে উঠলো কি ? তবে জিব কেটে বলছে যেন,—ছি ছি !

৬

প্রায় বছর দেড়েক পরে।

সেই স্বর্ণর বিয়েতে শাঁখ বেজে উঠলো এই বেণীমাধবের গৃহেই। বেণীমাধবের কথামতই বুঝি নীরোদা নিজেই এই বাড়ি ছাড়া হয়েছিলো, তবে স্বর্ণকে এ বাড়ি থেকে সরাবার ভার নিতে হলো তার মামাকেই।

বাসনাময়ীর তাড়নায় বেণীমাধব উঠে পড়ে একটি কুলীন পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। টাকাকড়ি কিছুই খরচ করবেন না, অথচ কুলীন-কন্যা পার করবেন, এটা প্রায় 'জলে ভাসে শিলা'র মতই অসম্ভব কিছু যদিও, তবু বেণীমাধব দমলেন না। একে-ওকে-তাকে যাকেই পান বেণীমাধব তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের কথা পাড়েন। ঘটকও লাগালেন। তারা রাহা খরচ নিতে লাগলো, আর সম্বন্ধ যা আনতে লাগলো তা যাকে বলে একেবারেই 'অখাদ্য'। কেউ হাঁপানি রোগী, কেউ বা প্রায় ঘাটের মড়া। খোঁড়া পাত্রেরও একটি সন্ধান পাওয়া গেলো ঘটক মারফত।

শেষে বাসনাময়ীই একদিন ঝটকা মেরে বললো, টাকাকড়ি খরচ করবে না, তোমার ভাগ্নীর জন্যে কি রাজপুত্তুর মালা হাতে করে আসবে?

—তা নয়, তবে—

—তবে আবার কি।—বাসনাময়ী বললো, ছুঁড়ি যেমন কপাল করে এসেচে তেমনি তো বর জুটবে।

তা দেখা গেলো স্বর্ণর ফরসা কপালখানায় বিধাতা বুঝি আলকাতরাই লেপে দিয়েছেন।

স্বর্ণর সঙ্গে এক বাহাত্তুরে বৃদ্ধের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হলো। এক ঘটকই আনলো এ সম্বন্ধ। বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জে নাকি যারপরনাই সুপাত্র। বনেদী কুলীন বংশ। অজস্র টাকা। পাকা বাড়ি। কোনো দাবিদাওয়া নেই। উপরন্তু গহনায় মুড়ে দেবে মেয়েকে। আর, আর কন্যাকর্তাকে মোটা কিছু টাকা দিতেও আপত্তি নেই। বলা বাহুল্য ঘটকের প্রাথমিক প্রাপ্তিযোগ তো ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।

আর বয়েস? একেই তো পুরুষমানুষের বয়েস বলে কিছু নেই, তারপর কুলীন পাত্রের বয়েস নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। স্বর্ণর বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো।

বেণীমাধব ফুলপুরে শ্রীধর চাটুজ্জের কাছে গেছলেন শুভবিবাহের খবরটা দিতে। বিয়েতে দাঁড়াবার জন্যে আমন্ত্রণও জানালেন, কিন্তু শ্রীধর চাটুজ্জে দু'চার কথায় ঝেড়ে ফেললেন তাঁর কর্তব্য।

বললেন, দেখো ভায়া, তোমার ভগ্নীই যখন আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন তখন ওপথে পা বাড়াতে আর মন চাইচে না। আর স্বর্ণ? তুমি মামা, তুমি যেটা ভালো বুঝেচো, সেটাই করেচো। কুলীন-কন্যারা নামে বর পায়, ঘর পায় না। তুমি ঘর-বর দুইয়েরই ব্যবস্থা করেচো যখন তখন আমার এতে অমত নেই। এখন শুভকাজটা সেরে ফেলোগে ভায়া। আমার আবার ক'দিন কোমরের বাতটাও বেড়েচে বড়।

৭

অতএব মানিকপুরে বেণীমাধবের বাড়িতে বিয়ের শাঁখ বেজে উঠলো। সানাইও বেজে থাকে অনেক বিয়েতে, কিন্তু তাতে কিছু খরচ আছে, অতএব সানাই না থাকারই কথা। তবে পাড়ার এয়োরা এলো, দল বেঁধে জল সইতে গেলো, উলুধ্বনি দিলো, হাসি-মস্করা করলো এবং গায়ে-হলুদে হইচই করে হলুদ মাখালো এর-ওর গায়ে।

তবে বাসনাময়ী বড়ো নজর রাখলো স্বর্ণর উপর। কেউ যেন এসে তার কানে বিষমন্তর না দেয়। তবে মেয়েদের চোখ মেয়েরাই ফাঁকি দিতে পারে। স্বর্ণকে আইবুড়ো-ভাত খাওয়াতে এসে সাজাতে এসে কেউ কেউ মন্তর দিলো বৈকি। মন্তব্যও কানে এলো তার অনেকরকম।

—এর চাইতে পোড়ারমুখী, তোর মায়ের মতো গলায় দড়ি দিলেই তো পারতিস!

কেউ বললো, আহা, মা নেই বলেই তো এই দশা!

— আর থাকলেই বা কি হতো! নবাবপুত্তুর ধরে আনতো?

আর একজন বললো, যাক, বিয়ে হচ্চে এই না কতো! ঐ তো গাঙ্গুলীদের দুই মেয়ে যশোমতী আর হরিমতী আজও ধুমসো হয়ে আছে, বর জুটলো না কপালে। যাকগে বাপু, এ হর-পার্বতীর মিলন হচ্চে।

স্বর্ণ সব শুনলো। চুপ করেই শুনলো। তার কাছে বিয়ে কি, বর কি, শ্বশুরবাড়িই বা কি বস্তু তার আবছা একটা ধারণা আছে এর-ওর মুখের কথা শুনে। নইলে দু'এক বছর আগেও স্বর্ণর ধারণা ছিলো বিয়ে জিনিসটা নাকি টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি, ছোটবেলায় হাতে পেলেই খেতে হয়, বড় হলে আর

পাওয়া যায় না। একটা লোক নাকি একদিন সেজেগুজে ফলটা হাতে করে নিয়ে আসে, তার নাম বর, আর তার বাড়ি 'শ্বশুরবাড়ি' নামে কোনো এক গাঁয়ে নাকি।

আর আজ প্রায় দশবছরের স্বর্ণমঞ্জরী এ ক'দিনের জ্ঞান পেয়ে এইটুকুই বুঝেছে যে এখন আর বরটাই বড় কথা নয়, ঘর পাচ্ছে, সেটাই বড় লাভ। অন্তত এ বাড়িতে আর থাকতে হবে না। মা'র ঘরটায় আর সে শুতে পারে না, কেমন যেন ভয়-ভয় করে। তাই কালিদাসীর কাছেই শোয় সেই থেকে। মায়ের ঘরের দিকে চাইতেও পারে না সে, প্রাণটার ভিতরে কেমন যেন হুহু করে ওঠে তার। এ বাড়িতে আর একদণ্ডও যেন থাকতে ইচ্ছে করে না।

বিয়ের সময় লাল চেলি পরে স্বর্ণ যেটুকু না সাজলে নয় সেজেগুজে পিঁড়িতে বসে রইলো ভাবী বরের জন্যে।

এবং শুভলগ্নে বর এলেন।

পাকা চুল। কোমরটা বুঝি একটু বেঁকেও গেছে বয়েসের চাপে। গালদুটো চুপসানো—দন্ত-অন্তের পরিণতি। চামড়াও কোঁচকানো। তবে পরনে কোঁচানো কাঁচি ধুতি চাদর, গলায় তাজা ফুলের মালা, সাদা মাথায় সাদা টোপর পরে বরযাত্রী নিয়ে শ্রীযুক্ত লোহারাম বাঁড়ুজ্জে এলেন বল্লভপুর থেকে বিয়ে করতে।

শুকনো ডালে বুঝি সদ্য ফোটা ফুল বাঁধবার ব্যবস্থা।

কিন্তু লোহারামের আশা, তাজা ফুল শুকনো ডালে বাঁধলে ডালটাও তো ভালো দেখায়। তাছাড়া 'কলম'ও তো বাঁধে লোকে, বুড়ো ডালে কচি ডাল লাগানো। লোহারামের ধারণা, কচি বৌ কাছে পেলে কাঁচা হতে কতক্ষণ। কবিরাজী সালসা। আর সেই আশাতেই লোহারামের শুভ আগমন। নইলে বাড়িতে সতীসাধ্বী স্ত্রী বিরাজমণি আছেন, আছে তাঁর প্রায় দেড়কুড়ি কুলীন শ্বশুরবাড়ি। তবু—

তবু ছাঁদনাতলায় আবার দাঁড়ালেন লোহারাম। এক পা তাঁর শ্মশানে আর এক পা বরের পিঁড়েতে। তা বলে বিয়ের ক্রিয়াকর্ম তো বাদ দেওয়া চলে না। একটুআধটু আনন্দও করতে হয়। স্ত্রী-আচারের সময় এয়োরা সাত হাত ঘোমটা দিয়ে সব নিয়মরক্ষা করলো। বাপের বয়সী বর, বরণ করতেও দুরুদুরু করে বুক। কোনো এয়োর বা ঠাকুর্দার বয়সী। তারা এর-ওর গা টেপাটেপি করলো। কেউ বা পানে-রাঙানো ঠোঁট উলটে ফিসফিস করে বললো, মিনসের শখ আছে দেখচি।

মেয়েদের ভিড় জমে গেছে। সেজেগুজে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছে তারা। পরনে ঢাকাই বেনারসী শান্তিপুরী শাড়ি। প্রায় পাছাপেড়ে। সায়া ব্লাউজের বালাই নেই। তাই দোপাট করে পরা। তবু অঙ্গ দেখা যায়। আর যারা একটু হালফ্যাশনের, পরেছে সেমিজ। আধুনিকা তারা। কারোর কানে ঝুলছে কানবালা, কারোর বা মাকড়ি, কুণ্ডল বা মুক্তোফল। সিঁথিতে সিঁতি। নাকে নোলক, কারোর বা টানা নথ। দু'হাতে হাঙরমুখো বা মকরমুখো বালা। উপর হাতে কেউর, অনন্ত, আঙুলে আংটি। গলায় ডায়মন্ডকাটা চিক বা চন্দ্রহার, পাটিহার। নিতম্বে সোনার গোট। ছোটদের পায়ে মল, কারোর পায়ে তোড়া আর খোঁপায় গোঁজা চিরুনি আর ফুল। পান খেয়ে অনেকেরই ঠোঁট রাঙানো, পা রাঙানো আলতায়। অনেকেরই সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, এয়োতীর লক্ষণ। কপালে কাঁচপোকার টিপ।

পাড়ার পুরুষরাও এসেছেন বিয়েতে। ঘনিষ্ঠ যাঁরা তাঁরা বাড়ির মধ্যে কাজকর্মের তদারক করছেন। বাকি সবাই বার-বাড়িতে। ফরাশে হুঁকো গড়গড়া নিয়ে বসেছেন। তাকিয়া হেলান দিয়ে গল্প জমিয়েছেন। বিষয়—পরচর্চা। যাঁরা উপস্থিত নেই তাঁদের বিষয়েই আলোচনা।

বেণীমাধব নমো-নমো করে বিয়ে সারছেন বটে, তবে লোককে নেমন্তন্ন কিছু কিছু করতে হয়েছে বৈকি। সমাজে বাস করে সামাজিকতা রক্ষা করা ছাড়া উপায় কি? অন্তত বিয়ের সাক্ষী হিসেবেও তো লোক দরকার। বর বুড়ো হতে পারে, আর অমন হয়েই থাকে, তবে মা-মরা ভাগ্নীকে কুলীনের ঘরে বিয়ে দিলেন, কর্তব্য করলেন, সেটাও তো জানানো দরকার।

খাওয়াদাওয়ার খরচও কিছু করতে হলো। তবে ফলারের ব্যবস্থা : দই, চিঁড়ে, মুড়কি, গুড় বা মিষ্টি।

ওদিকে সাতপাক ঘোরানো হলো, শুভদৃষ্টি হলো, হলো মালাবদল। পরামাণিক যথারীতি ছড়া কেটে সতর্ক করে দিলো :

শুন শুন সর্বজন কবি নিবেদন।
বিবাহের কথা কিছু কর গো শ্রবণ ॥
বর এবং বরযাত্রী অযোধ্যার বাসী।
প্রবেশ হইলেন তাঁরা মিথিলায় আসি ॥
বসিলেন সদানন্দ বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বিধিমতো মন্ত্র পড়ে হইলেন হৃষ্টিত ॥

প্রথম প্রহরে নারী থাকিবেন কাছে ।
দ্বিতীয় প্রহরে নারী থাকতে নিষেধ আছে ॥
ছাউনী নাড়া, বিষম জ্বালা, বড় শক্ত কথা ।
মন্দ ভাবলে খাবে সে পুত-ভাতারের মাথা ॥
বরকন্যা দুজনার শুভদৃষ্টি হলো ।
পঞ্চজনে উলু দিয়ে মালা বদল হলো ॥

ছড়া শুনে মেয়েরা হাসলো, ঠোঁট ওলটালো : মরে যাই, কী আমার বিয়ে !

আর—আর উপরে বিধাতা কি দারুণ অনুতাপে তাঁর কলম কামড়ালেন ? জানিনে ।

তবে বাসরঘরে লোহারাম বাঁড়ুজ্জেকে মেয়ের দল ছেঁকে ধরলো চারধার থেকে । মিষ্টি হেসে কামড় দিলো যে যেমন পারে ।

—দাদামশায়, নাতনীকে পছন্দ হয়েচে ?—হেসে বললো যশোমতী ।

মানময়ী বললো, সয়কে কি বলে ডাকবেন একটু শোনান না ! প্রাণেশ্বরি ? না হৃদয়েশ্বরি ?

শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো ।

অনন্তবালা হেসে বললো, বুড়ো বেতো পা টেপাবার জন্যে ঝি কিনে নিয়ে যাচ্চে লো, এটুকু বুঝিচসনে ?

হরিমতী জোয়ান মেয়ে । সুরসিকাও । পুঁটলি হয়ে বসে থাকা স্বর্ণকে হঠাৎ পাঁজাকোলা করে লোহারামের কোলে বসিয়ে বললো, নেন গো মশায়, আপনার খেলার পুতুল ।

লোহারাম সব শুনলেন, হাসলেন মৃদু মৃদু, মাথা ঝাঁকালেন নানা প্রশ্নে, কিন্তু মনকে লোহার মতোই শক্ত করে রাখলেন । এমন যে রমণীব্যূহের মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে তা তাঁর অজানা নয় । পড়েছেনও কতবার । তবে এক্ষেত্রে একটু বেশি গরমিলের জন্যে ধাক্কাটাও যেন বেশি ।

অভিজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ সামলে নিলেন ধাক্কা । এবং পরদিন লোহারাম নব-পরিণীতা বধূকে নিয়ে পালকিতে চড়ে হাসিমুখে রওনা হলেন বল্লভপুরে ।

যাবার সময় মায়ের ঘরখানার দিকে চেয়ে স্বর্ণ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো । কালিদাসীও । বেণীমাধবও যেন চোখ ম[illegible] । এবং বাসনাময়ী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বেশ ফুঁপি[illegible]দলেন । এ[illegible]য়ে কাঁদতে হয়, নইলে লোকে বলবে কি ।

বল্লভপুরে স্বর্ণমঞ্জরীকে বরণ করে ঘরে তুললেন তারই সপত্নী বিরাজমণি। শাশুড়ী তো কবে গত হয়েছেন, কাজেই বাড়িতে গিন্নীবান্নি বলতে তো উনিই। বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা গড়ন। গা-ভরা গহনা। চওড়া লালপাড় পাটের শাড়ি পরনে। সর্বাঙ্গে একটা লক্ষ্মীশ্রী। দুটি মেয়ের মা, ঐ কচি মেয়েটাকে দেখে বুকটা তাঁর যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠলো একবার : ছি ছি, এতটুকু মেয়ের এমন করেও সর্বনাশটা করতে হয়! না হয় তাঁর ছেলেই হয়নি একটা···। তা বলে···। অতগুলো তো বিয়ে করেছেন, তাদের একজন কাউকে ঘরে এনে রাখলেও তো হতো। তা না, ঘটক মুখপোড়ার কথায়···। তাছাড়া কর্তারও শখের বলিহারি! কচি মেয়ে নিয়ে শোবেন। ছ্যা!

প্রায় অন্যমনস্ক হয়েই বিরাজমণি বরণ করলেন নববধূ স্বর্ণমঞ্জরীকে। শাঁখ বাজালো বড় মেয়ে ইন্দুমতী, ছোট বিন্দুবাসিনী দিলো উলু। আর নতুন মায়ের সিঁথির মোটা সিঁদুররেখা দেখে বুঝি ভাবলো মনে মনে : আর কটা দিনের জন্যেই বা।

বাড়ির অনেকেই দেখলো কর্তার কাণ্ডটা। মুখ টিপে হাসলো কেউ বা। পাড়ার অনেকেই এলো মজা দেখতে।

সে রাত্রি কালরাত্রি। বিরাজমণি স্বর্ণকে কোলের কাছে নিয়ে শুলেন। বুকে টেনে নিলেন তাকে। স্বর্ণর দুই গালে চুমু খেয়ে বললেন, হ্যাঁরে পোড়ারমুখি, এমন রূপ নিয়ে এয়েচিস তো কপাল নিয়ে আসতে পারিসনি?

এ কথার মানে বোঝবার বয়েস স্বর্ণর হয়েছে। বিরাজমণির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বললো, কপালে কে কখন কি লিখে দিয়েচে জানতে পেরেচি নাকি?

—তা আঁতুরঘরে তোর মা মাগীও তো অন্তত নুন খাইয়ে মারতে পারতো!—বিরাজমণি আরও তাকে চেপে ধরলেন বুকে।

স্বর্ণ তেমনি মুখ গুঁজেই বললো, মা কি করে জানবে?

—কেন, মাগী জানে না কুলীনের ঘরের মেয়ের কি দশা হয়? নিজে কুলীনের মেয়ে না?

—সে তো তুমিও কুলীনের মেয়ে গো।—জবাব দিলো স্বর্ণ।

—বটে।—বিরাজমণি হেসে ফেললেন ঃ কথা জানিস তো বেশ। আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবি তা'লে ?

—কেন, ঝগড়া করবো কেন ?—স্বর্ণ অবাক হলো এবার।

—আমি যে তোর সতীন।—হাসলেন বিরাজমণি। হাসলেন এই ভেবে যে কার সঙ্গে কী কথাই না বলতে হচ্ছে!

—না, তুমি আমার দিদি।—স্বর্ণ বিরাজমণির গলা জড়িয়ে ধরলো।

বিরাজমণি স্বর্ণর গালে আবার চুমু খেয়ে বললেন, দিদি না, বরং বল দিদিমা।

—হ্যাঁ, তাই।

—তবু কিন্তু ঝগড়া করতে হবে। পারবি তো ?

স্বর্ণ জিগ্যেস করলো, কি নিয়ে ঝগড়া করবো ?

—ওরে ছুঁড়ি, তাও জানিসনে ? বর নিয়ে।—স্বর্ণর গাল টিপে দিয়ে বললেন, বরের কাছে শোয়া নিয়ে।

স্বর্ণ শুনে লজ্জা পেলো। বললো, ধ্যেৎ, আমি কেন শুতে যাবো ? তুমি বরের কাছে শুয়ো, আর আমি তোমার কোলের কাছে শোবো—যেমন শুয়ে আছি। বেশ হবে, না দিদিমা ?

—দূর পোড়ারমুখি। নে ঘুমো।—বিরাজমণি স্বর্ণর পিঠে থাবড়াতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন বুড়োর কথা। বেএক্কেলে বুড়োর কাণ্ড দেখো। আমি না হয় আজ বাদে কাল খড়ির তলায় যাবো, আমার কি। কিন্তু এক-ফোঁটা এই মেয়েটা। এর—এর কি হবে ? এর সাধ-আহলাদ···

আবার বুকে চেপে ধরলেন স্বর্ণকে।

অন্ধকারে বিরাজমণির চোখদুটো জলে ভরে উঠলো।

বিরাজমণি যদিও জানতেন কর্তা এবার যে কুলীন-কন্যাটির কুলরক্ষা করতে মাণিকপুরে গেছেন তার বয়স বেশি নয়, মা নেই, মামী দজ্জাল এবং মামাই কোনোরকমে ভাগ্নীর বিয়ে দিচ্ছেন কর্তার হাতে পায়ে ধরে। তবু স্বর্ণকে দেখে প্রাণটা তাঁর হঠাৎ কেন ছ্যাঁৎ করে উঠেছিলো। তার মুখ দিয়ে যে কথাটা বলতে গিয়েও তখনকার মতো স্থান-কাল বিবেচনা করে সামলে নিয়েছিলেন, পরদিন আর পারলেন না তিনি সামলাতে। সকালে মুখ ধোবার জন্যে স্বামীর গামছা গাড়ু এগিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, হ্যাঁগো, ঐ একরত্তি মেয়েটার সব্বোনাশটা করে তোমার কী লাভটা হলো বলতে পারো ?

লোহারাম এমনি একটা প্রশ্ন আগেই আশা করেছিলেন, এবং বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা সেদিনটাতেও অমন প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়ায় বরং রাত্রে ভেবেছেনও কয়েকবার—বড়বৌ যে বড় চুপচাপ। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ নয় তো?

অথচ এমন জানা প্রশ্নেও লোহারাম প্রথমে থমকে গেলেন। পরে বললেন, কী করবো বড়বৌ,, ঐ বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জের বৌটি যারপরনাই মুখরা। মা-মরা মেয়েটাকে বড্ড কষ্ট দিতো। বাড়ি থেকে বার করেও দিয়েছিলো কয়েকবার। তাই বাধ্য হয়ে···

—ওকে উদ্ধার করলে! কী বলো?

—যা বলো।

—দয়ার শরীল দেখচি।

এবার লোহারাম হেসে বললেন, তোমার জন্যে দাসী আনলাম মনে করো না!

—থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না—বিরাজমণি নথ নেড়ে বললেন, ঐ কাঁচ মেয়েটাকে দিয়ে আমি পা টেপাবো, না?

লোহারাম জোর করে হেসে বললেন, না হয় দুপুরে শুয়ে ওকে দিয়ে তোমার মাথার উকুন বাছিয়ে নিয়ো।

—আর রাত্রে?—বিরাজমণি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, তোমার গায়ে সুড়সুড়ি দেবে, কি বলো?—তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, এখন নারকেল বড় শক্ত লাগে, না? তাই কাঁচ ডাবের দিকে নজর!

বলেই আর দাঁড়ালেন না সেখানে বিরাজমণি।

লোহারাম বুঝলেন বড়বৌয়ের আর বুঝতে কিছুই বাকি নেই। মেয়েরা যেন চট করে সব বুঝতে পারে—বিশেষ করে পুরুষদের মনের কথা।

তবে রক্ষে, মেঘ যতটা জমেছিলো জল ততটা হলো না।

৯

ইন্দুমতী আর বিন্দুবাসিনী নিজেরা কুলীন-কন্যা, কাজেই কুলীন-কন্যার দুর্দশার কথা তাদের অজানা নয়। তারাও তো নামেই সধবা, আসলে স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা। সিঁথের সিঁদুর-পরা বিধবা। তবে মাছ খেতে পারে, রঙীন শাড়ি পরতে পারে আর অঙ্গে পাঁচটা গহনাও চড়াতে পারে—এই যা সুখ!

ইন্দুমতীর স্বামীর বাস কাছেই এক গ্রামে। বয়েস বেশি নয়, বছর চল্লিশ হবে, তাই পূর্ণোদ্যমে সে কুলীন-কন্যাদের কুলরক্ষা করতে ব্যস্ত। অবস্থাও এমন কিছু ভালো নয়, তবে ভাগ্যবান কুলীন-পুত্রটির অন্নবস্ত্রের কোনো অভাব নেই। ইতিমধ্যে তার প্রায় গোটা তিরিশেক কুমারী কুলীন-কন্যার ধর্ম এবং কুলরক্ষা করা হয়ে গেছে, এবং সেইসব শ্বশুরবাড়িতে পালা করে দিন এবং রাত কাটিয়ে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে সে। তার অকুলীন বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বুকফুলিয়ে বলে থাকে, আমাদের ভাই শ্বশুরবাড়িই জমিদারি।··· আরো বলে, অতগুলো বিয়ে করতাম না আমি, কিন্তু টাকার দরকার হয় যে মাঝে মাঝে। বাইজী নাচ, বারোয়ারীপুজো, কবির লড়াই, যাত্রাগান—সবেতেই তো চাঁদা গুনতে হয়, জানিস তো। তাছাড়া একটুআধটু পানদোষও আছে কাজেই—। মাঝেমাঝে একটা শ্লোকও আওড়ায় কুলীনের নবগুণ বর্ণনা করে:

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং এষো নবধা কুললক্ষণম্॥

কিন্তু বন্ধুরা তো জানে শ্রীকাশীনাথ গাঙ্গুলীর ঐসব কুললক্ষণের চাইতে নানারকম কুলক্ষণই বেশি। তাই ঠোঁটকাটা দু'একজন অকুলীন বন্ধুও ফুট কাটতে ছাড়ে না। সুর করে গায়: আজকালকার কুলীন-বামুনের লক্ষণ কি শোন তবে:

দাঁড়ায়ে প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুরঘরে,
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর আটক্যা বন্ধ,
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর॥
মুখে সদা 'ভেরি গুড', তুড়ি দিয়া বলে হুট,
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
বড় ভক্তি পাঁচালীতে, কে আঁটিবে বাচালিতে
—এই নয় গুণে লও গণে॥

কাশীনাথ মত্তাবস্থায় থাকলে গানের শেষে চেঁচিয়ে ওঠে—বাহবা বাহবা। মরে যাই মরে যাই!—বলেই বৈঠকখানায় ফরাশের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে থাকে: মরে যাই, মরে যাই!

এসব খবর কাকের মুখে বকের মুখে ইন্দুমতীর কানে আসে, এবং আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। যে বর পর হয়েই রইলো তার পাঁচরকম খবরে মাথাব্যথার কিছু নেই, শুধু খারাপ খবরটা না এলেই ভালো।

আর বিন্দুবাসিনীর স্বামী? শ্রীমানিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে মানিক মুখুজ্জের খবর পাওয়াই দুষ্কর। সে কলকাতায় কোন বড়লোকের বাড়িতে খায় দায় থাকে এবং আরো যা যা করে তা বিন্দুবাসিনীর কানে আসে না। মানিক মুখুজ্জে পাণিগ্রহণের ব্যাপারে নাবালক, মানে মাত্র গোটা আষ্টেক কুলীন-কন্যার স্বামী, তা বলে লাল-পানির ব্যাপারে মানিকচন্দ্র রীতিমত সাবালক। আর নিজস্ত্রীর চাইতে পরস্ত্রী বা বারোয়ারী স্ত্রীজাতীয়ার প্রতিই তার একটু দুর্বলতা আছে—এই যা।

এহেন স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী ইন্দুমতী ও বিন্দুবাসিনী স্বর্ণমঞ্জরীর শুভ আগমনে আশ্চর্য হলো না মোটেই, কৌতুকই বোধ করলো। বুড়ো বাপের সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা একটি কচি খুকীকে দেখে প্রথমে তো হেসেই অস্থির। পরে মায়ের কাছে ঠেলা খেয়ে বিন্দু ছুটলো শাঁখ আনতে, ইন্দু উলু দিতে লাগলো। মায়ের ধমক খেয়ে হাসি বন্ধ করে দু'বোন কচি-মায়ের অভ্যর্থনায় এলো এগিয়ে।

পরে ইন্দুমতী ও বিন্দুবাসিনী স্বর্ণমঞ্জরীর পাশে বসে জিগ্যেস করলো, আমরা কে জানো?

—না তো!

—তবু কি মনে হয়?

—ননদ।

শুনেই দুজনে আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো। ইন্দু বললো, আমরা তোমার মেয়ে গো, মেয়ে!

—আর তুমি হলে মা-আ-আ!—একটি লম্বা টান দিল বিন্দু।

—ধ্যেৎ!—স্বর্ণ বললো, তা আবার হয় নাকি? মা'র চাইতে মেয়ে বড় হয় নাকি?

—হয় গো হয়।—ইন্দু বললো, আমাদের বুড়ো বাপের গলায় মালা দিয়েচো যে!

—আমি দিয়েচি নাকি?—স্বর্ণ অপরাধীর মতো বললো, মামাই তো ---

—অ! মামা মালা দিয়েচে?—বিন্দু বললো, তবে তোমার মামাই আমাদের মা-আ-আ-আ!

—ধ্যেৎ!—স্বর্ণ মজা পেয়ে হেসে বললো, ব্যাটাছেলেতে ব্যাটাছেলেতে আবার বিয়ে হয় নাকি?

—ও, সে জ্ঞানটুকু আছে ?—ইন্দু হাসলো : আরো জ্ঞান হয়েছে না কি গো ?

—কি জ্ঞান ?—সরলা স্বর্ণ জিগ্যেস করলো।

—অ। জানো না ?—বিন্দু বললো, জানবে, সব জানবে। একটু সবুর করো। বাবা কিলিয়ে পাকাবে দেখো।

ইন্দু ধমক দিলো : এই, চুপ কর পোড়ারমুখি!

কিন্তু স্বর্ণ ভয় পেলো : আমাকে মারবে নাকি ?

শুনে দুজনের আবার হাসি।

তবু স্বর্ণর ভয় গেলো না : বলো না গো, আমাকে সত্যিই মারবে নাকি ?

—দূর পাগলি!—ইন্দু বললো, তোমাকে বাবা মারতে যাবে কেন ? এমন লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো মেয়ে। দেখো কতো আদর করবে।—বলে ইন্দু স্বর্ণর নরম গালদুটো টিপে দিলো।

১০

সাজানো খাবারের থালার সামনে বসে দু'একবার 'এসব কেন, এতো নয়' ইত্যাদি বলাটা ভদ্রতা, তারপর ডানহাতের কাজ শুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ফুলশয্যার রাত্রে ঘর যদিও ফুল দিয়ে সাজানো হলো না, খাটও নয়, তবে বিরাজমণি পরিপাটি করেই কর্তার শোবার বিছানাটা পাতলেন, এবং রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর স্বর্ণকে তিনি লাল চেলি পরালেন, সাজিয়ে দিলেন, মাথায় পরালেন ফুলের মুকুট, হাতে ফুলের বালা, তাগা এবং গলায় দিলেন ফুলের মালা। মেয়েরা পায়ে আলতা পরিয়ে দিলো। বিরাজমণি চন্দনের ফোঁটা কেটে দিলেন সুন্দর মুখখানিতে। সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন সিঁদুর। মেয়েরা স্বর্ণর পায়ে পরিয়ে দিলো তোড়া। আহা, মেয়েটার তো সাজবার সাধ যায়!

বিরাজমণি স্বর্ণর হাত ধরে ওঠালেন : নে চল ওঠ।

—কোথায় যাবো ?

— চল না!

বিরাজমণি স্বর্ণকে নিয়ে কর্তার শোবার ঘরের দিকে গেলেন। বিন্দু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, আহা, বলিদানের পাঁঠা!

ইন্দু ধমক দিলো : ওকি কথা! অমন অলুক্ষণে কথা বলতে আছে ? আয় বরং মজা দেখিগে।

দুজনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চললো বাপের ঘরের দিকে।

বিরাজমণি স্বর্ণর হাত ধরে কর্তার শোবার ঘরে ঢুকলেন। দেখেন, কর্তা বিছানার উপর জোড়াসন হয়ে বসে লম্বা নল মুখে দিয়ে গড়গড়া টানছেন। বললেন, এই যে গো তোমার জিনিস।—স্বর্ণকে বললেন, নে, পেন্নাম কর। পতি পরম গুরু। বুঝলি?

স্বর্ণ, বিরাজমণির কথামত লোহারামের পায়ের কাছে ঘোমটার-মোড়া মাথাটা ঠেকিয়ে সরে এলো আবার সতীনের কাছে।

লোহারাম যেন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: আহা-হা, ওকে আবার নিয়ে এলে কেন?

বিরাজমণি হাসলেন: তুমিই তো এনেচো।

—এনেচি যখন, দেখো যদি তোমার কোনো কাজে লাগাতে পারো।—লোহারাম বললেন, এখন ইন্দু-বিন্দুর কাছে শুক না গিয়ে।

—মরি মরি। পেটে খিদে মুখে লাজ।

বিরাজমণি হঠাৎ স্বর্ণর নড়াটা ধরে লোহারামের দিকে এগিয়ে দিলেন: যা লো ছুঁড়ি, বরের কাছে যা।

বিরাজমণি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে এসেই বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে দিলেন। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো তাঁর। রুদ্ধ আবেগে কণ্ঠনালী তাঁর টনটন করে উঠলো বুঝি।

আর প্রথম ভদ্রতার পালাটুকু শেষ হওয়ায় ঘরের ভেতরে লোহারাম দরজায় খিল এঁটে দিয়ে তাঁর ডানহাতখানা বার করলেন এবার: কই এসো, এদিকে এসো?

বিরাজমণির হাতছাড়া হতেই স্বর্ণ আর ভরসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি, ঘোমটায়-ঢাকা স্বর্ণ হুড়মুড় করে এসে কাছেই খাটের পায়াটা ধরে বসে পড়েছিলো উবু হয়ে। যেন একটা লাল কাপড়ের পুঁটলি।

লোহারাম ডানহাত বাড়িয়েই রইলেন: কই এসো, কাছে এসো?

পুঁটলি নড়লো না।

কাজেই নড়তে হলো বৃদ্ধ লোহারামকেই। খাট থেকে নামলেন তিনি। ডানহাত দিয়ে ধরলেন স্বর্ণর হাত: ওঠো। উঠে দাঁড়াও।

পুঁটলিটা যেন ভারি। অনড়।

লোহারাম এবার দু'হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে স্বর্ণকে তুলে বিছানায়

ধারে বসালেন। এতেই যেন হাঁপ ধরলো লোহারামের। একটু নিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে, কেশে বললেন, তোমার নাম কি?

পুঁটলি নীরব।

—বলি, তোমার নাম কি?

এতক্ষণে পুঁটলির মাথাটা নড়লো। জানে না নাম।

—নাম নেই বুঝি?

এবার পুঁটলি হঠাৎ সরব হলো: কেন থাকবে না? আমার নাম সন্ন।

লোহারামের ফোকলা মুখে হাসি দেখা গেলো: বাঃ, বেশ নাম তো!

লোহারাম এবার স্বর্ণর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন। তার ঘোমটাটা খুলে দিয়ে বললেন, দেখি মুখখানা!

বলতেই স্বর্ণ এক কাণ্ড করে বসলো। তার ছোট্ট জিব বার করে লোহারামকে ভেংচি কেটেই ঘোমটা টেনে দিলো সে। ঘরের নরম প্রদীপের আলোয় মনে হলো কলংকবতী চাঁদ একবার দেখা দিয়েই মেঘে মুখ ঢাকলো।

লোহারাম হেসে ফেললেন: ভেংচি কাটলে যে!

ঘোমটার ভেতর থেকে উত্তর এলো: বেশ করিচি, খুব করিচি।

—তাই নাকি?—লোহারাম বললেন, আমি তোমার কে হই জানো?

ঘাড় নাড়লো স্বর্ণ। জানে সে।

পরম উৎসাহে জিগ্যেস করলেন, বলো তো কে?

—দাদামশায়।

—দাদামশায়?—লোহারাম চমকে উঠলেন: কে বললে আমি দাদামশায়!

স্বর্ণ মজা পেয়ে ঘোমটার মধ্যেই খিলখিল করে হেসে উঠলো: তুমি তো দিদিমার বর!

—কে দিদিমা?—লোহারাম অবাক।

—কেন, ঐ যে আমাকে এ ঘরে দিয়ে গেলো!

লোহারাম এবার হেসে উঠলেন: ঐ তোমার দিদিমা নাকি? ও যে তোমার সতীন।

—না, দিদিমা!—স্বর্ণ আবার বললো, আর তুমি দাদামশায়!—আরো বললো স্বর্ণ তার মনের কথা: তুমি যে বুড়ো, গাল-তোবড়ানো, ফোকলা, চুল পাকা—

—বটে!—স্বর্ণর বিশেষণগুলো লোহারামের গায়ে যেন এক-একটা ঢিলের

মতো এসে লাগতে লাগলো। লোহারাম নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আর তুমি কি? দেখি, ভালো করে দেখি, কেমন দেখতে।

বলেই ঝট করে স্বর্ণর ঘোমটা পাকা হাতে খুলে ফেললেন লোহারাম। এবং বাঁহাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ডানহাতে টিপে দিলেন তার কাঁচ নরম গালদুটো: আমার চাঁদবদনি।

— যাঃ!—স্বর্ণ ধাক্কা দিলো লোহারামকে।

কিন্তু লোহারামের পুরোনো কাঠামোটাকে সরানো গেলো না। লোহারাম একটু নীচু হয়ে বললেন, দেখি, আমার লক্ষ্মীসোনা চাঁদের কণাকে আদর করি—

বলেই আর দ্বিধা না করে লোহারাম স্বর্ণর রাঙা গালে দিলেন ফোকলা মুখে এক চুমু।

—ও মা গো, দিদিমা গো! আমাকে খেয়ে ফেললে গো!—সরবে কেঁদে উঠলো স্বর্ণ।

হাসলেন লোহারাম।

বাইরে বিরাজমণি কান পেতে ছিলেন, অস্ফুটস্বরে বললেন, মুখপোড়া মিনসে।

অদূরে আবছা অন্ধকারে বন্ধ জানালার ধারে ছিলো ইন্দু-বিন্দু। বললো, চল পালাই—

আর উপরে বিধাতার হাতের কলমটা বুঝি গেলো খসে। লজ্জায় চোখ বুজলেন তিনিও।

১১

সেদিন হাটবার নয়। তাই ফুলপুরের হাটের উলুখড়ের চালাগুলো সব খালি। চারধারে গাছগাছড়াগুলোও ঝিমুচ্ছে যেন। ঠান্ডা ছায়ায় দু'তিনটে গরু এদিক-ওদিক শুয়ে।

হাটের স্থায়ী দোকান একটাই। ঝাঁপ-লাগানো মাঝারির আকারের মাটির ঘর। তার মালিক অভয়চরণ। বাড়ি এই ফুলপুরেই। দোকানটাও দু'পুরুষের। দোকান নয় তো—একটা গ্রাম্য বিভাগীয় বিপণি। কী না পাওয়া যায় সেখানে! কেরোসিন তেল, সরষের তেল, নারকেলের তেল, রেড়ির তেল তো আছেই, আছে লাল কাশীর চিনি, বিলিতী সাদা চিনি, ভেলি গুড়, আকের গুড়, ঝোলা গুড়, আবার কদমা, বাতাসা, খই, মুড়কি।

তাছাড়া সন্ধব নুন, বীট নুনও। মসলা প্রায় সব রকমই। চাল, ডাল, সুজি, চিঁড়ে, মুড়ি—কী নেই দোকানটায়। আর দেশলাই, মোমবাতি, টিনের ল্যাম্পো বা কুপি, সাবান, আলতা, পমেটম, চিরুনি, আরশি, সাদা কাগজ, খাতা, চুলের কাঁটা, ফিতে, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি অর্থাৎ গৃহস্থের নিত্যকার দরকারি আর শখ-শৌখিনের জিনিসপত্রে দোকানটা হাসতে থাকে যেন।

অনেক কিছু যেমন আছে, তেমনি আছে ধারও। গ্রামের দোকানে ওটি না থাকলে চলে না, আবার বেশি পরিমাণে থাকলে অচল হবার সম্ভাবনা। তবে অভয়চরণ পাকা লোক, বাপের কাছে ব্যবসা শেখা—তাই জানে পাকা মাঝির মতোই ব্যবসার নৌকোখানা নিরাপদে চালিয়ে যাবার কায়দা। মুখে মৃদু হাসি আর মিষ্টি কথা, খদ্দেরকে বড়ো করে নিজেকে ছোটো করে রাখা, গ্রামের প্রায় সকলের সঙ্গেই দাদা কাকা মামা মেসো পাতানো আর তাদের বিপদে-আপদে বুক দিয়ে পড়া—এই সব গ্রামীণ ব্যবসায়িক মূলমন্ত্রগুলি অভয়চরণ আয়ত্ত করায় সে দুজন লোক রেখেই দোকানটা চালিয়ে যাচ্ছে ভালোই।

অভয়চরণের দোকানে অনেক কিছু থাকলেও যা নেই, সেটা হচ্ছে পাতা চা বা তৈরী চায়ের আয়োজন। সেটা দোকান বা দোকানীর আর্থিক অভাব বা ব্যবসাবুদ্ধির অভাবে নয়। কারণ চা তখনও অনাস্বাদিত মধু। নেশা শুধু হুঁকো-গড়গড়ায় ধূমায়িত। অবশ্য গাঁজা আফিং ভাঙ তাড়ি মদ ইত্যাদি অনেক রসিকেরই গোপন-গ্রাহ্য সরস বস্তু। বিশেষ করে শিব এবং কালি-ভক্তদের জন্যেই।

দোকানে অভয়চরণকে হুঁকোর ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। অতএব কলকে তামাক টিকে সব কিছুরই। বয়স্ক যাঁরা, তাঁরা পয়সা দিয়ে বা তখনকার মতো কিছুই না দিয়ে জিনিসটা কিনে নিয়েই তো নিজের পথ দেখেন না, একটু জিরুতে হয় (বিশেষ করে যখন দশটা-পাঁচটা বলে কিছু নেই), দুটো কথা কইতে হয়। আবার আর একজন কেউ দোকানে কিনতে এলে তার খবরাখবরটুকু নেওয়াও দরকার। এবং নিজের সুখ-দুঃখের কথা না বললেও তো পেট ফোলে। আর যে কাছে নেই, তার বিষয়ে—একটু যাকে বলে, পরচর্চা করলে মনমেজাজটাও বেশ চাঙা হয়—আর সেই সঙ্গে একটু ধূমপান না করলে ঠিক জমে না, কাজেই হুঁকো-কলকের দরকার বৈকি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণই বা গল্প বা পরচর্চা চলে? কোমর ব্যথা হয়ে যায় না? তাই অভয়চরণকে একখানা বেঞ্চ পেতে রাখতে হয় দোকানের পাশে।

তবে অভয়চরণ হুঁশিয়ার। দাঁড়িপাল্লায় জিনিস ওজন করে, হিসেব করে আর কান দিয়ে সব শুনে যায়, আর গোঁফের ফাঁকে মিষ্টি-মিষ্টি হাসে। কিন্তু রা কাটে না একদম। যেন বোবা। আর যা এ কানে শোনে, বোধহয় ও কান দিয়ে তা বার করে দেয়, তাই একজনের কথা আর একজনের কানে দেবার মতো কথাই থাকে না তার মনে বা ইচ্ছে করেই মনে রাখে না। নইলে সাউখুড়ি করতে গেলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে হতো অভয়চরণের অনেক-দিন আগেই।

অবশ্য, প্রথম-প্রথম অনেকেই অভয়চরণকেই সাক্ষী মানতো : বলি, বলো না হে পালের পো, কথাটা ঠিক বলিচি কি না?

প্রতিপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী মানতো : তা আমিই বা কি ভুলটা বললাম বলো?

শুনে অভয়চরণ হেসেছে, বলেছে, আপনারা বিদ্যেবান, বুদ্ধিমান, আর আমি মুখখু। আমার কাছে জিস্যেস করাও যা, আর ঐ গরুটার কাছে জিগ্যেস করাও তাই।—বলে অদূরে কোনো শোয়া-গরুকে দেখিয়ে দিয়েছে : আর, আপনারা পায়ের ধুলো দেন, একটু গপপোগাছা করেন—তাতেই এস্থান পবিত্তোর হয়। আপনাদের তককো আমি ফয়শালা করতি পারি?

অভয়চরণের এই ধরনের এড়িয়ে-যাওয়া কথায় অন্তত এইটুকু সবাই বুঝে নিয়েছে—দেওয়ালের কান থাকতে পারে, মুখও আছে হয়তো, তবে এ লোকটার কানও নেই, মুখও নেই। আর চোখদুটো আছে শুধু দাঁড়িপাল্লার কাঁটার দিকে।

অথচ এই অভয়চরণ ফুলপুর গাঁয়ের কী না জানে! কার বিধবা মেয়ের গর্ভ হওয়ায় শিকড় খাইয়ে গর্ভপাত করানো হয়েছিলো, কোন কুলীনের আইবুড়ো মেয়ে বাড়ির সরকারের ঘরে অন্ধকার রাত্রে যাতায়াত করতো, কে বিধবা মেয়ের বিষয়-সম্পত্তি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের নামে লিখে নিলো—এমনি কত খবরই তো অভয়চরণের পেটে, অথচ সেসব পেটে গজগজ করে না, বরং তার অপূর্ব হজমশক্তির গুণে স্রেফ নিশ্চিহ্ন!

দুপুরে নেয়ে-খেয়ে ঘুমিয়ে অভয়চরণ দোকানের ঝাঁপ খুললো। দোকানের লোক দুজনও এলো একটু পরেই। আর খানিক পরেই আরো কয়েকজন খদ্দের। এলেন দীনু বিশ্বাস, ঈশান গাঙ্গুলী, এলো দত্তদের ছোট ছেলে গৌর, আর এলেন জমিদারবাড়ির গোমস্তা পরান মিত্তির।

হাটের নীরব কোণটা ক্রমেই সরব হয়ে উঠলো। অদূরে যে গরুটা এতক্ষণ শুয়ে ছিলো, সেও কান খাড়া করে সচকিত হলো যেন, উঠে দাঁড়ালো একটু পরেই।

গৌর আধ পয়সায় পাঁচপো নুন, এক পয়সায় আধসের হলুদ আর সরষের তেল একপোয়া দেড় পয়সায় কিনে নিয়ে চলে গেলো। দীনু বিশ্বাস কিনলেন আধ পয়সায় একটা দেশলাই, পরান মিস্তির চেয়ে নিলেন খানিকটা তামাক (হয়তো ওটা তাঁর প্রাপ্য) আর ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, কই গো, অভয়চরণ, তোমার শম্ভুপদকে কলকেয় একটু আগুন দিতে বলো।

দোকানের কর্মচারী শম্ভুপদ জানে এ কাজটি তারই করণীয়। তাই কড়ি-বাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকোর কলকেটা নিয়ে সাজতে বসলো।

—তারপর গাঙ্গুলী,—দীনু বিশ্বাস বললেন, ক'দিন তোমায় দেখিনি যে। কোথায় গেছলে ?

ঈশানচন্দ্র একটু মুচকি হেসে বললেন, এই একটু কাজে—

—কাজটা বোধহয় কোনো কুলীন-কন্যার উদ্ধার ?—দীনু খুড়ো টিপ্পনি কাটলেন।

পরান মিস্তির বললেন, তা ও-ও তো একটা কাজই।

—তা বটে।—দীনু খুড়ো বললেন, তুমিও তো কুলীন কায়েত। তোমাদের কাছে এ-ও তো একটা মহৎ কাজই হে। বলি, এ পর্যন্ত কটা কুলীন-কন্যে উদ্ধার করলে হে ?

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, সে খোঁজে তোমার কী লাভ খুড়ো ? আদার ব্যাপারীর জাহাজে খোঁজে কী দরকার !

—আহা-হা একটু জানতেও তো ইচ্ছে হয়।—দীনু খুড়ো হাসলেন।

ঈশানচন্দ্র বললেন, জেনে শুধু মন খারাপ করা। তোমার হাতে তো আর কেউ মেয়ে তুলে দেবে না। ঐ পুরোনো খুড়ীকে নিয়েই বাকি কটা দিন কাটাতে হবে।

দীনু খুড়ো বললেন, পুরোনো চাল আর পুরোনো ঘি-এর মতো পুরোনো গিন্নীরও অনেক দাম হে।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো হরিহর চাটুজ্জে। হাতে একটা ভাঁড়। বেশ একটা আড্ডা জমে গেছে দেখে হরিহর সোৎসাহে বললো, যাক, সব এখানেই। একটা খবর আছে জব্বর।…ওহে অভয়চরণ, আধ পয়সার রেড়ির তেল আর এক পয়সার বাটাচিনি দাও তো। দেখো বাপু, ওজনেটোজনে যেন—

পরান মিস্তির বললেন, জবর খবরটা কি বললে না যে।

—বলচি, বলচি।—হরিহর ভাড়ুদুটো অভয়চরণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, একটু ফাউ দিতে ভুলো না যেন—

দীনু খুড়ো বললেন, তোমার দেখচি সবেতেই ফাউ চাই।

—ফাউ চাইনে?—হরিহর বললো, আসলের চাইতে ফাউটাই তো মিষ্টি। সুদের মতো। গিন্নীর চাইতে শালী মিষ্টি—কে না জানে।

ঈশানচন্দ্র হুঁকোয় টান দিয়ে বললেন, এখন রাখো তোমার ফাউ-এর গল্প।

—আর জাবর না কেটে তোমার জবর খবরটা বলো দিকি।

শুনেই বেঁকে দাঁড়ালো হরিহর : কী বললেন গাঙ্গুলী মশায়? আমি জাবর কাটি? আমি গরু?

সর্বনাশ। হরিহর চটে গেলে একটা মুখরোচক গল্পই হয়তো মাঠে মারা যাবে। তাই তাড়াতাড়ি পরান মিস্তির বললেন, আহা-হা চটো কেন? দাদা কী বলতে কী বলে ফেলেচেন। তুমি গরু হবে কেন? ষাট। তুমি হচ্চো—গণ্ডা চারেক তো হবেই—বা তারও বেশি কুলীন-কন্যের পরম গুরু। বলো, বলো, কী বলছিলে, বলো।

—বলবো আর কি?—হরিহর যেন নরম হলো : এই বলছিলাম কি, ওপাড়ার মদনমোহনের কথা। আমি অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। তাকে বলেওছিলাম একদিন। তা সে বিশ্বাসই করলো না।···এখন ফললো তো আমার কথা।

সবাই বুঝলেন এটা হরিহরের ভূমিকা, প্রস্তাবনা। মহাভারত শুরু হয়নি। বা এটা যাত্রা অভিনয়ের আগে ঐক্যতান বাদন কিংবা শ্রাদ্ধের আগে উঠোন ঝাঁট। কাজেই ধৈর্য ধরাই নিয়ম।

হরিহর বলতে লাগলো, তা বলে অমন করে মেয়েটাকে দূর করে দেওয়াটা কি উচিত হলো? সেই সঙ্গে কচি মেয়েটাকেও।

বলেই হরিহর থেমে গেলো। বেখাপ্পা।

গরুর গাড়ি দিব্যি গড়াতে গড়াতে চললেও হঠাৎ যদি থেমে যায়, গরুকে গোঁত্তা খেতে হয় না? হরিহরকে খোঁচালেন দীনু বিশ্বাস : আহা-হা, থেমে গেলে কেন?

—আঃ। দাঁড়াও খুড়ো। একটু থামতে দাও।—হরিহরের বুকে যেন একটা কিসের কষ্ট : এখনো মেয়েটার মুখটা মনে পড়চে···

—বেশ মিষ্টি মুখ বুঝি?—পরান মিস্তির হেসে বললেন।

—বলি, বয়েস কত ?—দীনু বিশ্বাস উৎসুক হলেন।

ঈশানচন্দ্র হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, বুঝেচি, গোলমেলে ব্যাপার। হবেই তো—

—না, না। সে সব কিছু নয়।—হরিহর বললো, আপনারা যা ভাবচেন তা নয়।

—তবে ?

সবাই উৎসুক হয়ে তাকালেন হরিহরের দিকে। গনগনে উনুনে চাপানো ঘি-গরম-মশলার কড়াইয়ে যেন কে একঘটি জল ঢেলে দিলো। তবে কি ?

হরিহর বললো, মেয়েটা ভরার মেয়ে। এতদিনে ধরা পড়লো।

—ও হরি। এই-ই।—পরান মিত্তির বললেন, আমি ভাবলাম না জানি কি।

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, বংশজদের ভাগ্যে ঐ তো ঘটে। কেউ তো আর ওদের মেয়ে দিতে চায় না। কাজেই কোথাকার কোন জাতের মেয়ে নিয়ে ঘরে ওঠায় সে ভগবানই জানেন। তা মেয়েটাকে কিনলো কবে ? কোথায় ?

—ঐ যে ও বছর।—হরিহর বললো ষণ্ডেশ্বরের মেলায় চুঁচড়োর ঘাটে নৌকা এসে লেগেছিলো। জানেনই তো তখন কী ভিড় হয়।

ঈশানচন্দ্র বললেন, হবে না ? ওদেরও তো ঘরসংসার করতে হবে।

—তা বলে অজাতের-কুজাতের মেয়ে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে ?—হরিহর বললো।

—দ্যাখো বাপু, ব্যবসা।—ঈশানচন্দ্র বললেন, কাজেই জাতবিচার করতে গেলে চলে না।

দীনু বিশ্বাস বললেন, যাকগে, তারপর কি হলো বলো।

হরিহর বললো, হবে আর কি ? বছর দশ-বারো থেকে বছর তিরিশেক বয়েসের প্রায় গোটা চল্লিশেক মেয়ে এনেছিলো তারা। সে মেলায় সেবার প্রায় পনেরো-ষোলোটা মেয়ে বিক্রি করে গেলো। মদনমোহন দেখে শুনে দরদস্তুর করে পঞ্চাশ টাকায় নিলো মেয়েটাকে। অবশ্য, দেখতে শুনতে ভালোই। বয়েসও বিশের মধ্যেই—

—তা তুমি বাপু এতো জানলে কি করে ?—পরান মিত্তির জিগ্যেস করলেন।

—আমি গেছলাম যে ও বছর ঐ মেলায়—হরিহর জোর গলায় বললো।

দীনু খুড়ো হেসে বললেন, কেন ? মেয়ের খোঁজে ?

হরিহর দপ করে উঠলো : বলি, আমি যাবো কোন দুঃখে। আমি চাটুজ্জে কুলীন, আমার মেয়ের অভাব। মেয়ের বাপরা সব পায়ে ধরে দিয়ে যায়। তোমার মতো এক ঢোল, এক কাঁসি? আমি গেছলাম মেলা দেখতে।

পরান মিস্তির দেখলেন আবার জল ঘোলা হবার উপক্রম। বললেন, যাকগে, যাকগে। তারপর?

—তারপর আর কি?—হরিহর বললো, আমি মদনাকে বললাম, একটু দেখে শুনে বাজিয়ে নাও। ঘরে তুলবে, হাতে খাবে তো। তা সে শুনলোই না। বোধহয় মেয়েটার মুখচোখ গড়নপেটন দেখেই মজে গেছলো। এখন বোঝো ঠেলা—

কথার জোয়ারে নৌকো এখনো তীরে ভিড়ছে না দেখে শ্রোতারাই এবার লাগির ঠেলা দিলেন। দীনু বিশ্বাস বললেন, কিসের ঠেলা?

হরিহর বললো, কাল বিকেলে ওপাড়া দিয়ে আসছিলাম, দেখি মদনমোহনের বাড়ির সামনে লোক জড়ো হয়েচে, আর মদনমোহন খুব তম্বিগম্বি করচে তার বৌয়ের উপরে : হারামজাদি, তুই ধোপার মেয়ে, বলিসনি কেন? আমার জাত মারতে এয়েচিস।···আর বৌটা তার কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে কাঁদচে শুধু, মুখে কথাটি নেই। মদনমোহন নাকি কোত্থেকে কালই খবর পেয়েচে।

ঈশানচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, ও যে মুসলমানের মেয়ে নয়, সেটাই তোমার মদনমোহনের সৌভাগ্য। এমন ঘটনাও আমার শোনা আছে। সব ঐ দেবীবর ঘটকের কাণ্ড।

হরিহর আশ্চর্য হয়ে বললো, এখানে আবার ঘটক এলো কোত্থেকে? মদনই তো নিজে মেয়ে দেখে বিয়ে করেচে। বললাম না?

ঈশানচন্দ্র হাসলেন। বললেন, না না, এ সেই বহু পুরোনো দিনের ঘটক। সেই কৌলীন্য-প্রথার ব্যাপার।

দোকানের শম্ভুপদ কায়েতের হুঁকোটাও ধরিয়ে দীনু খুড়োর হাতে দিয়েছিলো তখন তখনই। সেটা এবার পরান মিস্তিরের হাতে এগিয়ে দিয়ে দীনু খুড়ো বললেন, তবে যে শুনেচি এসব বল্লাল সেনের কীর্তি।

ঈশানচন্দ্র বললেন মাথা নেড়ে, শুনেচো ঠিকই, আর, যা বললাম তাও ঠিক। মানে, ব্যাপারটা হচ্চে কি—

—দাঁড়ান দাদা।—বলেই হরিহর ঈশানচন্দ্রের হাতের হুঁকোটার দিকে হাত বাড়ালো : একটু দেখি।

এতক্ষণ হরিহরের হয়তো পেট ফুলছিলো সামনে ঐ তামাকের গন্ধে, অথচ তামাক টানতে না পেরে। তাই হুঁকোটা নিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ লম্বা লম্বা টানে গালভরতি ধোঁয়া টেনে উর্ধ্বনেত্র হয়ে নাক-মুখ দিয়ে বার করে হুঁকোটা শেষে ফিরিয়ে দিলো ঈশানচন্দ্রের হাতে : নিন দাদা। হ্যাঁ, তারপর বলুন।—বেশ গ্যাঁট হয়ে বসলো হরিহর।

ততক্ষণে অভয়চরণের দোকানে জিনিস কিনতে এসে দু'তিনজন কেনা-জিনিস হাতেই জমে গেছলো। এতক্ষণ ভরার মেয়ের গল্প গিলছিলো, এখন গল্পের মোড় ঘুরতেই সবাই যেন ঈশানচন্দ্রকে ঘিরে বসলো।

এমন কি এতক্ষণ যে অভয়চরণ হরিহরের জবর খবর শুনেও ভুলে হ্যাঁ-হুঁ করেনি সেও যেন মনের ভুলেই বলে ফেললো : হ্যাঁ, দাঠাকুর, বলেন শুনি।

ঈশানচন্দ্র বললেন, মানে, সে বহুদিন আগেকার কথা। তখন আমিও জন্মাইনি। আমি কেন, আমার বাপের বাপ, তারও বাপ জন্মেচে কিনা-সন্দ। মুসলমান রাজত্বেরও আগে। তখন গৌড়ের রাজা ছিলেন আদিশূর। কেউ বলে রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্যে, আর কেউবা বলে রাজার ছেলেপুলে হিলো না বলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা ঠিক করেন। অথচ দেশে তেমন ভালো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নেই—

হরিহর বাধা দিলো : সে কি কথা! দেশে এতো কুলীন ব্রাহ্মণ!

ঈশানচন্দ্র বললেন, আহা, তুমি এখনকার কথা ভাবচো কেন? তখন বৌদ্ধধর্মের ঠেলায় ব্রাহ্মণের ধর্ম বলে আর কিছুই ছিলো না। সব জগাখিচুড়ি হয়ে গেছলো। তাই আদিশূর কান্যকুব্জের রাজার কাছে সব বিষয়টা জানিয়ে দূত পাঠাতেই তিনি পাঁচ গোত্রের পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর পাঁচজন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়, মানে কায়স্থ পাঠিয়ে দিলেন এখানে। শুনবে তাঁদের নাম? আজও মুখস্থ আছে—

—বলুন শুনি।—পরান মিত্তির বললেন।

—শোনো তবে। ঈশানচন্দ্র একবার চোখ বুজলেন, বুঝি মনে করে নিলেন নামগুলো। পরে বললেন, হ্যাঁ শোনো, শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রের দক্ষ, বাৎস্য গোত্রের ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রীহর্ষ আর সাবর্ণ গোত্রের বেদগর্ভ।

—আর কায়েত কারা এলেন শুনি? আমাদের পূর্বপুরুষ?—পরান মিত্তির হেসে বললেন।

ঈশানচন্দ্র হাসলেন : তোমাদের আদিপুরুষ হচ্চেন কালিদাস মিত্র।

ঘোষেদের—মানে, গয়লা ঘোষেদের নয়, কায়েস্ত ঘোষেদের আদিপুরুষ মকরন্দ ঘোষ, বোসেদের দশরথ বসু, গুহদের পূর্বপুরুষের ঐ একই নাম—দশরথ গুহ আর আর দত্তদের পুরুষোত্তম দত্ত। তবে ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের বিষয়ে একটা মজার গল্প আছে—

—কী গল্প আবার? বলো শুনি—দীনু খুড়ো বললেন, তুমি বাপু এতোও জানো!

ঈশানচন্দ্র হাসলেন ঃ এই একটুআধটু চর্চা করেছিলাম কিনা এ বিষয়ে। —হ্যাঁ, পাঁচ ব্রাহ্মণ তো এলেন। হেঁটে নয়, একেবারে ঘোড়ায় চড়ে। একলা নয়, সঙ্গে গিন্নী। চাকরবাকরও। আর সাজের কী ঘটা! গায়ে উড়নি নয় একেবারে সেলাইকরা জামা পায়ে খড়ম নয় একেবারে চামড়ার চটি, মুখে পান। তাঁরা রাজপ্রাসাদের সিংদরজায় এসে দারোয়ানকে বললেন, যাও, তোমাদের রাজামশায়কে খবর দাওগে। বলোগে, কান্যকুব্জ থেকে আমরা এসেচি। দারোয়ান তো ওঁদের ধরনধারন পোশাক-আশাক দেখে একেবারে থ। যাক, লোক গেলো রাজাকে খবর দিতে। আর রাজা তার মুখে ঐ ব্রাহ্মণদের সাজসজ্জার কথা শুনে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা যাও, বলোগে, তিনি তাঁদের সঙ্গে পরে দেখা করবেন। এদিকে ব্রাহ্মণরা তো রাজাকে আশীর্বাদ করবেন বলে জলগণ্ডুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাই যাঁহাতক দূত এসে খবর দেওয়া—এখন বিশ্রাম করুন আপনারা, রাজামশায় পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, অমনি রেগে গিয়ে তাঁরা তাঁদের সেই আশীর্বাদ-বারি দিলেন ছুঁড়ে ফেলে।

—সব্বোনাশ!—দীনু বিশ্বাস যেন ভয় পেয়ে গেলেন।

—কী হলো তখন?—অভয়চরণের হাতের দাঁড়ি-পাল্লাটাও যেন কেঁপে উঠলো।

—হলো যা ভালোই।—ঈশানচন্দ্র হাসলেন ঃ পাশেই ছিলো একটা কাটা গাছের গুঁড়ি। শুকনো। দেখতে দেখতে সেই গাছে ডালপালা গজিয়ে উঠলো।

—হবেই তো! কথায় বলে, মন্ত্রপূত বারি।—হরিহর বললো, মানে, আশীর্বাদটা গিয়ে পড়লো ঐ মরা গাছটার ওপর।...তারপর কি হলো দাদা?

—যা হবার তাই হলো—ঈশানচন্দ্র বললেন, রাজামশায় তো ব্যাপার শুনে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, ক্ষমা চাইলেন, তাঁদের আদর করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পরে যাগযজ্ঞ করে রাজার নাকি ছেলেও হয়েছিলো। তাই তিনি

খুশি হয়ে পাঁচ ব্রাহ্মণকে পাঁচটা গাঁ দান করলেন—পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম আর বটগ্রাম।…আর সেই বেঁচে-ওঠা গাছটাও নাকি এখনও আছে বিক্রমপুরে। সেখানকার লোকেরা নাকি বলে, বল্লাল সেনের বাড়ির দক্ষিণে যে দীঘি আছে তারই উত্তর পাড়ের পাকা ঘাটের কাছে যে বিরাট গাছটা সেটাই নাকি সেই গজারিবৃক্ষ।

দীনু খুড়ো বললেন, কিন্তু হ্যাঁহে গাঙ্গুলী, এর মধ্যে তোমাদের কুলীনের গল্প কোথায়?

—আছে, আছে।—ঈশানচন্দ্র বললেন, এতো উতলা হলে চলে নাকি? তারপর কয়েক শ' বছর কাটতে দাও। মানে আদিশূরের বংশধরদের হারিয়ে সেনবংশের রাজা বল্লাল সেনকে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে দাও, তবে তো।

—আচ্ছা দিলাম না হয়।—দীনু খুড়ো হাসলেন।

—দিলে তো?—ঈশানচন্দ্রও হেসে বললেন, এবার শোনো তবে কুলীনের গল্প। ঐ যে ওঁরা সব সপরিবারে কান্যকুব্জ থেকে এসেছিলেন তাঁদেরও তো ছেলেপুলে নাতি নাতনী তস্য নাতি-নাতনী সব হতে লাগলো, নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থা হতে লাগলো—মানে, বেশ বিরাট একটা ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে উঠলো। আর সকলেই যে এক-একটি সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে উঠলো তাও নয়। আচারভ্রষ্ট হলো অনেকেই। রাজা বল্লাল সেনের কানেও অনেক কিছুই গেলো। তখন রাজা ঠিক করলেন—এঁদের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা আর দান—এই ন'টি মানে নবগুণ বিচার করে তবেই কৌলীন্য-মর্যাদা দেওয়া হবে।

—এ তো ভালো ব্যবস্থাই!—দীনু বিশ্বাস বললেন।

—ভালো তো বটেই।—ঈশানচন্দ্র বললেন, শুধু তাই নয়, রাজার ছেলে রাজা হবার মতো কুলীনের ছেলেই যে কুলীন হবে তাও নিয়ম ছিলো না। ঐ নবগুণ দেখাতে পারলে, তবে। জানো, বল্লাল সেনের এই কুলীন বিচারের একটা মজার গল্প আছে। অবশ্য, সত্যিও হতে পারে।

—কী রকম?—হরিহর জিগ্যেস করলো।

—মানে, একদিন রাজা প্রচার করলেন, যাঁরা নবগুণসম্পন্ন কুলীন তিনি তাঁদের রাজসভায় কৌলীন্য-মর্যাদা দেবেন। তাঁরা যেন নিত্যকর্ম সেরে অমুক দিন রাজসভায় উপস্থিত হন। শুনে, বুঝলে, কুলীনদের মধ্যে তো বেশ হইচই পড়ে গেলো। ঐদিন কেউ বা এক প্রহর বেলায়, কেউ বা দেড় প্রহরে,

আবার কেউ বা আড়াই প্রহর বেলায় রাজসভায় উপস্থিত হলেন। আর, এখনই হলো মজা।—ঈশানচন্দ্র হাসতে লাগলেন।

—কী মজা?—পরান মিত্তির জিগ্যেস করলেন।

ঈশানচন্দ্র বললেন, রাজা যখন দেখলেন আর কেউ আসচেন না, তখন রায় দিলেন যাঁরা সব শেষে এসেচেন ওঁরাই প্রকৃত কুলীন।

—কেন? কেন?—দীনু খুড়ো অবাক হলেন। অবশ্য আর সকলেও।

ঈশানচন্দ্র হেসে বললেন, এটা বুঝলে না? ওঁরা দেরি করে এলেন কেন? পুজো আহ্নিক সব নিত্যকর্ম সারতে সময় লাগে না? না, কৌলীন্য-মর্যাদা পাবার লোভে অংবং করে কোনোরকমে সেরেই দৌড়তে হবে। অর্থাৎ বোঝা গেলো, দেরিতে এলেন যাঁরা তাঁদের কাছে ধর্মকর্মই বড়, মান-মর্যাদার লোভ নেই তাঁদের। আর যাঁরা লোভী—

—ঠিক, ঠিকই তো।—সবাই প্রায় ঘাড় নাড়লো।

—কাজেই—ঈশানচন্দ্র বললেন, যাঁরা প্রথম প্রহরে এলেন তাঁরা হলেন গৌণ কুলীন, দেড় প্রহরে যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন শ্রোত্রীয়।

—রাজাদের তাহলে বেশ বুদ্ধি ছিলো বলো?—দীনু খুড়ো বললেন।

ঈশানচন্দ্র হেসে বললেন, নইলে কি তোমার-আমার মতো মাথায় গোবর পুরে সিংহাসনে বসা যায়, না, রাজ্য চালানো যায়? দ্যাখো না, সামান্য সংসার চালাতেই কেমন হিমশিম খেতে হয়।...হ্যাঁ, আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ পেলেন 'ঘটক' উপাধি। তাঁদের কাজ হলো ঐসব কুলীনদের স্তুতিবাদ, বংশাবলী কীর্তন করা, আর তাঁদের দোষ, গুণ, কৌলীন্য-নিয়মের বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। কিন্তু বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সব গেলো ঘুরে—

—কেন?—হরিহর জিগ্যেস করলো।

—অতো ধরাবাঁধা কি আর চলে।—পরান মিত্তির বললেন।

দীনু খুড়ো বললেন, যাকে বলে বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো।

—মানে—ঈশানচন্দ্র বললেন, লক্ষ্মণ সেনের সময়ে দ্বিতীয়বার কৌলীন্য-মর্যাদা দেবার জন্যে নির্বাচনের সময় আসায় রাজা ব্যবস্থা করতেই দেখা গেলো অনেকেরই আপত্তি। অনেকেই বললেন, দুচার দিনের পরীক্ষাতে ঠিক বিদ্যে-বুদ্ধি ধরা যায় না, আবার নিত্যকর্মাদি বা ধর্ম আচরণের ব্যাপারটা পরীক্ষার মাপকাঠিতে তো মাপাই যায় না। রাজা লক্ষ্মণ সেন দেখলেন. ব্যাপার গোলমেলে। কাজেই ঠিক করলেন, ঠিক আছে, কুলীনদের ছেলেই কুলীন হবে। একেবারে স্থায়ী ব্যবস্থা, মৌরসী পাট্টা।

—তাহলে ভালোই হলো—পরান মিত্তির বললেন।

—ভালো আর কী হলো ?—ঈশানচন্দ্র বললেন, বল্লাল সেন চেয়েছিলেন গুণীর পুজো করতে, তাই প্রকৃত গুণ দেখেই কৌলীন্য-মর্যাদা দিতে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময় থেকে ঐসব নবগুণের চর্চা প্রায় কমে যেতে লাগলো। অনেকেই আচারভ্রষ্ট হতে লাগলেন।···আর তোমাদের কায়েতদের, বুঝলে পরান,—এই ঘোষ, বোস, মিত্তিরদের 'পর্যায়' ঠিক করা হলো, আর করা হলো সমপর্যায় ছাড়া বিয়ে-থা হতে পারবে না।

দীনু খুড়ো বললেন, যাক, আমরাই বেঁচে গেলাম।

ঈশানচন্দ্র বললেন, যা ভাবো।···হ্যাঁ, ঐ যে বলেছিলাম আগে দেবী-বরের কথা, ঘটকবিশারদ দেবীবর প্রায় দশপুরুষ পরে কুলীনদের মধ্যে 'মেল বন্ধন' প্রথা এনে ব্যাপারটা আরো জটিল করে দিলেন।

—মেল বন্ধনটা আবার কি ?—হরিহর জিগ্যেস করলো।

—মেল, মানে, দোষ মেলন।—ঈশানচন্দ্র বললেন, দেবীবর দেখলেন সব কুলীনদের মধ্যেই কিছু-না-কিছু দোষ দেখা যাচ্চে। কাজেই যাদের যে ধরনের দোষ, তাদের নিয়ে এক-একটা মেল বা সমাজ ঠিক করলেন।

—অর্থাৎ ব্যাপার দেখচি,—পরান মিত্তির বললেন, বল্লাল সেন, কুলীনদের গুণ দেখে মর্যাদা দিয়েছিলেন, আর দেবীবর দিলেন দোষ দেখে।

—ঠিক বলেচো।—ঈশানচন্দ্র বললেন, এইভাবে ছত্রিশটা মেল হয়। তার মধ্যে খড়দহ আর ফুলিয়ার মেলের কুলীনরাই প্রধান কুলীন বলে খুব মান পেলেন। আর দেবীবরের এই মেল বন্ধনের ব্যবস্থায় যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তাঁদেরই তিনি নিষ্কুলীন করলেন, বললেন, ওঁরা 'বংশজ'। এই বংশজদেরই মেয়ে পাওয়া ভার হলো, তাই তাদের ভরা-র মেয়েই বিয়ে করতে হতো। আর মেল বন্ধনের কৃপায় পালটিঘর কমে যাওয়ায় কুলীনরা লেগে গেলেন কুলীন কুলবালাদের মালা দিয়ে তাদের কুলরক্ষা করতে। এই যেমন আমরা। কী বলো হে হরিহর ?

হরিহর হেসে বললো, তা তো বটেই। আমরাই হচ্চি দেবীবরের শাপে-বর।

দীনু খুড়ো হেসে বললেন, বর্বর।

যখন অভয়চরণের দোকানের সামনে এই গল্পগুজব চলছিলো, ঈশানচন্দ্র কৌলীন্য প্রথার জন্ম-ইতিহাস বোঝাচ্ছিলেন সবাইকে, তখন ফুলপুর গ্রামের পশ্চিমের ধান-ক্ষেতটা পার হচ্ছিলো এক যুবক। আলের পথ, তাই সাবধানেই চলছিলো সে। সরু পথে জুতো পরে চললে হড়কে পড়ার ভয়, তাই বোধকরি চটিজোড়া বাঁ হাতে ঝুলছে। পরনে কালো চওড়াপাড় কাঁচিধুতি, গায়ে পিরান বা ছোট জামা। যুবকের মাথার চুল বাবরি করা, গোঁফ-জোড়া ছুঁচলো পাকানো। চেহারা দোহারা। বেশ ঘষামাজা।

যুবক ফুলপুরের দিকেই এগুচ্ছে। তবে আস্তে আস্তে, সাবধানে। আলের পথে চলায় তেমন অভ্যস্ত নয়, চলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ক্ষেতের ধানগুলো প্রায় কোমর-সমান উঁচু, তাই পুতুলনাচের পুতুলের মতোই কোমরঢাকা অবস্থায় এগিয়ে আসতে দেখা গেলো।

পশ্চিমের আকাশে সূর্যের ছবি তখনও মুছে যায়নি, বরং রঙীন হয়ে উঠেছে। মুছে যাবার শেষ আভাস। নববধূর পালাবার আগে যেন লজ্জায় লাল হওয়া।

যুবক ফুলপুর গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

কাছেই একটা বড় ডোবা ছিলো, তাতে পা ধুয়ে হাতের চটিজোড়া পায়ে দিলো সে। ডোবার ওধারে গাঁয়ের একটি বৌ গরুর জাবনার জন্যে জল নিতে এসেছিলো, নতুন লোক দেখে মাটির কলসী কাঁখে, ঘুরে পেছন করে দাঁড়ালো। ভাবলো পুরুষমানুষটা কে? অল্পবয়সী, দেখতেও বেশ। এ গাঁয়ে কেন? ভদ্রলোক, বাবু বলেই মনে হচ্ছে।···একটা ন্যাংটা ছেলে দৌড়ে আসছিলো ডোবার পাশ দিয়ে, হাতে তার আধ-খাওয়া পেয়ারা। যুবকটির গায়ে জামা পায়ে জুতো দেখে মনে করলো বুঝি একটি অদ্ভুত জীব। ভয়ে থমকে গিয়ে আবার উলটো দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। যুবকটি হেসে ফেললো।

যুবকটি আরো একটু এগোতেই ফুলপুরের হাটে অভয়চরণের দোকানেরই সামনে এসে পড়লো। দেখলো কয়েকজন লোক একটি দোকানের সামনে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে, খুব গল্প জমিয়েছে। দাড়িওলা একজন বুড়ো, হুঁকো হাতে, তিনিই যেন বক্তা। ঈশানচন্দ্র।

—মশায়, এটি কি ফুলপুর গ্রাম? — যুবকটি জিগ্যেস করলো।

ঈশানচন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। মশায়ের নাম?

যুবক বললো, শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

—নিবাস?—দীনু খুড়ো এবার জিগ্যেস করলেন।

—গৌরহাটি।

পরান মিত্তির জিগ্যেস করলেন, ঠাকুরের নাম?

—ঈশ্বর কুড়োরাম মুখোপাধ্যায়।

হরিহর দেখলো সবাই প্রশ্ন করছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? সেও জিগ্যেস করলো, তবে এক বেয়াড়া প্রশ্ন: আপনাকে দেখে তো বেশ চকচকে ঝকঝকে মনে হচ্চে। জুতো-জামা পরা। শহরে থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ, কলকাতায়।—সতীনাথ বললো।

—কলকাতা?—পরান মিত্তির বললেন, সুতোনুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা?—ইস, তিন-তিনটে গণ্ডগ্রাম ইংরেজের কৃপায় শহর হয়ে গেলো। আর আমাদের এই ফুলপুর নামেই ফুলপুর হয়ে রইলো।...তা হ্যাঁ মশাই, ওখানে সাহেবদের গায়ের রং খুব লাল, না?

—হ্যাঁ।

—আর মেমসাহেবরা নাকি খুব রাঙা টুকটুকে দেখতে। মাথায় নাকি রেশমের মতো লালচে চুল, আর খুব সাজের ঘটা?

শুনে দীনু খুড়ো হেসে বললেন, এতো খবর নিচ্চো কেন হে মিত্তির? কুলীন কায়েতের ইচ্ছে হয়েচে বুঝি আর একটা কুলীন মেমসাহেব উদ্ধার করতে? ওরা কিন্তু ম্লেচ্ছ।

পরান মিত্তির হেসে বললেন, আহা-হা খুড়ো, ভালো জিনিসের খোঁজ-খবর নেওয়াটা ভালো মনেরই লক্ষণ।

কিন্তু সতীনাথ দেখলো, সে মৌচাকে আঙুল দিয়েছে। অথচ আর সেখান থেকে চট করে সরাবারও উপায় নেই। তবু যে খোঁজে সে এসেছে জিগ্যেস করবার আগেই হরিহর এবার সত্যিই হুল ফুটিয়ে বললো, মশাই তো মুখ্য কুলীন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—সবিনয়ে উত্তর দিলো সতীনাথ।

—তা আপনার ক'টি সংসার?

—আমি বিবাহ করিনি।

—বিবাহ করেননি?—হরিহর হাঁ হয়ে গেলো: অথচ আপনি কুলীন! বয়েস অল্প। কারণ?

—অকারণ।

—এ যে নতুন কথা! আপনি তাহলে নামেই স-তী-না-থ!

—যা অনুমান করেন।

—কিন্তু আপনি কতগুলি কুলীন-কন্যাকে অকুলে ভাসিয়ে দিলেন, তা ভেবেচেন কী? পাত্রস্থ হতে পারলো না বলে তাদের কুলক্ষয় হবার সম্ভাবনা। কুললক্ষ্মী সে সব সংসারে আর থাকবেন না।

—ওসব গল্প ছাড়ুন।—সতীনাথ বললো, কুলক্ষয়, কুললক্ষ্মী, সব আপনাদেরই বানানো গল্প। কতকগুলি কুলবালাদের সর্বনাশ করবার জন্যে

—সব্বোনাশ!—হরিহর বললো, এ যে ব্রাহ্মণকুলে কালকেউটে!

—না। বরং বলতে পারেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ!

—পেল্লাদ!—হরিহর ভেংচি কাটলো: পেল্লাদ, না শহুরে সং! ম্লেচ্ছ! গো-খাদক—

—মুখ সামলে কথা বলবেন!—সতীনাথ বললো।

—কেন? মারবেন নাকি?—হরিহর বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো।

ঈশানচন্দ্র বা পরান মিত্তির কৌলিন্য-প্রথার উপর সতীনাথের কটূক্তি করা শুনেও কিছু বলেননি এতক্ষণ এই ভেবেই যে হরিহর তার যথার্থ উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু যখন দেখলেন তর্কটা অতর্কিতে হাতাহাতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: আহা-হা, ওকি হচ্চে হরিহর!

দীনু খুড়োও বললেন, যেতে দাও ভাই, বিদেশী ভদ্দরলোক!

—ভদ্দরলোক না ছাই!—হরিহর বললো, কোত্থেকে উড়ে এসে একদম আমাকেই উড়িয়ে দিতে চায়!

অভয়চরণ দেখলো তার দোকানের সামনেই যতো গোলমাল, তাই তাড়াতাড়ি ঝগড়া থামাতে এলো: যেতে দাও ভাই হরিহরদা!

কিন্তু হরিহরের মেজাজ তখন রীতিমতো চড়া সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। বললো, আমি যেতে দেবো কি? ঐই যাক। বেরিয়ে যাও গাঁ থেকে!

—তোমার কথায়?—আশ্চর্য সাহস তো যুবকটির!

—হ্যাঁ, আমার কথায়!—বলেই হরিহর আচমকা সতীনাথের বুকে ধাক্কা মারতেই সে উলটে পড়ে গেলো মাটিতে। হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় উপস্থিত সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলো। একি কাণ্ড!

কিন্তু কাণ্ডটা তখনও ঠিক পাকেনি। সতীনাথ জামার ধুলো ঝেড়ে উঠে

দাঁড়িয়েই হরিহরের গলা টিপে ধরলো এবং হরিহরও চেপে ধরলো সতীনাথের গলা। তারপর দুজন ধস্তাধস্তি করতে করতে আবার ধরাশায়ী। এবং একবার হরিহর সতীনাথের ঘাড়ের উপর, আর একবার সতীনাথ হরিহরের উপর। আবার কখনো বা দুজনেই দুজনকে আঁকড়ে ধরে ধুলোয় গড়াগড়ি। হরিহরের খালি গা মাথা ধুলোয় মাখামাখি, সতীনাথের জামাকাপড় চটকে ছিঁড়ে ধুলোয় নোংরা হয়ে একাকার।

অভয়চরণ সাতেপাঁচে না থাকলে কী হবে, এখানে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। ঈশানচন্দ্র, দীনু খুড়োদের মতো দাঁড়িয়ে 'ওকি হচ্চে, বামুন মানুষ, ছাড়ো, ছাড়ো, ছিঃ ছিঃ' করলে তো হবে না, একটা কিছু করা দরকার। তাই সে দোকান ছেড়ে ছুটে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে আলাদা করে দিলো হরিহর আর সতীনাথকে। তখন সাহস পেয়ে পরান মিস্তির হরিহরকে ধরে রাখলেন, অভয়চরণ সতীনাথকে।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত শ্রীধর চাটুজ্জে। একটা জমির মামলার ব্যাপারে সদরে গেছলেন তিনি, ফেরবার পথে অভয়চরণের দোকানে একটু তামাক আর দেশলাই একটা কিনতে এসে দেখতে পেলেন এক মল্লযুদ্ধের শেষদৃশ্য। আর অবাক হলেন সতীনাথকে দেখে।

—আরে! সতীনাথ তুমি? একি কাণ্ড!

সতীনাথ হেসে বললো, কিছু না। আপনাদের গাঁয়ের অতিথি-অভ্যর্থনার নমুনা।

হরিহর বললো, কুলীন কুলাঙ্গারের অভ্যর্থনার নমুনা।

—কেন, কী ব্যাপার?—শ্রীধর চাটুজ্জে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ হে ঈশান, কী ব্যাপার হে?

ঈশানচন্দ্র ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে জিগ্যেস করলেন, কিন্তু এ ছেলেটি কে হে? তোমার চেনা নাকি?

শ্রীধর তাঁর গায়ের উড়ুনি দিয়ে সতীনাথের জামার ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললেন, আমার অতিথি গো!

ঈশানচন্দ্র বললেন, ঠিক বুঝলাম না—

শ্রীধর বললেন, আমার ছোটো গিন্নীর বোনপো, আমার বড় শালীর ছেলে।

—ইস! কাজটা বড় অন্যায়ই হয়ে গেচে—দীনু খুড়ো বললেন।

—হ্যাঁ।—ঈশানচন্দ্র মন্তব্য করলেন: ষাঁড়ের লড়াই হয়ে গেলো বটে!

শ্রীধর বললেন, সতীনাথ, চলো, বাড়ি চলো। তোমার মাসীমা এখন মূর্ছা না যান!

সতীনাথ হেসে বললো, যা বলেচেন মেসোমশায়। একেবারে নাটকীয় প্রবেশ তো। দেখে পতন ও মূর্চ্ছা যাওয়া বিচিত্র নয়।

১৩

তখন মানিকপুরের আকাশে সূর্যের দেখা আর না গেলেও অস্ত-যাওয়া সূর্যের রঙীন অস্তিত্বটুকু তখনো ছিলো পশ্চিম আকাশে মাখানো। গোধূলি লগ্নের কনে-দেখা আলোয় সারা মানিকপুর গ্রামটাই যেন লজ্জায় রাঙা। চারদিকে যেন রঙিন আবির ছড়ানো। আকাশের গায়ে গাঁয়ের তালগাছগুলো তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, নড়ছে না, পাছে তাদের খড়খড়ে পাখার হাওয়ায় আকাশের রংটুকু যায় ফ্যাকাশে হয়ে।

আর গাঙ্গুলীবাড়ির খিড়কির পুকুরের কখনো-নীল কখনো-সবুজ জলটাও কখন যেন লালচে হয়ে গেছে। তার চারপাশের আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা নোনা আতা আমড়ার সবুজ গাছগুলোর মাথাতেও সিঁদুরের আভাস। যেন সদ্য বিবাহিতা।

কিন্তু ঐ সিঁদুর পরাই সার।

কুলীন চন্ডীচরণ মিত্রের মেয়ে মানময়ীর যেমন দশা।

মানময়ীরও তো বিয়ে হয়েছে। সিঁথিতে সিঁন্দুরও পরে ঘটা করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যার জন্যে সিঁদুর পরা তারই দেখা নেই। অথচ বাপ তো যথাসাধ্য খরচ করেই বিয়ে দিয়েছে ভালো কুলীনের বড় ছেলের সঙ্গে। হলে হবে কি, কুলীনের বড় ছেলেকে প্রথম বিয়েটা কুলরক্ষার জন্যে কুলীনের ঘরেই করা ছাড়া উপায় নেই, তাই শ্রীমান ভবতারণ ঘোষ বাপের সুপুত্র হয়ে প্রথম মাল্যদানের হাতেখড়িটা চন্ডীচরণ মিত্রের কন্যার উপর দিয়েই মকসো করলো বটে, তবে হাত পাকালো আরো পাঁচটা দে, দত্ত, পালিত, গুহ ইত্যাদি মৌলিকের ঘরে। অবশ্য আরো যে দু'একটা কুলীন কায়েতের মেয়েকেও ভবতারণ উদ্ধার করেনি তা নয়। তবে হিসেবে দেখা গেছে মৌলিকের ঘরের মেয়েদের মারফতেই যেন প্রাপ্তিযোগটা বেশি।

ভবতারণের প্রথম শ্বশুরমশায় যথাসাধ্য খরচ করেই মানময়ীর দিয়ে দিয়েছিলেন এবং পরে সাধ্যসাধনা করে জামাইকে বাড়িতেও এনেছিলেন

দু'তিনবার। আর মানময়ীর ঘরে রাত কাটিয়ে পরদিন বিদায় নেবার সময় জামাইয়ের হাতে বেশ কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও গুঁজে দিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ ক'দিনের সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে ইহধাম ত্যাগ করায় মানময়ীদের আর্থিক অবস্থা রীতিমতো শোচনীয় হয়ে উঠলো। সদরে কোর্টে এক মোক্তারের মুহুরীগিরি করে যা হোক কিছু মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করতেন চণ্ডীচরণ। সেটা সহসা বন্ধ হওয়ায় তাঁর স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীকে পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই অন্যের বাড়িবাড়ি ধান ভাঙা, ধান ঝাড়া, চিঁড়ে কোটা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি করতে হলো। এক্ষেত্রে দুটো পেটের যোগাড় করতেই যখন নাজেহাল অবস্থা, তখন একটা পরের ছেলেকে ডেকে আনা, তাকে বিদায় দেওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সবই ভাগ্য।

ভাগ্য বৈকি! নইলে নিজের ছেলেই তো একবার খবর নিতে পারতো। ছোট ছেলে নিতাইটা তো বাপের আগেই সব মায়া ত্যাগ করে চলে গেলো। আর বড়টা—গোবিন্দ। সেই যে বাপের শ্রাদ্ধে এসে কাজকর্ম চুকিয়ে গেলো, আর তার দেখা নেই। সেও প্রথমে এক কুলীন-কন্যাকে বুড়ি ছুঁয়ে পরে আরো তিন-চারটে কুলীন আর মৌলিক-কন্যাকে তরিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে ফুলপুরের জমিদার সর্বময় চৌধুরী নামে এক বড়লোক মৌলিকের ঘরে ঘরজামাই হয়ে।

অগত্যা তাই মোক্ষদাসুন্দরীকে গাঁয়ের এবাড়ি ওবাড়ি খেটে খেতে হয়। অবশ্য মানময়ীও চুপ করে বসে থাকে না, সময় পেলেই সুতো কাটে, তাঁতী জোলাদের কাছে বিক্রি করে যা হোক কিছু ঘরে আনে। বাইরে গিয়ে মায়ের মতো খাটাখাটনি করতেও তার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু আপত্তিটা মোক্ষদা-সুন্দরীরই। একে সোমত্ত বয়েসের মেয়ে, পাঁচটা পুরুষমানুষের সামনে দিয়ে হটহট করে এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়াটা ঠিক ভালো দেখায় না। তাছাড়া কী এমন দরকার, যখন কোনোরকমে দুটো পেট চলে যাচ্ছে।

তা যাচ্ছিলো দিনগুলো কেটে একরকমে। বাড়ির কাজকর্ম করা, সময় পেলেই সুতো কাটা, দুপুরে খেয়েদেয়ে পান মুখে দিয়ে কাছাকাছি সই গঙ্গাজলের বাড়ি বা গাঙ্গুলীদের বাড়ি বেড়িয়ে আসা, বিকেলে উঠোন ঝেঁটিয়ে, চুল বেঁধে গাঙ্গুলীদের খিড়কির পুকুরে গা ধুয়ে আসবার সময় কাঁখে করে এক কলসী জল আনা, সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেওয়া, রাত্রে মা-মেয়েতে সারাদিনের গল্প করতে করতে যা হোক দুটো পেটে দিয়ে পরে রেড়ির তেলের প্রদীপটা নিভিয়ে ভগবানের নাম করে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কিছুদিন থেকে মানময়ীর পেছনে লেগেছে পাড়ারই মুক্তো নাপতিনী।

বয়েস পঁয়ত্রিশের মধ্যে। আঁটসাট গড়ন। বিধবা। গাঁয়ের বৌঝিদের আলতা পরানোই কাজ। তাছাড়া কাজকম্মেও কিছু পেয়ে থাকে। আর এর গল্প ওর কাছে আর ওর গল্প তার কাছে করাতেই যেন বেশি আনন্দ। পাড়ার গেজেট। সবার হাঁড়ির খবর বোধহয় মুক্তোর নখদর্পণে। অথচ মুক্তোর খবরও কম মুখরোচক নয়। সবাই জানে, মুক্তোর নাগর একাধিক এবং শুধু তাই নয়, তারা ক্ষণস্থায়ী। মুক্তো সেজন্যে লজ্জিত নয়, বরং গর্বিত। বলে, পুরুষমানুষ যদি দশ গণ্ডা মাগ করতে পারে, আমি পছন্দমতো কটা নাগর করলেই দোষ?···আরো বলে সিঁদুরপরা কুলীন মেয়েদের দেখে,—অমন শাঁখা-সিঁদুর পরে যৌবন খোয়ানোর চাইতে বাপু শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে যৌবন ভোগ করচি, বেশ আছি।

মুক্তোর অমন সাফ কথায় মেয়েরা প্রথমটা আঁতকে উঠলেও অনেকেই হয়তো মনে-মনে সায় দিতো। আর দিতো বলেই মুক্তো মুক্তকণ্ঠে তাদের কাছে তার যৌবন-জয়যাত্রার কাহিনী বলতো রসিয়ে রসিয়ে।

তেমনি নিজের এবং অন্যের রসের গল্প এবং অবৈধ প্রেমের কাহিনী মুক্তো বলতে শুরু করেছিলো মানময়ীকে আলতা পরাতে এসে। এবং একদিন আলতা পরাতে পরাতে সুযোগ সুবিধে বুঝে বলেই ফেললো, দেখো দিদিমণি, ছোটো মুখে বড়ো কথা মানায় না জানি, তবু বাপু না বলেও পারিনে। তোমার অবস্থাটা দেখে পরানটা আমার ফেটে যায়। আহা, যৌবনে যোগিনী। কেন যে মুখ বুজে আছো—

—তা কি করবো? চেঁচাবো নাকি লো?—মানময়ী হেসে বলে।

—আহা, চেঁচাবে কেন? এসব কি পাড়া মাথায় করে চেঁচাবার জিনিস? —মুক্তো মুচকি হেসে বলে, একটু ইশেরা করলেই তোমার এই রাঙা চরণে—

শুনে হেসে ধমক দিলো মানময়ী: মর মাগী। তুই আজকাল পুরুষমানুষ যোগান দিচ্চিস নাকি?

মুক্তোও হেসে উত্তর দিলো: আমি কি পুরুষমানুষের ব্যবসা করি, না, তাদের পায়ে আলতা পরাতে যাই?···তবে কিনা···না, থাকগে।

কিন্তু মানময়ী আগ্রহ দেখালো: থাকবে কেন, শুনিই না?—সেই নারীর চিরন্তন কৌতূহল।

মুক্তো বুঝলো ওষুধ ধরেছে। তাই এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে একবার

দেখে নিয়ে নীচুগলায় বললো, ঐ যে গো ওপাড়ার দীনু কোবরেজের মেজ ছেলেটা···তোমাকে দেখে···

—আমাকে আবার কোথায় দেখলো ? হ্যাঁরে ?

মুক্তো বললো, তুমি নাকি কোনদিন চান করতে গেছলে গাঙ্গুলীদের পুকুরে, সেদিন তিনিও গেছলো ঐ পুকুরে মাছ ধরতে।···তা তোমাকে দেখে···

—মজে গেচে, না ?—মানময়ী হাসলো ঃ মনে পড়চে বটে কোবরেজ-পো মাছ তো ধরছিলো না, প্যাটপ্যাট করে আমাকে যেন গিলছিলো। তা মুখপোড়া ওখানে মরতে গেছলো কেন ?

—তা বুঝি জানো না ?—মুক্তো বললো হেসে, উনি যে গাঙ্গুলীদের খুব ভালোবাসার লোক গো। আর অমন চাঁদের মতো চেহারার মানুষটিকে বলতেচো, মুখপোড়া। বরং বুকপোড়া বলতে পারো ?

—সে আবার কি রে ?

—তোমার জন্যে তার নাকি বুকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্চে !

মানময়ী ঝটকা দিয়ে উঠলো ঃ বটে, মিনসে যেন বুকে ভিজে গামছা দিয়ে রাখে। নে, হলো তোর আলতা পরানো ?

মুক্তোর আলতা পরানো প্রায় শেষ হয়ে গেছলো। ভেবে দেখলো, প্রথম দিনেই বেশি এগোনো ভালো নয়, তাতে হাওয়া ঘুরে যেতে পারে। তাই বললো, তা হলো বৈকি ! দাঁড়াও নখের ডগাগুলো একটু রাঙিয়ে দিই। আহা, এমন পায়ে আলতা পরিয়েও সুখ। তা পুরুষমানুষের দোষ কি ? এমন পায়ে কে না পড়ে থাকতে চায় !

—নে, হয়েচে তোর আদিখ্যেতা !—মানময়ী হাসলো।

মুক্তো আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মানময়ীর নখের ডগাগুলো আরো খানিকটা রাঙিয়ে দিয়ে উঠলো। যাবার সময় বললো, ঘরে কি আছে দাও, যাই।

—দাঁড়া, দেখি।—মানময়ী উঠে একটা বাটিতে কিছু চিঁড়ে আর পাটালি এনে মুক্তোর কোঁচড়ে দিলো ঢেলে।

মুক্তো বললো, চলি।

মুক্তো চলে গেলো। আর সেই থেকেই মানময়ীর মনও যেন চলতে লাগলো ঐ গাঙ্গুলীদের পুকুরপাড়ে, ওপাড়ার দীনু কোবরেজের বাড়িতে, তাঁর মেজ ছেলেটার পেছনে পেছনে ! আহা, বুক পুড়ে যাচ্ছে !·· রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভালোই লাগলো মানময়ীর। স্বামী তো ভুলে আর আসে না, তার

কথা ভাবেও না হয়তো কোনোদিন, নতুন নতুন কুলীন-কন্যাদের কুলরক্ষা করে, আর সেখানে রাত কাটিয়ে মজায় আছে সে। অথচ আর একজন পুরুষমানুষ তাকে দেখে পাগল, তার কথা সেও হয়তো দিনরাত ভাবে, আর ভেবে ভেবে তার বুক পুড়ে যায়। তাহলে মানময়ীরও মান আছে, দাম আছে।···কিন্তু তারও যেন বুকটা কেমন কেমন করছে। ধ্যেৎ, ঘুমোই। পরপুরুষের কথা ভাবতে নেই। দোষের।···দুগগা শিহরি সিদ্দিদাতা গনেশ, দুগগা দুগগা।—মানময়ী মনেমনে ভগবানের নাম করে অন্ধকারে বোজা চোখ আরো বোজালো সে।

কিন্তু, আচ্ছা জ্বালা হলো তো। আচ্ছা কথা শুনিয়ে গেলো তো পোড়ারমুখী মুক্তো। কাজকর্মে দীনু কোবরেজের মেজ ছেলেটার মুখখানা কেবলি ভেসে ওঠে মানময়ীর মনে। ঝেড়ে ফেলতে গেলেও যেন মনের পটে আঠার মতোই লেগে থাকে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন হাসতে থাকে।

গাঙ্গুলীদের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কেবলি মনে হয় ঐ বুঝি সে দাঁড়িয়ে, কিংবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। বিকেলে গা ধুতে গিয়ে মনে হয়, বোধহয় এতক্ষণ ছিলো সে মাছ ধরবার জন্যে বসে। একটু আগেই উঠে গেছে। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে মনে হয়—ও বুঝি কেষ্টঠাকুরের মতো কদমগাছের ডালে বসে বাঁশি বাজিয়ে তাকে ডাকছে ইশারায়।···মহা জ্বালা হলো তো।

মা মোক্ষদাসুন্দরীও লক্ষ্য করলেন, মেয়ে যেন কেমন আনমনা। পেছন থেকে ডাকলে চমকে ওঠে, অনেক সময় কথার ভুলভাল উত্তর দেয়, কোনো কাজ করে রাখতে বললে ভুলে যায় সেটা করতে। এমন তো ছিলো না মানময়ী।

—হ্যাঁরে, তোর কি হয়েচে? শরীর খারাপ?—মোক্ষদাসুন্দরী জিগ্যেস করেন একদিন।

—না, তেমন কিছু না।—মেয়ে উত্তর দেয়।

—লুকোচ্চিস কেন? বল না আমাকে।—মা ছাড়েন না সহজে।

কাজেই মিথ্যে কথা বলতে হয়ঃ পেটটায় মাঝে মাঝে ব্যথা করে।

—পেট? ব্যথা? কিসের ব্যথা? দেখি।—সভয়ে মোক্ষদাসুন্দরী মানময়ীর কোমরের কসি টেনে খুলে পেট টিপে দেখেনঃ অম্বলের ব্যথা নয় তো রে? দীনু কোবরেজকে ডাকবো?

মানময়ী বলে, না, দরকার নেই। খাওয়ার বোধহয় গোলমাল হয়েছিলো। মানময়ী চাপা দেয় প্রসঙ্গ।

পাঁচ-সাত দিন পরেই আবার এলো মুক্তো। মুক্তোর মতো দাঁত বার করে একগাল হাসি। এলো সে সময় বুঝেই যখন মোক্ষদাসুন্দরী অন্য কোনো বাড়ি যান কাজে।—বারান্দায় বসে মানময়ী চরকা কাটছিলো।

— তুই এরি মধ্যে এলি যে ? - মানময়ী জিগ্যেস করে।

মুক্তো ঠোঁটের হাসি তেমনি রেখেই বলে, আমি এলাম নাকি গো ? তিনিই তো পাঠালো।

মানময়ীর একবার মনে হলো বলে—বেরো তুই।···কিন্তু তা সে বলতে পারলো না। বললো, আজ আমি আলতা পরবো না।

—কিন্তু আমি যে আর তিস্টুতে পারিনে গো দিদিমণি :—মুক্তো মুখ-খানাকে বিষন্ন করে তোলে : কেবলই এক কথা, আমার সঙ্গে তোমার দিদিমণির একটু দেখা করিয়ে দাও না গো।···আমি যতো বলি···

—তুই থাম তো।—মানময়ী তাকে থামিয়ে দেয় : পরপুরুষের কথা শুনতে নেই।

শুনে চোখদুটো কপালে তোলে মুক্তো : পর আবার কে গো ? পরপুরুষই তো একদিন বর হয়। আর শোনোনি, আপন চাইতে পর ভালো।

মানময়ী হেসে বলে, থাক আর শিক্ষে দিতে হবে না। মাগী মালিনী মাসী হয়ে এসেচে।

মুক্তো হেসে বললো, আমিও তো তিনিকে ঐ কথাই বললাম গো। আমি ঐ মালিনী মাসিগিরি করতে পারবোনি।···তা তিনি যে সে কথা শোনে না।

মানময়ী যেন প্রসঙ্গটা চালাতেই চায়। তাই চরকার হাতল ঘুরিয়ে সুতোর পাক দিতে দিতেই বলে, তা তাকে একটা বিয়ে করতে বল না।

—তা কি আর বলিনি।—মুক্তো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় : তাতে বলে কি জানো ? যাকে মন দিয়েচি, তার জন্যে যদি পান দিতে হয়, সেও ভালো।

—সে কি রে ? ···আঁতকে ওঠে মানময়ী : শেষে কেলেংকারি করবে নাকি ? আচ্ছা মানুষ তো।

—এখন কি করি বলো তো দিদিমণি ?···মুক্তো বোকা সাজে।

—কী আর করবি ? বাড়ি যা।—মানময়ী হাসে।

কিন্তু মুক্তোর আবার প্রশ্ন : কিন্তু কি বলি তাকে ?

—বলবি, কায়েতনি বলেচে, মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে একদিন দেখা করে আসবে সে। বুঝলি ?···মানময়ী এবার জোরে চরকা চালায়।

—তা'লে উঠি ?—মন্তো যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই ওঠে।

কিন্তু মানময়ী কোনো উত্তর দেয় না। যেন শোনেইনি। আরো জোরে হাত চালায় সে।

মন্তো চলে গেলেই মানময়ী চরকা চালানো থামিয়ে দিলো। উঠে পড়লো সে। বারান্দা থেকে ঘরে এসে শুয়ে পড়লো খাটে। বুকটা যেন ধড়ফড় করছে। অমন শক্ত কথাটা না বললেই যেন ভালো ছিলো। যদি তাকে বলে ? কী ভাববে সে ? শেষে না কিছু করে বসে। কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো কথাটা। আহা, তবু তো একটা মানুষ ভাবে, মুখেও তো বলে অন্তত তাকে না পেলে প্রাণ দেবে। অথচ তাকেই···

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো মানময়ী। ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে ঃ কীরে, এই অবেলায় ঘুমোচ্চিস যে বড়ো ?

—এই এমনি।—ধড়ফড় করে উঠে পড়ে মানময়ী।

—শরীর ভালো তো ?—মা সন্দেহের মন নিয়েই জিগ্যেস করলেন।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাকে ভাবতে হবে না।···মানময়ী উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি গুছিয়ে পরলো।

মোক্ষদাসুন্দরী নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, শুনে এলাম কাল বিকেলে শিবতলায় নাকি রামায়ণপাঠ হবে। কোথা থেকে এক কথকঠাকুর এয়েচেন। যাবি নাকি শুনতে ?

—তা যেতে পারি।—মানময়ী বললো। ভাবলো, যদি মনটা একটু ভুলে থাকে।

পরদিন বিকেলে সেজেগুজে মানময়ী মায়ের সঙ্গে গেলো শিবতলায় রামায়ণ পাঠ শুনতে। চিকের আড়ালে গিয়ে বসলো। পাড়ার আরো অনেক মেয়েরা এসেছে, আরো আসছে। এসে দূর থেকে কথকঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বসছে। আর তার পরে নাকের নথ আর কানের মাকড়ি নেড়ে গল্প। হেঁসেলের গল্প, শাড়ি-গহনার গল্প, পাড়া বেড়াবার গল্প, বরের গল্প, (যদি কপালগুণে এসে থাকে) এবং পরচর্চা। বাইরে পুরুষরাও জমা হচ্ছে একে-একে। গ্রাম সুবাদে জেঠা, খুড়ো, মামা, দাদা সবাই জমে গেছে নানারকম আলোচনায়।

বিরাট বটগাছের নীচেয় শিবমন্দির। মন্দিরের সামনে গোবর-নিকানো পরিষ্কার মাটিতে শতরঞ্চি পাতা শ্রোতাদের জন্যে। সামনে সামান্য উঁচু একটা জলচৌকিতে বসেছেন কথকঠাকুর। প্রৌঢ়। গৌরবর্ণ। দোহারা চেহারা।

মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুলগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। গলায় বেলফুলের মালা। গায়ে একটা চাদর।

একটু পরে শুরু হলো রামায়ণ-পাঠ। সুরেলা গলায় কথকঠাকুর ঈশ্বরের নাম গান করে শুরু করলেন 'রামের বনবাস'। পিতৃসত্য পালনের জন্যে চোদ্দ বৎসর বনে বাস, সঙ্গে সীতা এবং লক্ষ্মণ। বিমাতা কৈকেয়ীর কুটবুদ্ধির জন্যে অভিষেকের দিনই শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের ব্যবস্থা। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজ্য-সিংহাসন—সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র চলেছেন বনে। রাজপুরীর সানাই গেছে থেমে, কল্যাণশংখ গেছে স্তব্ধ হয়ে, তার জায়গায় চলেছে হাহাকার দীর্ঘশ্বাস আর অবিরত ক্রন্দনরোল। রাজধানী শোকাচ্ছন্ন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কথকঠাকুর ভাবাবেগে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন সেই করুণ বিচ্ছেদ-দৃশ্যের। শ্রোতারা বিষণ্ণ হতবাক। চিকের আড়ালে মেয়েরা অনেকেই সজল অশ্রুবিগলিত। মানময়ীও।

মানময়ী ভাবছে সীতার কথা। হতভাগিনী, তবু সৌভাগ্যবতী। রাজ্যসুখ হাতছাড়া হলো বটে, কিন্তু প্রাণেশ্বর হাতের কাছেই রইলেন। আর সে? সধবা হয়েও বিধবা···ছি ছি, কী অলুক্ষণে কথাই মনে হলো তার! মনে-মনে জিব কাটলো সে।···সীতার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হলো তার সাবিত্রীর কথা, পরে বেহুলার কথা। ধন্য এঁদের সিঁথের সিঁদুর। যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন স্বামীকে, উনি ফিরিয়ে আনলেন স্বামীকে নেচে গেয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। আর সে? স্বামী তার বেশি দূরেও নয়, মাত্র কয়েকখানা গাঁয়ের পরেই, কয়েক ক্রোশ তফাতে মাত্র, অথচ বাপ মারা যাবার পর একদিনও তাকে আনতে পারলো না সে। ছি ছি।

মানময়ী বিমনা হয়ে গেলো। রামায়ণ-পাঠ দেখতে লাগলো সে, তার কানে গেলো না কিছুই। ভাবতে লাগলো স্বামীর কথা, কি করে তাকে আনানো যায়? কাকে দিয়ে খবর পাঠানো যায়? আর সুতো কেটে যা জমিয়েছে এতোদিন কুলুঙ্গিতে মাটির ভাঁড়টায়, তা দিয়ে প্রণামীর টাকাটা হবে তো?

হঠাৎ চমকে উঠলো মানময়ী। দেখলো দীনু কোবরেজের মেজ ছেলে উমাচরণ আসরের কাছে এসে দাঁড়ালো। মানময়ী চোখ ভরে দেখতে লাগলো: বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। তার চাইতে বছর দুয়েকের বড়ই হবে হয়তো। খালি গা, কাপড়ের খোঁটটা কোমরে বাঁধা। সারা গায়ে মাংসপেশীর ভাঁজ আর ভাঁজ। দীর্ঘ বাবরি করা চুল, চকচক করছে বাঁধা

ফুলেল তেলে। গোঁফজোড়াও বেশ পাকানো। আবার পাখির শখও আছে, হাতে একটা বুলবুলি।

এতক্ষণ মানময়ী রামায়ণ-পাঠ দেখছিলো শুধু, তাও শেষে বন্ধ হলো। একমনে সে উমাচরণকে দেখতে লাগলো প্রাণ ভরে, চোখ ভরে। ··উমাচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রামায়ণ-পাঠ শুনতে লাগলো, একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো আসরটার দিকে, একবার মেয়েদের চিকের দিকেও। তাকে—তাকে খুঁজচে নাকি? তাই বুঝি।

কিন্তু এ কি! উমাচরণ চলে যাচ্ছে যে! চলে গেলো যে! রামায়ণ-পাঠ শুনলো না যে! এলোও তো দেরি করে, আবার চলেও গেলো একটু থেকেই। আজকালকার ছেলে কিনা! ধম্মকম্মোর দিকে মন নেই! নাকি, অন্য কোনো মেয়ের দিকে মন? কে জানে! পুরুষের মন!

একবার উঠে যাবে নাকি? গিয়ে দাঁড়াবে উমাচরণের সামনে? বলবে, সে কি এতোই সুন্দরী যে তার জন্যে···

—কি লো, এতো উসখুস করচিস কেন? বোস না থির হয়ে!—মুখুজ্জেদের অম্বা ঠেলা দিলো মানময়ীকে।

হয়তো মনের চাঞ্চল্য বাইরেও প্রকাশ পেয়েছিলো, তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মানময়ীই ধমক দিলো : থাম। শুনতে দে।

এবার একটু কান দিতেই মানময়ীর কানে এলো : রাজবধূ সীতা পরমপতি শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন, কেঁদে কেঁদে বললেন, প্রাণনাথ, আমি সুখ চাইনে, তোমার সঙ্গই আমার সুখ। আমি ভোগ চাইনে, তোমার শ্রীচরণসেবাতেই আমার সুখভোগ। আমি ধনরত্ন কিছুই চাইনে, তুমিই আমার ঐশ্বর্য···

সত্যিই তো! পতিই পরম গুরু! পতিই পরম গুরু। সে যা ইচ্ছে করতে পারে, তা বলে আমি কেন করতে যাবো?···মানময়ী মনকে সান্ত্বনা দেয় : পুরুষমানুষদের সবই মানায়। আর সে যে আর পাঁচটা বিয়ে করচে, তা তো করবেই। কুলীনের কাজই তো কুলধর্ম রক্ষা করা। বৌয়ের ভেড়ো হয়ে শুধু তাকে নিয়েই পড়ে থাকবে নাকি? নইলে উনি লোক তো মন্দ নন, দেখতে শুনতেও বেশ।···আর আদর যত্ন করলে··তাছাড়া মদ খায় না, গাঁজা খায় না—মানে, মনে তো হয় না—সেটাও কি কম!

পরদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে মানময়ী গেলো তার সই 'টগরফুল'-এর কাছে—মানে টুলো-পণ্ডিত নিত্যানন্দ বাঁড়ুজ্জের মেয়ে গিরিবালার সঙ্গে দেখা করতে। কুলীন-কন্যা, বাপের বাড়িতেই থাকে। তবে সধবা হয়েও বিধবা নয়, সত্যিই সে বিধবা। গাঁয়ের লোকেরা বলে, নিতাই ঠাকুরের যেমন কম্মো, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে গেলো, তাইতো মেয়েটার হলো অমন দশা! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শাঁখা সিঁদুর ঘুচলো, একটু মাছ মুখে দেওয়াও হলো বন্ধ।…বলি হিন্দুর মেয়ের ঐ সব খেরেস্টানীপনা সহ্য হয় নাকি! হুঃ!

গিরিবালারও এক-একসময় মনে হয় কথাটা হয়তো ঠিক। অমন 'ন্যাকাপড়া' না শিখলেও হতো! তখন সে-ই বাপের কাছে আবদার করে একটুআধটু লেখাপড়া শিখেছিলো—এই একটু দরকার মতো চিঠিপত্র লেখা বা রামায়ণখানা পড়া। তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো! কীসে যে কী হয় বাপু বোঝা যায় না ঠিক! আবার এও ভাবে গিরিবালা, ঐ যে ক্ষ্যান্তমণি, হরিদাসী, লবঙ্গলতা—ওরাই বা কেন বিধবা হলো? ওরা তো কেউ লেখাপড়া জানে না! আসলে সব কপাল! কপাল!

—ওরে ও টগরফুল, আচিস নাকি বাড়ি?—গিরিবালাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় মানময়ী।

গিরিবালা ঘরে ছিলো। বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বললো, বাবা, টগরফুল যে! তোর তো আর দেখাই পাওয়া যায় না! একেবারে ডুমুরের ফুল হয়েচিস!

—হ্যাঁ হয়েচি। চল, ঘরে চল—মানময়ী গিরিবালাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলো: বলি, তুই কী এমন সুজ্জমুখী ফুল হয়ে আমার জন্যে হেদিয়ে আচিস বল তো? যাক, তোর বাড়ির সব কোথায়? মাসীমা মেসোমশায়?

—মা ওঘরে ঘুমুচ্চে। বাবা সদরে গেচে। বৌদিও ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্চে বোধহয়।—গিরিবালা হিসেব দিয়ে জিগ্যেস করলো, কেন রে?

—দরকার আছে। দরজাটা বন্ধ কর!—মানময়ী হাসলো।

এবার সত্যিই অবাক হলো গিরিবালা। দরজাটা বন্ধ করে জিগ্যেস করলো, কেন রে ?

মানময়ী গিরিবালার থুতনিটা নেড়ে দিয়ে হেসে বললো, তোর সঙ্গে পীরিত করতে এলাম !

গিরিবালা বললো, নে, রঙ্গ রাখ। বোস।···বলি, পীরিত করতে চাস তো এমন রূপ নিয়েও পুরুষমানুষ যোগাড় করতে পারিসনি ?

—পুরুষমানুষে ঘেন্না ধরে গেচে !

—তাই বুঝি এখন মেয়েমানুষে ধরবার জন্যে এয়েচিস ?

—হ্যাঁ লো হ্যাঁ !

—দেখচি, খুব যে রং ধরেচে !

—বড্ডো।

—তা বরকে খবর দে না !

—সেও তো পুরুষমানুষ রে !

—তবু তো নিজের মানুষ ? দেখ না একবার খবর দিয়ে।

মানময়ী হেসে বললো, সেই জন্যেই তো তোর কাছে আসা।

—আমার কাছে ?—গিরিবালা হাসলো : আমি কাচা-কোচা এঁটে তোর বরকে ধরে আনতে যাবো নাকি লো ?

—তা যাবি কেন !

—তবে ?

—বলি, তোর আঁচলের তলায় লুকিয়েও তো রাখতে পারিস ?

—ও, তাই দেখতে এয়েচিস ?

—মনে কর তাই।—বলেই মানময়ী বললো, নে, দোয়াত কলম বার কর তো। চিঠি লেখ।

—কাকে রে ?—গিরিবালা জিগ্যেস করলো।

—বরকে। আবার কাকে !—মানময়ী বললো, লেখ প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ ! শীগগির এসো। তোমার দাসীর মন হায়-হায় করচে, দেহ খাই-খাই করচে···

বলেই মানময়ী হেসে ঢলে পড়লো গিরিবালার গায়ে। পরে হাসি থামিয়ে বললো, সত্যি বলচি, কোথায় তোর দোয়াত কলম কাগজ, নিয়ে আয়। লেখ তো একখানা চিঠি বেশ ভালো করে, মনের মতন করে, গুছিয়ে—

অগত্যা গিরিবালাকে বার করতে হলো কুলুঙ্গি থেকে ভুসো কালি ভরা মাটির দোয়াত, খাগের কলম আর তুলোট কাগজ একখানা। বুকে বালিশ

দিয়ে উপুড় হয়ে মেঝের শুয়ে পড়ে কলম হাতে গিরিবালা বললো, বল তোর ভাতারকে কি লিখতে হবে ?

মানময়ী কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়ে বললো, লেখ—শ্রীচরণকমলেষু শতকোটি প্রণামমিদং—লেখ, আপনার হতভাগিনী দাসী শ্রীমতী মানময়ী আপনার বিরহে···না, না, লেখ আপনার জন্য—কি বল না ?

—আমি কি বলবো ?—গিরিবালা খিলখিল করে হেসে উঠলো : তোর ভাতারকে আমি প্রেমপত্তর লিখতে যাবো নাকি ?

—হ্যাঁ, তাই লেখ।—মানময়ী বললো, আমার বাপু মনে আসচে না কথাগুলো। তুই তো ন্যাকাপড়া শিখেচিস—বেশ পারবি গুছিয়ে লিখতে।

—তবে শোন, মুখে বলি আর লিখি। যেখানে না হবে বলবি।—গিরিবালা লিখতে লাগলো : আপনার অভাব প্রতি মু···দুর 'মুহূর্ত' বানান আবার ঠিক জানা নেই, লিখি, প্রতি দিনরাতে বোধ করিতেছি। আপনি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া যত শীঘ্র হয়, একদিন আসিবেন। না হইলে প্রাণে বহু কষ্ট ও বেদনা অনুভব করিবো।···ঠিক হচ্চে তো ?

—হ্যাঁ।

—আর কি লিখবো বল ?

—আর কি ?—মানময়ী বললো, লেখ, অধিক আর কি লিখিবো ? ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার শ্রীচরণের দাসী,
শ্রীমতী মানময়ী দাসী।

মানময়ী চিঠি লিখিয়ে সেখানি প্রায় দু'তিন ক্রোশ দূরে কল্যাণপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাবারও ব্যবস্থা করলো। অবশ্য 'ডাকটিকিট' খরচ হিসেবে গাঙ্গুলীবাড়ির রাখাল সুবলকে দিতে হলো সের দুই চিঁড়ে, সেরখানেক গুড় আর একখানা লাল গামছা। লাল গামছাই তার শখ। এবং 'পিওন' পরদিনই এসে একগাল হেসে জানালো, আপনার ন্যাকা দিয়ে এইচি দিদিমণি ঠিকমতন জায়গাতেই।

সেদিন সন্ধ্যায় মানময়ী তুলসীতলায় প্রণাম করে জানালো, ঠাকুর, দয়া করো।

মানময়ী শোবার ঘরখানার ঝুল ঝেড়ে, ঝাঁট দিয়ে, অগোছালো জিনিসপত্র গুছিয়ে দিব্যি ছিমছাম করে তুললো পরদিন। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বার করলো বাক্স থেকে।

মোক্ষদাসুন্দরী বললেন, কী রে মানু, হঠাৎ যে এতো গোছগাছ ! কী রে ?

মানময়ী হেসে বললো, এই এমনি ।

কিন্তু এমনিতেই যে এমনটি করে গোছাতে লাগে না কেউ, তা বুঝতে মোক্ষদাসুন্দরীর দেরি হলো না । বললেন, জামাই আসবে নাকি ?

মুখ টিপে বললো মানময়ী, কী জানি !

—ওঃ নিজে জানিসনে, অথচ জানান দিচ্চিস তো ঠিক !—হাসলেন মোক্ষদাসুন্দরী : কবে আসবে ?

—তা জানিনে ।

মোক্ষদাসুন্দরী বুঝলেন, সেটা মেয়ের না জানারই কথা ।

শুধু ঘর গোছালেই তো হয় না, পতি পরম গুরুটির জন্যে গুরুদক্ষিণাও তো দরকার । অবশ্য কিছু যে টাকাকড়ি জমেনি তা নয় । তবু মানময়ী জোলাপাড়ার নিতাই জোলাকে ডাকিয়ে তার কাটা সুতো যা ছিলো বিক্রি করে দিলো । যাক, কিছু এলো হাতে ।

বিকেলে এলো মুক্তো : দিদিমণি, আলতা পরবে নাকি ?

—আলতা ?—মানময়ী কী যেন ভেবে বললো, দে পরিয়ে ।

আলতা পরাতে পরাতে একথা-সেকথা বলে শেষে পাড়লো আসল কথা : লোকটা যে পাগল হয়ে গেলো !

মানময়ী গম্ভীর হয়ে বললো, পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখ্‌গে যা ।

মুক্তো ঝটকা দিয়ে বললো, আমার ভারি দায় পড়েচে !

—তবে যা করচিস কর !

মুক্তো বুঝলো, এখনো মেয়েটার তেজ কমেনি । কাজেই অন্য কথা শুরু করলো আলতা পরাতে পরাতে ।

কিন্তু আশ্চর্য, সেইদিনই সন্ধ্যায় মূর্তিমান উমাচরণ স্বয়ং গাঙ্গুলীদের পুকুরঘাটে উপস্থিত ! বুঝি দেখলো, দূতীকে দিয়ে যখন কিছু হলো না তখন নিজেই শেষ চেষ্টা করা যাক ।

মানময়ী যথারীতি কলসী কাঁখে পুকুরে গা ধুতে যাচ্ছিলো । একটু সন্ধ্যাও হয়ে গেছলো সেদিন । ঘাটেও কেউ ছিলো না । যেন আবহাওয়াটা উমাচরণের স্বপক্ষেই । মানময়ী ঘাটের দিকে যেতেই উমাচরণ ঝোপের আড়াল থেকে অল্প একটু বেরিয়ে মৃদু গলায় কাশলো ।

কাশির শব্দে মানময়ী চমকে চেয়ে দেখে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে উমাচরণ । বললো, আমি ।

—এখেনে কেন ?—ভয় পেলেও মনে সাহস আনলো মানময়ী।

—তোমাকে দেখতে।

—বটে! দেখতে!—আরো সাহস পেলো সেঃ দেখাবো মজা ? চেঁচাবো ?

—তোমার পায়ে ধরি।

—তোমার গলায় দড়ি! লজ্জা করে না ?

—আমি পাগল হয়ে যাবো মানময়ী।

—হওগে যাও! যাও এখান থেকে!

—যাচ্চি। কিন্তু আবার দেখা পাবো তো ?

—না। তুমি যাবে কি না ?

—যাচ্চি, যাচ্চি। কাল সন্ধ্যের পরে আবার আমি এখানে আসবো। তুমিও এসো।

মানময়ী সে কথা শুনেও শুনলো না। আর দাঁড়ালো না সেখানে। কোথায় কে দেখে ফেলবে কে জানে! আচ্ছা লোক তো!

মানময়ীর গা ধোয়া আর হলো না। তাড়াতাড়ি এক কলসী জল নিয়ে বাড়ি চলে এলো। ফেরবার সময় আড়চোখে ঝোপটার দিকে একবার দেখলো সে—না, সরে পড়েছে।

নাঃ, লোকটা সত্যিই বুঝি পাগল হবে।···মানময়ী ভাবতে লাগলো ঃ আমি কি এতোই সুন্দরী ? চক্কোত্তিদের বাড়ির গোলাপবালার মতো ? না, গায়ের রং অতো ফরসা না হলেও কালোও নই বাপু।—বাঁহাত দিয়ে কলসী ধরা, তাই ডানহাতখানা একবার দেখে নিলো ঃ তাছাড়া সবাই তো বলে মুখ-চোখের ছাঁদ নাকি বেশ ভালোই। আর নইলে একটা পুরুষমানুষ হঠাৎ ভুলবেই বা কেন ?·· কিন্তু বলচে যে দেখা করতে, তারপর ? যদি কেউ দেখে ফেলে ? যদি ধরা পড়ে যাই ? যদি কিছু হয়ে যায় ? তখন ? তখন কোথায় দাঁড়াবো ? কি হবে ?···

দূর! ওর কথাই ভাবচি কেন ? আজকালের মধ্যেই হয়তো বর এসে পড়বে। তখন তার পা জড়িয়ে ধরে বলবো, আমায় নিয়ে চলো, তোমার দাসী হয়ে থাকবো। তোমাকে খেতে পরতে দিতেও হবে না। আমি সুতো কেটে খাবো। তাতে কি আর তার মন গলবে না ?

১৫

মানময়ীর চিঠিতে শ্রীমান ভবতারণ ঘোষের মন গলবার কথা নয়, তবু ভাগ্য ভালো বোধহয় মানময়ীর, তাই জামাইসাজে ভবতারণ পরদিন শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত। কারণটা মানময়ীর মান ভাঙাতে নয়, বরং অতি সাধারণ কারণ—টাকার টান। নইলে কুলীন জামাই—কথা নেই বার্তা নেই, কেউ এলো না সাধ্যসাধনা করতে, শুধু একখানা চিঠিতেই কাজ হাসিল হয় কখনো! কিন্তু ভবতারণ দেখলো হাত খালি। তাছাড়া ইতিমধ্যে অন্য শ্বশুরবাড়ি থেকেও কোনো আবেদন-নিবেদন দরখাস্ত বা শ্বশুরপক্ষীয় কারোর সশরীরে আমন্ত্রণ, কিছুই এসে পৌঁছয়নি। কাজেই অযথা মান না বাড়িয়ে মানময়ীর চিঠির মান রাখাই ঠিক করলো সে।

প্রথমটা ভবতারণ ঠিক বুঝতে পারেনি। মানময়ী আবার কে রে বাবা? 'দাসী' যখন লিখেছে তখন বৌ-ই হবে নিশ্চয়ই। খাতাটা খুলে একবার দেখতে হবে। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হতেই, সামনে সুবল তখনও দাঁড়িয়েছিলো, তাকেই জিগ্যেস করলো, কোন গাঁ থেকে এয়েচিস?

—এজ্ঞে, মানিকপুর।

মানিকপুর বলতেই আবছা মনে পড়লো ভবতারণের : ঐ কী বলে চণ্ডীচরণ মিত্তিরের বাড়ি নাকি? সদরে মুহুরীগিরি করে?

—এজ্ঞে, এখন আর করতে পারেন না।—সুবল উপরে আকাশ দেখিয়ে বললো, তিনি ঐ সগ্‌গে গেচে কিনা!

বটে, ঠিকই তো! ভবতারণের ক্রমে সব মনে পড়লো। শ্বশুর মারা যাওয়ায় তাঁর শ্রাদ্ধে যাবার জন্যে খবর এসেছিলো বটে। তবে তখন সময়াভাবে যাওয়া হয়নি, আর সময় থাকলে যেতো কিনা সন্দেহ।

ভবতারণ চিঠিখানা হাতে মুড়তে মুড়তে বললো, আচ্ছা, যা তুই আমি দেখচি।

সুবল মাথা নিচু করে একটা সুগভীর প্রণাম জানিয়ে চলে এলো।

ভবতারণ ভাবলো, এতদিন পরে হঠাৎ এতো তাগিদ কেন? হয়তো কাউকে দিয়ে বাধিয়ে বসেছে, তাই একবার আমাকে নিয়ে গিয়ে বুড়ি ছুঁতে চায়। তা যদি হয় তবে তো মোটা রকম দাঁওই মারা যাবে।

ভবতারণ তাই আর দেরি না করে দু'একদিন পরে রওনা হলো মানিকপুরের দিকে।

মোক্ষদাসুন্দরীর শরীরটা সেদিন ভালো ছিলো না। বাতের ব্যথাটা বেড়েছিলো তাঁর, তাই আর তিনি কোনো কাজে যাননি সেদিন। শুয়ে ছিলেন। মানময়ী গেছলো পাড়া-বেড়াতে। এমন সময় বাইরে কোনো এক পুরুষের গলা শোনা গেলো ঃ বাড়িতে কেউ আছেন নাকি?

মোক্ষদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠে, কাপড়টা কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে মাথায় টেনে বাইরে এসে দেখেন, জামাতাবাবাজী উঠোনে দাঁড়িয়ে। আহা, যেন অমাবস্যায় আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।

—এসো বাবা, এসো। উঠে এসো, ঘরে এসো।—মোক্ষদাসুন্দরী সাদরে ডেকে আনলেন জামাইকে ঘরে ঃ তারপর বাবা ভালো আছো তো?

—হ্যাঁ।—বলেই জুতোসুদ্ধ পায়েই ভবতারণ ঘরে ঢুকে খাটের উপর বসলো। শ্বাশুড়ি ঠাকরুণকে প্রণাম করবারও দরকার মনে করলো না।

মোক্ষদাসুন্দরী জিগ্যেস করলেন, বাড়ির সব ভালো তো? বেয়াই মশাই বেয়ান ঠাকরুণ? ছেলে মেয়েরা?

ভবতারণ গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ।

মোক্ষদাসুন্দরী ভাবলেন, জামাতাবাবাজী বোধহয় তাঁর সঙ্গে বেশি বাক্যালাপ করতে চান না, তাই তাড়াতাড়ি বললেন, তুমি বসো বাবা, মানু হয়তো পুকুরে গা ধুতে গেচে, তাকে ডেকে আনিগে।

মোক্ষদাসুন্দরী জানতেন, মেয়ে পাড়া-বেড়াতে গেছে। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবাড়ি-ওবাড়ি মেয়ের খোঁজে। দু'এক বাড়ি খুঁজে শেষে বাসনাময়ীর ওখানে পেলেন মানময়ীকে। তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেই বাসনাময়ীকে বললেন, যেয়ো ভাই, জামাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে এসো।

তারপর মোক্ষদাসুন্দরী ঘুরতে লাগলেন এবাড়ি-ওবাড়ি। হাওয়ায় উড়তে লাগলেন যেন। মেয়েদের বলতে লাগলেন, ওলো তোরা গা-টা ধুয়ে আসিস—জামাই এয়েচে, একটু আলপে করে যাস।···গিন্নীদের ডেকে বললেন, বুঝলে দিদি, জামাই এয়েচে। আহা, সোনার চাঁদ ছেলে। যেমন মিষ্টি কথাবাত্তা তেমনি ব্যাভার!··তারপর যে বাড়িতে চাওয়া চলে সেখানে জামাই আগমনের খবরটা দিয়েই বললেন, দিদি, খানিকটা দুধ দেবে? কোথাও বা খানিকটা তেল। কারোর বাড়ি থেকে চন্দ্রপুলি। কোথাও বা সরু দাদখানি চাল।

ওসব বাড়িতে মোক্ষদাসুন্দরী গতর দিয়ে খাটেন, তাদের দায়ে-দৈবেতে

দাঁড়ান। কাজেই হাতে কিছু নিয়েই ফিরতে পারেন তিনি। আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মৌখিক খবরের কাগজের হেডলাইনের খবরটা যে দিতে পারলেন, তাতেও তিনি চীফ-রিপোর্টারের আত্মপ্রসাদে গদগদ হয়ে গেলেন। অবশ্য খবরটায় অনেকেই খুশি হলো, অনেকেই আড়ালে ঠোঁট বাঁকালো, আর কুলীন-কন্যাদের অনেকেই মনেমনে ফেললো দীর্ঘশ্বাস।

অন্য কোনো বাড়িতে, মানে, যে বাড়িতে আরো পাঁচজন আছে সেখানে জামাতাবাবাজী বৌয়ের দেখা পায় সেই রাত্রে শোবার সময়। তার আগে শালা-শালীর আবদার সহ্য করতে হয়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির আদর-আপ্যায়নে আপ্লুত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ বাড়িতে যখন দুটিই মাত্র স্ত্রীলোক, তার একজন যথাসম্ভব আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাড়ায় জানান দিতে লেগেছেন তখন আসল স্ত্রীলোকটিকেই বার হতে হলো ভবতারণের সামনে।

তবে তার আগে মানময়ী তাড়াতাড়ি চালের বাতা থেকে চিরুনিটা নিয়ে চুলটা যেমন-তেমন করে আঁচড়ে বেঁধে নিলো. আড়া থেকে ভিজে গামছাটা টেনে নিয়ে মুখখানা ঘসে নিলো। কিন্তু পরনের শাড়িখানা বদলাতে পারলো না। কারণ শোবার ঘরেই ভবতারণ বসে।

মানময়ীর বুকটা ঢিবঢিব করতে লাগলো। আনন্দে? আশংকায়? কী জানি কেন? সে মাথায় ঘোমটা টেনে মৃদুপায়ে ঘরে ঢুকলো। দেখলো, ভবতারণ খাটে বসে জুতোসুদ্ধ পা দোলাচ্ছে।

মানময়ী সোজা এসেই স্বামীর পায়ের কাছে বসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। পরে মুখখানি অন্য দিকে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলো, শরীর ভালো তো?

গম্ভীর গলায় ভবতারণ বললো, হ্যাঁ।

—বাবা-মা ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ।

—বাড়ির আর সবাই?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি যে মোক্তারের জেরা শুরু করলে!—ভবতারণ বেশ চড়া গলাতেই বললো, তা হঠাৎ অমন তলব কেন?

—এমনি।

—এমনি!—মুখখানা বিকৃত করলো ভবতারণ : বলি, খুলেই বলো না।

—কি বলবো?—মানময়ী যেন শুকনো গলাতেই বললো।

—বলি—ভবতারণ নীচু গলায় বললো, বলি, পেটে কিছু এয়েচে নাকি?

মানময়ী তেমনিই মুখ ঘুরিয়ে কঠিন সুরে বললো, না।

—তবে ?

—কেন, ইস্তিরির কাছে সোয়ামীর আসতে নেই ?

—তা নেই কেন ?—ভবতারণ মুখ বেঁকিয়ে বললো,তবে স্ত্রী তো একটা নয়। আরো পাঁচটা আছে, কাজেই এতো সময় কোথায় ?

এমন সময় ঘরের বাইরে মোক্ষদাসুন্দরীর গলা পাওয়া গেলো: মানু,মানু এয়েচিস নাকি ?

মায়ের গলা পেয়ে মানময়ী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে। একখানা ঝামাপাথরে কে যেন এতোক্ষণ তার বুকখানা ঘষে ঘষে ক্ষতবিক্ষত করছিলো। একবার নিজের বুকখানা হাত দিয়ে চেপেও ধরলো সে।

—ওমা! তুই ঘরে ছিলিস ?—মোক্ষদাসুন্দরী যেন অপ্রস্তুতে পড়লেন: তা যা যা, গল্প করগে।

—না। তুমি যাও।—মানময়ী বললো, আমি আসচি।

মানময়ী রান্নাঘরে ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে কাঁদতে লাগলো। হায়, এইজন্যে এতো আশা, এতো চেষ্টা। পোড়া কপাল আমার। এর চেয়ে মরণ হলেই যে ছিলো ভালো!

একটু পরেই বাসনাময়ী এলো: কই দিদি তোমার জামাই ?

মোক্ষদাসুন্দরী বেরিয়ে এসে বাসনাময়ীকে ডেকে আনলেন ঘরে: এসো ভাই, এসো।

একটু পরেই এলেন পড়ার আরো দু'চারজন গিন্নী। মানময়ী তখনো রান্নাঘরে। কান্নার আবেগ ততক্ষণে অনেকটা কমেছে, বুকটা হয়েছে হালকা। এমন সময়ে বাইরে উঠোনে গলা পেলো গিরিবালার: কই লো টগরফুল, তোর বর কোথায় লো ?

এবার মানময়ীকে বেরুতে হলো ঘর থেকে। আর আশ্চর্য, হাসতেও হলো তাকে। হেসে ইশারায় বললো, যা ঐ ঘরে।

এলো আরো দু'তিনজন। মানময়ীর বন্ধু। তারই সমবয়সী মেয়ে।

ক্রমে নীরব নিঃসঙ্গ বাড়িটা যেন মন্ত্রবলে সরগরম হয়ে উঠলো। সবাই এসেছে জামাই দেখতে। কুলীন-কন্যার এমন শিকে-ছেঁড়া ভাগ্য তো সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই ব্যাপারটা দ্রষ্টব্য বৈকি!

গিন্নীরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাসনাময়ীর বয়েসই কম। তার

উপর রূপ আর রূপোর অহংকারও বেশ একটু আছে, তা সবারই জানা। তবু এসেছিলো শুধু 'বর' দেখতে। বয়েস কম তাই কৌতূহলটা বেশি। বিশেষ করে পরের বরের চেহারাটা কেমন, কথাবার্তা কেমন, সেটা না দেখেও যে পারা যায় না। তাছাড়া এর আগে চণ্ডিচরণ থাকতে যে দুবার এসেছিলো জামাই, তখন একবার সে আঁতুড়ে ছিলো, আর একবার হয়েছিলো ম্যালেরিয়া-জ্বর। কাজেই আরো অনেক মেয়েরা জামাই দেখতে গেলেও বাসনাময়ীর দেখা হয়নি। তাই এবার জামাইয়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ-পরিচয় করে বাসনাময়ী একটু আগেই চলে গেলো। বললো, কাজ আছে।

মোক্ষদাসুন্দরী ইতিমধ্যে জামাইয়ের মুখ-হাত ধোবার ব্যবস্থা করে বিকেলের জলযোগ পর্বটা শেষ করেছেন। তার জামাইয়ের আচার-ব্যবহারটা, কথা বলার ছিরি—সবই তো লক্ষ্য করেছেন তিনি। কাজেই জামাইয়ের কাছাকাছিই তাঁকে প্রায় সর্বক্ষণ থাকতে হয়েছে।

অবশ্য, ভবতারণ দেখলো এসেই যখন পড়া গেছে, আদর-আপ্যায়নটাও মন্দ হচ্ছে না, বিকেলের ফলারটাও ভালোই হলো আর মানময়ীর বন্ধুরাও বেশ রসিকতা শুরু করেছে, তখন তার মনের রূঢ়তার উপর কখন যেন আপনা থেকেই একটা নরম পলেস্তারা পড়লো। তাছাড়া ওটিও তো বেশ শাঁসে-জলে হয়েছে!

গিন্নী দুজন চলে যেতেই গিরিবালা আর অনন্তবালা মানময়ীকে টেনে আনলো ঘরে। মোক্ষদাসুন্দরী সেই ফাঁকে ঢুকলেন রান্নাঘরে। রাত্রে জামাইয়ের ভূরিভোজের আয়োজন করতে হবে।

মানময়ীকে ধরে খাটে বরের পাশে বসাতে গেলো মেয়েরা। তা সে বসলো না, বসলো মাটিতে কাঠের সিন্দুকটায় ঠেস দিয়ে।

যশোমতী হেসে বললো, আ মর! ছুঁড়ির লজ্জা দেখো! নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়া!

হরিমতী টিপ্পনী কাটলো : রাত্তিরে বরের কাছে শুতে পারবি তো?

এবার ফিসফিস করে উত্তর দিল মানময়ী, তুই না হয় শুয়ে দেখিয়ে দিস!

হরিমতী হাতের বুড়ো আঙুলের কলা দেখিয়ে বললো, আমার বয়ে গেচে। আমি অমন পরের জিনিসে নজর দিইনে।

অনন্তবালা ভবতারণকে বললো, দেখো ভাই, মানি আমাদের বড়ো অভিমানিনী। মান ভাঙিয়ে তবে যা হয় ক'রো।

গিরিবালা হাসলো : হ্যাঁ, খোসা ছাড়িয়ে তবে চুষো।

এবার হরিমতী দিলো ধমক ঃ তোরা থাম তো। ও'রা এলেন পণ্ডিত মশায়কে অ-আ শেখাতে। উনি কচি খোকা, না? উনি বেশ জানেন, মেয়েমানুষের পায়ে একখানা হাত রেখে তবেই তার গায়ে হাত বোলানো যায়। না ভাই?

বলেই হেসে ঢলে পড়লো অনন্তবালার গায়ে।

ভবতারণ বললো হেসে, এতো সব তো জানতাম না। যাক, শিখলাম এসে।

যশোমতী বললো, মানির পাঠশালায় ভরতি হলে আরো শেখাতে পারি। বাঁকাশ্যাম, নাড়ুগোপাল—

হরিমতী আবার ধমক দিলো ঃ উনি বলে রোজ রাত্তিরেই গেরস্তের বাড়ি সিঁদকাটি দিয়ে বেড়াচ্চেন, আর তোরা ও'কে শেখাবি চুরি? তোদের আক্কেল দেখে আর বাঁচিনে।

যশোমতী বললো, তাই নাকি গো মশায়?

সবাই হি হি করে হেসে উঠলো।

ভবতারণ এবার জবর উত্তর দিলো ঃ কথাটা কিন্তু হলো না ঠিক। সিঁদকাটি ঠিক দিতে যাইনে আমরা, গেরস্তরাই নিয়ে যায় সাধ্যসাধনা করে ডেকে তাদের ঘরে সিঁদকাটি দেবার জন্যে।

শুনেই মেয়েরা হৈ-হৈ করে উঠলো ঃ ওরে শোন শোন। যেমন এয়েছিলি মুখ নাড়তে।

—কেমন, থোঁতামুখ ভোঁতা হলো তো।

বলেই ভবতারণ গম্ভীর হয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে হাঁটু নাচাতে লাগলো। মুখে তার কিস্তি মাত করার হাসি।

১৬

রাত্রে উমাচরণ মুক্তোর ঘরে ঢুকতেই মুক্তো মুখ টিপে হেসে খবরটি দিলো উমাচরণকে। নিজের ঘরে মাটির মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে সুপুরি কাটছিলো সে। হেসে বললো, বলি, খবর কিছু কানে এয়েচে?

—কী খবর মুক্তো?—উমাচরণ পাতা পিঁড়িতে বসলো।

—বলি, সে যে এয়েচে গো!

—কে?

—আয়ান ঘোষ। আবার কে?

—সে কি রে মুক্তো!—উমাচরণ মেঘাচ্ছন্ন।

—হ্যাঁ গো দাদাবাবু। – মুক্তো জাঁতি দিয়ে একটা গোটা সুপুরি দুফালি করলো ঃ পাড়াসুদ্ধু নোক বলে দেখে এলো। আমি যাইনি ভয়ে। আজ তো ঠ্যাকারের চোটে মাগীর পা-ই পড়বে না মাটিতে।

—কিন্তু আমার যে যাবার কথা!

মুক্তো ঠোঁট উলটে বললো, কোনো লাভ নেই।

—কিন্তু!—উমাচরণ ভাবলো একবার ঃ নাঃ, যাওয়াই দরকার। যদি সময়মতো সে পুকুরপাড়ে ঝোপের কাছটায় আসে তবে বোঝা যাবে তার মনের ভাবটা। আর বর তো একরাত্রের পোষাকী, আটপৌরেও তো দরকার।

—তবে দেখোগে।

—হ্যাঁ, একবার দেখাই দরকার!—উমাচরণ বললো, তুই তো হালে পানি পেলিনে। দেখি আমি একবার চেষ্টা করে—

শুনেই মুক্তোর সুপুরি কাটা বন্ধ হয়ে গেলো ঃ বটে। আমি যে বীজ বপন করলাম, সেকথা এরি মোদ্দে ভুলে গেলে—

—না রে না!—উমাচরণ তাড়াতাড়ি হেসে মুক্তোর নরম গালটা টিপে দিয়ে বললো, আমার মুক্তোমণির কথা ভুলতে পারি কখনো? তোর জন্যে আমি বলে আংটি গড়াতে দিয়েচি হরি স্যাকরাকে। দেখিস তুই।

মুক্তো হেসে বললো, দেখা যাক। না আঁচালে বিশ্বেস নেই।

১৭

মানময়ী সাজলো। পাতা কেটে চুল বাঁধলো, বাঁধলো পাটিখোঁপা। তাতে আটকালো চিরুনি। সিঁথেয় দিলো চওড়া করে সিঁদুর। কপালে পরলো কাঁচপোকার টিপ। কাঠের সিন্দুকটা থেকে বার করে কানে পরলো মাকড়িজোড়া, আর শাড়ি বদলে পরলো পাছাপেড়ে শান্তিপুরী একখানা। হাতে সেই শাঁখা আর নোয়া। পায়ে আলতা পরাই ছিলো, মুক্তোই পরিয়ে গেছলো আগের দিন। হ্যাঁ, সব ঠিকই আছে।

মানময়ী নববধূর ভীরু-বুক নিয়েই ঢুকলো ঘরে। হাতে পানের ডিবে। দেখলো, ভবতারণ সেই জামা-কাপড় পরেই বিছানায় জোড়াসন হয়ে বসে হাঁটু নাচাচ্ছে।

মানময়ী খাটের কাছে এসে পানের ডিবে এগিয়ে ধরলো স্বামীর দিকে ঃ পান।

ভবতারণ পানের ডিবে থেকে একটি পান নিয়ে মুখে পুরে বললো, পান তো নিলাম, আসল জিনিস কই ?

মানময়ীর পক্ষে ইঙ্গিতটা বোঝা শক্ত হলো না। বললো, দিচ্ছি পরে।

—পরে নয়, আগে আনো। পুজোর আগে নৈবিদ্য সাজানোই নিয়ম।

মানময়ী কোনো উত্তর না দিয়ে দরজাটায় খিল লাগিয়ে গেলো কুলুঙ্গিটার কাছে। মাটির ভাঁড়টা নামিয়ে সামনের কাঠের সিন্দুকটার উপর উপুড় করে ফেললো টাকা পয়সাগুলো। সেগুলো একখানা রেকাবির উপর রেখে নিয়ে এলো ভবতারণের সামনে।

ভবতারণ শ্যেনদৃষ্টিতে একবার দেখলো সেগুলো। দেখলো পরিমাণের প্রাচুর্য নেই। দেখেই মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে গেলো তার। জিগ্যেস করলো, কতো ?

মানময়ী নির্লিপ্ত গলায় বললো, গুনিনি।

ভবতারণ রেকাবিটা হাতে নিয়ে গুনতে শুরু করলো। টাকা আনা পয়সা আর কড়ি মিলিয়ে এগারো টাকা সাত আনা এক পয়সা ন'কড়ি।

—মাত্তর এই!—মুখ ভেংচে ভবতারণ রেকাবি শুদ্ধ ছুঁড়ে ফেললো মাটির মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে ছড়িয়ে পড়লো টাকা পয়সাগুলো, রেকাবিটা গড়িয়ে ঢুকে গেলো জলচৌকির তলায়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ভবতারণ ঃ বলি, কুলীন বরের মজ্জাদা দেতে পারো না, অথচ তাকে নিয়ে রাত কাটাবার শখ তো খুব !

আশ্চর্য, মানময়ী এ অপমান গায়ে না মেখেই বললো, সুতো কেটে এ পর্যন্ত ঐ কটা টাকাই জমাতে পেরেচি। সংসারেই সব খরচ হয়ে যায়। আমি আর মা যেটুকু পারি—

—কেন ? দুটো ভাই ছিলো না ?

—দাদা এখানে থাকে না। ফুলপুরে চৌধুরীদের ঘরজামাই সে। আর তার—ভারী গলায় বললো মানময়ী ঃ ছোট ভাইটা গত বছরে উলোউঠোয়—

—আচ্ছা, আমিও এখন উঠি।

ভবতারণের সুরে বিরক্তি।

—তুমি দয়া করো!—মানময়ী ভবতারণের পা জড়িয়ে ধরলো।

ভবতারণ গম্ভীর গলায় বললো, দয়া করতে গেলে আমার চলবে কেমন

করে ? বলি, আরো যদি কিছু থাকে তো বার করো। নইলে আমি থাকবো না বলে দিচ্চি—

—তুমি বিশ্বাস করো আমার কাছে আর কিছু নেই।

—তবে আমারও করবার কিছু নেই। ছাড়ো, পা ছাড়ো।—ভবতারণ পা ছাড়াবার চেষ্টা করলো।

মানময়ী তেমনিই স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে বললো, দেখো, আমার গায়ে এক কণাও সোনা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম।—মানময়ীর চোখের জল তার দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

—বেশ তো, তোমার মার কাছে দেখো।—ভবতারণ নির্লজ্জ গলায় সন্ধান দিলো।

মানময়ী বললো, আমি দিব্যি করচি, মার কাছে বা আমার কাছে কিছুই নেই। দুটো পেট চালাতেই সব খরচ হয়ে যায়।

—তবে আবার পেট করবার ফিকির কেন ?—অসভ্য ভবতারণ নিজের রসিকতায় পৈশাচিক হাসি হাসলো : জানো না, আর একটা পেটের খোরাক যোগাতে হবে তখন ! নাও ছাড়ো, আমার সময় নষ্ট কোরো না।

বলেই ভবতারণ এক ঝটককায় পা ছাড়িয়ে নিতেই মানময়ী হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললো, না হয় রাত্তিরটা থেকে কাল সকালেই যেয়ো।

—বটে, আবদার তো কম নয় !—অবাক হলো ভবতারণ।

—না, না, আমি মার কাছে গিয়ে শোবো।—মানময়ী বললো।

—না, আমি এখনই যাবো। আমার একটা রাত্তিরই নষ্ট হয়ে গেলো ! অন্য জায়গায় গেলে মোটা রকম কিছু পাওয়া যেতো।—আর একটা মিথ্যে-কথা বললো ভবতারণ : আর এক জায়গা থেকে কাল ডাকতে এসেছিলো—অথচ গেলাম না। হুঃ ! ভেবেছিলে রং আর ঢং দেখিয়েই ভোলাবে, না ?

এবার মানময়ী উঠে দাঁড়ালো। খোঁপা ভেঙে কাঁধের উপরে পড়েছে। দুচোখে তার জ্বলন্ত আগুন। সর্পিণী ফণা তুললো : হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম নিজের সোয়ামীকে, টাকার পিচেশকে নয় !

—ইস ! মেজাজ আছে দেখচি।—দরজা খুললো ভবতারণ।

—কেন থাকবে না ? আমি তোমার মতো ভাড়া-খাটা পুরুষ নই।

বলেই মানময়ী ভবতারণকে প্রায় ঠেলেই ঘরের বাইরে বার করে দিলো। দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লো। কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে শুয়েছিলেন, হঠাৎ কানে তর্কাতর্কির শব্দ আসতেই বাইরে এসে দেখেন ভবতারণ ছুটে চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ বাবা, চলে যাচ্চো যে!

—আমার ইচ্ছে! চোর জোচ্চোর ঠক বাটপাড়ের বাড়িতে রাত কাটাইনে আমি।—সোজা হনহন করে বেরিয়ে গেলো ভবতারণ।

মোক্ষদাসুন্দরী থমকে থেমে রইলেন অন্ধকার উঠোনে। হঠাৎ দেখেন দরজা খুলে মানময়ী বেরিয়েই ছুটে গেলো খিড়কির পুকুরের দিকে। আত্মহত্যা করবে নাকি? তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন মেয়ের পিছুপিছু। কিন্তু গিয়ে দেখেন, মানময়ী পাশের ঝোপের আড়ালে গেলো। আর একটু পরেই একজন পুরুষমানুষের হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো ঝোপের বাইরে। মোক্ষদাসুন্দরী চট করে সরে দাঁড়ালেন বড় আমগাছটার পেছনে। দেখেন উমাচরণ। দীনু কোবরেজের মেজছেলে।

মানময়ী উমাচরণের হাত ধরে টানতে টানতে শোবার ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিলো। পরে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানার দিকে ঠেলে নিয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বললো, তুমি আমাকে চেয়েছিলে, না? আমার টাকা চাওনি, আমাকে চেয়েছিলে, তাই না? এই যে, এই যে আমি! নাও, নাও আমাকে, নাও……।

মোক্ষদাসুন্দরী ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়েই পা টিপেটিপে চলে গেলেন রান্নাঘরে আবার শুতে। জামাই যাক যাকগে। লোক তো দেখেচে জামাই এসেছিলো। যদি কিছু হয়ই কেউ কিছু আর ভাববে না। আর সত্যিই তো, মানুও মুখ বুজে আছে অনেকদিন—

১৮

শ্রীধর চাটুজ্জে সতীনাথকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ঢুকে উঠোনের লাউমাচাটার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, ছোটোবৌ, দেখো কে এসেচে।

সামনেই রান্নাঘর থেকে লাবণ্যপ্রভা বেরিয়ে এলো ধোয়া হাত শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে। দেখে সতীনাথ। তার বোনপো।

কিন্তু একি কাণ্ড! জামায় ধুলো, মাথায় ধুলো। কী ব্যাপার?

সতীনাথ মাসীমাকে প্রণাম করে, সেই সঙ্গে মেসোমশায়কেও প্রণাম করে জিগ্যেস করলো, কেমন আছো মাসি?

—আছি তো ভালো।—লাবণ্যপ্রভা তখনো অবাক : বলি, গায়ে সব ধুলো কেন? কী ব্যাপার?

সতীনাথ হেসে বললো, তোমাদের গাঁয়ের অতিথি-অভ্যর্থনার নমুনা গো মাসি।

শ্রীধর চাটুজ্জে হেসে বললেন, যা বলেচো বাবাজী।—বলেই তিনি ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানালেন লাবণ্যপ্রভাকে।

—ওমা আমার কি হবে!—লাবণ্যপ্রভা বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে নথ নেড়ে বললো, সে কি গো? আহা, ছেলেটাকে একলা পেয়ে হাড়হাবাতে মিনসেগুলো মেরে ফেলতো যে! এ দেখচি মগের মুলুক হলো!

শুনে সতীনাথ হেসে ফেললো : না মাসি, এটা ইংরেজের মুলুক। এখানে যা-তা করা আর চলে না।

শ্রীধর চাটুজ্জে বললেন, তা যা বলেচো বাবাজী। জানো, বাবাজীবনও হরিহরকে কাত করেছিলো।

লাবণ্যপ্রভা সেই কথায় কান না দিয়ে বললো, নে, আয়, কাপড়-জামা ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর।···হ্যাঁরে, পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?···সেই কলকেতা থেকে আসা। কেবল ভাবি, সতুর মুখখানা কবে দেখতে পাবো। আহা, ছেলেটা সেই এলো, অথচ কী হাল একবার দেখো। বলি, এ গাঁয়ে কি ভদ্দোরলোকের বাস নেই?···আয় বাবা আয়!

লাবণ্যপ্রভা আপনমনেই গজগজ করতে করতে সতীনাথকে ডেকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলো। তবে মুখখানায় কিন্তু মেঘের ছায়া এলো নেমে।

শ্রীধর গেলেন কুয়োতলার দিকে হাতমুখ ধুতে।

এতক্ষণ পুবের ঘরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন শ্রীধর চাটুজ্জের বড়বৌ মানদাসুন্দরী।

মানদাসুন্দরী ঘর থেকে বেরিয়ে এবার তাঁর স্বামীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিগ্যেস করলেন, ঐ ছেলেটি বুঝি ছোটবৌয়ের বোনপো?

শ্রীধর জলভরতি বালতিটা কুয়ো থেকে তুলে নামিয়ে বললেন, হুঁ।

—বেশ ছেলেটি। না?

আবার হুঁ।

—কলকেতায় ছিলো বুঝি?

এবারও হুঁ।

—ওর কথা শুনেচি বটে ছোটবৌয়ের মুখে। আহা, কয়েক মাস আগে এলে—

ফের হুঁ।

এবার নথ নেড়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন বড়বৌ : বলি কথা বন্ধ হয়ে গেলো নাকি ?

এবং এবার উত্তর এলো : কই, না তো।

—না তো।—মানদাসুন্দরী ঝটকা মেরে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

মাসীর ঘরে বসে সতীনাথ বললো, গৌরহাটিতে যাবার আগে তোমাদের ফুলপুর গাঁ পড়ে, তাই ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই তোমাদের। তা সব ভালো তো ?

লাবণ্যপ্রভার মুখে তখনো মেঘের ছায়া। বললো, আমাদের খবর তো ভালো বাবা, তবে—

—তবে কি ?—উদ্বিগ্ন হলো সতীনাথ।

—সে পরে হবে'খন। তুই মুখ-হাতটা ধুয়ে কিছু মুখে দে আগে।—কিন্তু বলতে বলতেই লাবণ্যপ্রভার চোখদুটি যেন ছলছল করে উঠলো, গলার স্বর হয়ে উঠলো ভারি : তুই যদি আর কটা মাস আগে আসতিস বাবা !

—কেন ? কেন ?—সতীনাথ উঠে দাঁড়ালো।

লাবণ্যপ্রভা বোনপোর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো : দিদি আর নেই রে।

—মা নেই। কবে ? কী হয়েছিলো ?—সতীনাথও কেঁদে ফেললো।

সেইদিনই সতীনাথ গৌরহাটি চলে যেতে চাচ্ছিলো, তবে লাবণ্যপ্রভা আর শ্রীধর তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করায় সে রাতটা সে ফুলপুরেই কাটালো।

পরদিন ভোরেই সতীনাথ তার গাঁ গৌরহাটিতে রওনা দিলো। সঙ্গে গেলেন শ্রীধর। লাবণ্যপ্রভাই তাঁকে পাঠালো।

সতীনাথ কলকাতায় গেছলো চাকরির খোঁজেই। তাদের গাঁয়ে পাঠশালার গুরু পণ্ডিতমশায়ের ধমকানি আর বেত সহ্য করে সেখানকার পড়া শেষ করেই ঠিক করেছিলো লেখাপড়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে সে। ওঃ! এই যদি লেখাপড়া হয়, তবে মাথায় থাক মা সরস্বতী। বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ নয়তো, বিদ্যাস্থানে ভয় বচ !

মনে আছে তার, গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের সেই পাঠশালা আর বেতহাতে

গুরুমশায় খুঁটি ঠেসান দিয়ে বসে। সামনে মাদুর পাতা। সকাল-বিকেলে পাঠশালা। ঠিক সময়মতো যেতে না পারলেই বিনাবাক্যব্যয়ে গুরুমশায়ের সামনে ডানহাতখানা পেতে দাঁড়ানো এবং সপাসপ পাঁচ বা দশ ঘা করে বেত খাওয়া। তাছাড়া পড়া না পারলে বা কোনোরকম দুষ্টুমি করলে নাড়ুগোপাল হওয়া বা ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁকা-শ্যাম হয়ে থাকা। অথবা চ্যাংদোলা হওয়া তো আছেই। দুই হাঁটু আর বাঁ হাতে গোপালের মতো বসে ডান হাতে একখানা আস্ত ইঁট নিয়ে থাকা আর হাত ভারি হয়ে ইঁটখানা পড়লেই পশ্চাদ্দেশের কাপড় তুলে বেতের পর বেত মারা—ভোলেনি সে কথা সতীনাথ। আর ভারি কিছু হাতে নিয়ে বাঁকা-শ্যামের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং পা পড়লেই বেতের ঘা পড়া পিঠে বা পশ্চাতে—সে কথা আজো ভাবতে ভয়ে শিউরে ওঠে সতীনাথের সারা অঙ্গ। চ্যাংদোলাও হতে হয়েছে তাকে। একবার ভয়ে পাঠশালা থেকে পালিয়েছিলো সে। আর যাবে কোথায়? অন্য পড়ুয়া ছেলেরা তাকে ধরে হাত আর পা দুটো ঝুলিয়ে নিয়ে এলো গুরুমশায়ের কাছে। তারপর যা ঘটবার তাই ঘটলো। গুরুমশায়ের প্রায় বিশ ঘা বেত পড়লো সপাং সপাং করে সতীনাথের নগ্ন পশ্চাদ্দেশে।

মাটিতে বসে নিজের একখানা পা নিজেরই কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া বা হাত-পা বেঁধে দিয়ে কাপড় তুলে জলবিছুটি দেওয়া অথচ চুলকোবার উপায় নেই, কিংবা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে পড়ুয়াকে পুরে দিয়ে তার মুখ বেঁধে মাটিতে সেটা গড়িয়ে দেওয়া—এগুলো অবশ্য সতীনাথের ভাগ্যে ঘটেনি, তবে এসব নিজের চোখে দেখেছে সে। দেখেছে রাখাল হরিপদ শ্যামাচরণ কালীপদর সে সব শাস্তি। দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। মনে মনে এক-একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু গুরুমশায়ের বেতটা চোখে পড়তেই যেন নিভে গেছে সতীনাথ। ছাই-চাপা আগুনে একঘড়া জল পড়বার মতোই।

আরো রাগের কারণ ছিলো সতীনাথের। গুরুমশায়ের পক্ষপাতিত্ব তার শিশুমনকে অহরহই ধাক্কা দিতো। মধুসূদনের বাপের পয়সা আছে, কাজেই তার গায়ে গুরুমশায়ের বেত প্রায় পড়তোই না। তাছাড়া সে বাগানের কলাটা-মুলোটা, গরুর দুধ প্রায়ই এনে হাজির করতো। এমনটা করতে হতো প্রায় সব পড়ুয়াদেরই। সতীনাথও বাড়ি থেকে এনে দিয়েছে চাল ডাল তেল নুন—কত কি! কিন্তু পরিমাণে কম-বেশি বলে তো একটা কথা আছে। কাজেই গুরুমশায়ের স্নেহ বা ক্রোধের পরিমাণটাও স্বভাবতই সেই অনুসারেই

ওঠা-নামা হবারই কথা। তাছাড়া যাত্রা মহোৎসব পুজো-পার্বন বা বাড়ির কোনো কাজকর্মেও গুরুমশায়ের প্রাপ্তিযোগটা খুব মন্দ হতো না। আর নগদেও প্রায় দশ-বারো টাকা মাসে যে হতো না তাও নয়। অর্থাৎ বেতন এবং বেতের মাধ্যমে সতীনাথ পাঠশালায় রীতিমতো শিক্ষিত হতে লাগলো।

প্রথমে খড়ি দিয়ে মাটিতে বর্ণপরিচয় হলো। পরে তালপাতায় অ-আ ক-খ লেখা এবং শেখা হলো। তারপর প্রমোশন পেলো সে কলাপাতায়। কলাপাতার লেখা শুরু করলো তেরিজ, জমাখরচ, শুভংকরী, কাঠাকালি, বিঘা-কালি ইত্যাদি। সব শেষে কাগজে। সতীনাথ চিঠিপত্র লিখতেও শিখলো। হাতের লেখা পাকা হলো তার।

সতীনাথকে বেশ কিছুদিনই পাঠশালায় পড়তে হয়েছিলো। বাপের ইচ্ছে, বড়ো হয়ে সে তাঁরই মতো কোনো জমিদারী সেরেস্তায় বা কোনো গদিতে কাজকর্ম করবে। নইলে রাজসরকারে কাজ করবার ইচ্ছে থাকলে সতীনাথকে ফারসী পড়তেই হতো। কিংবা ব্রাহ্মণের ছেলে হিসেবে তালপাতায় লেখা শেষ করে কোনো টোলে গিয়ে দুলেদুলে ব্যাকারণ মুখস্থ করতে হতো তাকে।

পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করবার কিছুদিন পরেই সতীনাথের বাবা গেলেন মারা। তিনি যা কিছু রেখে গেলেন তাতে তার মা ছেলেকে নিয়ে জলে পড়লেন না বটে, তবে হিসেব করে দেখা গেলো পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাওয়া চলবে না।

সতীনাথ এখানে-ওখানে কাজের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায় কাজ? শেষে একদিন খবর পেলো, পাশেই বল্লভপুর গাঁয়ে লোহারাম বাঁড়ুজ্জের ছোট মেয়ে বিন্দুবাসিনীর স্বামী মানিকচন্দ্র মুখুজ্জে নাকি কোলকাতায় থাকে। সেখানে গেলে যা হোক একটা কিছু হতে পারে।

সতীনাথ আর দেরি না করে পরদিনই রওনা হলো বল্লভপুরে। গিয়ে শুনলো লোহারাম বাড়ি নেই। কোথায় নাকি কোন কুলীন-কন্যার কুলরক্ষা করতে গেছেন। অগত্যা সেদিন ফিরতে হলো তাকে। কদিন পরে আবার গেলো সে। সেদিন দেখা হলো লোহারামের সঙ্গে। তবে কপাল চাপড়ে বললেন তিনি, হা আমার পোড়া কপাল! সে আমার নামেই জামাই। বিয়ের পর একবার মাত্র এসেছিলো। এখন শুনি বটে কলকেতায় থাকে, তবে কোথায় থাকে বাবা, তা তো আমার জানা নেই। বরং হৃদয়পুরে তার বাড়িতে একবার খবর নিতে পারো। বেশি দূরে নয়, এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে। আর বাবা, যদি খবর পাও তো জানিয়ো একবার আমাকে।

অগত্যা সতীনাথ গেলো একদিন হৃদয়পুরে এবং সেখানে তার বাড়িতে পেলো বটে মানিকচন্দ্রের ঠিকানা, তবে সেটা সঠিক কিনা বলতে পারলো না বাড়ির কেউ। তবু সতীনাথ হতাশ হলো না। একটা কুটো ধরে পোঁছোনো তো যাক। তারপর দেখা যাবে। সেখানে কেনো গদিতে বা সেরেস্তায় যা্হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে হয়তো সে।

বাড়িতে এসে সতীনাথ বললো, মা, তুমি আর অমত করো না। আমি একবার কোলকাতায় চেষ্টা দেখি। সেখানে অনেক ইংরেজের কুঠি আছে। গদিও আছে অনেক। হয়তো একটা কিছু হতেও পারে।

সতীনাথ যাত্রা করে বেরুলো। সঙ্গে নিলো একটা ছোট বোঁচকায় ধুতি গামছা আর টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। আর ট্যাকে কয়েকটা টাকা। ভোরে বেরিয়ে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে ত্রিবেণী ঘাটে পোঁছোতে বেলা প্রায় এক প্রহর পার হয়ে গেলো। তবে দেখলো, ঘাটে অনেকগুলো বজরা, নৌকো বাঁধা। মাঝিরা হাঁকছে—হুগলী, চুঁচড়ো, চন্নগর, শীরামপুর, খড়দা, ভদ্দর-কালি, উত্তোরপাড়া, সুতোনুটি, কলকেতা! আট-দাঁড়ের একটা পুরো বজরাও ভাড়া পাওয়া যায়। তাতে করে কলকাতায় যাওয়া মানে দু'দুটো টাকা খরচ! এখনি এতো খরচ করে বসলে—শেষে? তাই সতীনাথ আর পাঁচ-জনের সঙ্গে তিনআনা ভাড়ায় একটি খোলা নৌকোয় চেপে বসলো। বজরায় যাওয়ার বাবুয়ানি ঠিক নয়।

গঙ্গার দুধারটায় সবুজের মেলা। লোকেদের আম জাম কাঁঠালের বাগান, কলাগাছের ঝাড় আর ঝাড়। কোথাও বা জঙ্গল। মাঝেমাঝে কাঁচা বাড়ি, খড়ের চালের। কোথাও বা কোঠাবাড়ি, তবে সেগুলো শহরের কাছেই। আর কতো যে নৌকো বজরা! নৌকোয় কতো লোক যাতায়াত করছে কাজেকর্মে। কতো রকমের নৌকো।

একখানা সাহেবদের বড় বজরা পাশ দিয়ে চলে গেলো। বজরার ছাদে বসে দুতিনজন সাহেব আর দুটি মেমসাহেব। বজরার সামনে পেছনে দুজন সেপাই, বন্দুক ঘাড়ে।

সতীনাথদের নৌকোটি সসম্ভ্রমে সাহেবদের বজরা থেকে দূরে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলো। সাহেবরা বোধহয় কলকাতা থেকেই আসছে। সতীনাথ এই প্রথম দেখলো সাহেব-মেম। কী গায়ের রং! টকটক করছে। চুলগুলো সোনালী। মেমসাহেব দুজন যেন পরী। এদের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তাতে কাঁচের কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের গেলাস আর বোতল।

সতীনাথ শুনেছে ওরা নাকি মদ খায়, ওদের মেয়েরাও। সতীনাথ ভাবলো, আচ্ছা, যদি বজরার ছাদ থেকে উলটে পড়ে যায়? একজন সাহেব আলবোলা টানছে। তার মুখের নলটা কী লম্বা! পেছনে একজন হুঁকোবরদার সেটা ধরে আছে। দশ-দাঁড়ের বজরা বেশ জোরেই পাশ দিয়ে চলে গেলো। সতীনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রাজার জাত! বন্দুকের একটা গুলি ছুঁড়ে দিলেই হলো।

সতীনাথদের নৌকো এসে ভিড়লো চন্দননগরের ঘাটে। এখানে ঘণ্টা দেড়েক থাকবে। মাঝিরা খাওয়াদাওয়া সেরে নেবে। নৌকোর যাত্রীরাও পাড়ে নেমে যাহোক কিছু চালে-ডালে ফুটিয়ে পেটটা ভরিয়ে নিতে পারে। গঙ্গাস্নানটা সেরে নিলো সকলেই। তবে সতীনাথ রাঁধলো না। কিছু চিঁড়ে আর গুড় এনেছিলো, মা-ই দিয়ে দিয়েছিলেন সঙ্গে। গামছার কোণে কিছুটা চিঁড়ে বেঁধে জলে ডুবিয়ে ভিজিয়ে তাই খেয়ে নিলো গুড় দিয়ে।

কয়েকজন যাত্রী চন্দননগরে নেমে গেলেও উঠলো আরো কয়েকজন। তারাও নৌকোয় কলকাতায় যাবে। আর কয়েকজন নামলো শহরটা দেখে আসবার জন্যে। তার মধ্যে দু-তিনজন নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করলো। কেন, তা সতীনাথ প্রথমে বুঝতে পারেনি। তার পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, বোতল-কার্তিকরা চললেন মদ গিলতে। ফরাসীদের রাজত্ব কিনা এটা। এই ফরাসডাঙ্গায় মদ খুব সস্তা। আর এলে দেখবেন, নৌকোয় বমি করচে। কিংবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরবে।

—অ্যাঁ, বলেন কি?—সতীনাথ অবাক হলো।

—হুঁ! বলি, কতো দেখলাম।—ভদ্রলোক ঠোঁট বাঁকালেন: বলি, সাহেবরা যা পারে, তোরা তা পারিস? ওরা ষাঁড়ের ডালনা খায়, ওদের কথাই আলাদা!

সতীনাথ যেন অন্যমনস্ক হয়েই বলে, হুঁ, তা তো বটেই।

—তা মশায় যাবেন কতদূর?—ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন।

সতীনাথ বললো, সুতোনুটি। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন, আমি যাবো আরো এগিয়ে, কলকেতায়। আর বলেন কেন? যাবো আসলে বেলেঘাটা। আগে দিব্যি এই গঙ্গা থেকেই একটা খাল ছিলো সোজা বেলেঘাটা পর্যন্ত। বাঁয়ে কলকেতা আর ডাইনে ছিলো গোবিন্দপুরের জঙ্গল। দিব্যি, একপা না হেঁটে একেবারে যাওয়া

যেতো বেলেঘাটা। এই কবছর হলো সাহেবরা সে খাল বুজিয়ে রাস্তা করেচে। নাম দিয়েচে ক্রীক রো—না গুষ্টির মাথা। আর গোবিন্দপুরের জঙ্গলও অনেক কেটে সাফ করেচে। সুতোনুটি বা দক্ষিণে কলকেতার দিকে তো তেমন আর জায়গাই নেই! আর ওটা নাকি নেটিভদের ব্ল্যাকটাউন। তাই আরো দক্ষিণে হোয়াইট-টাউন মানে সাহেবপাড়া হবে!

সতীনাথ অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখে ইংরেজী কথাগুলো শুনছিলো। জিগ্যেস করলো, আপনি বুঝি প্রায়ই কলকেতায় যান?

—প্রায় নয়, তবে মাঝেমাঝে যেতে হয়।—ভদ্রলোক বললেন, এই ব্যবসার খাতিরে।

দুপুরের পর নৌকো ছাড়লো আবার। বোতল-কার্তিকরা বমি করলো না বটে, তবে নিজেদের মধ্যে বকবক করতে লাগলো। কয়েকজন একটু জায়গা করে চোখের দুপাতা এক করে নিলো সেই ফাঁকে। কিন্তু সতীনাথ দুচোখ দিয়ে সব গিলতে লাগলো। দূরে ছোট ছোট জেলে ডিঙিগুলো গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরছে। গঙ্গার পাড়ে ন্যাংটা ছেলেগুলো দৌড়োদৌড়ি করছে। কোনো গ্রামের কজন মেয়ে গঙ্গার ঘাটে নেমেছে কলসী কাঁকে। নৌকো গঙ্গার পশ্চিমকূল বেয়ে এগিয়ে চলেছে ভাটার মুখে।··· একটা শ্মশান পড়লো চোখে সতীনাথের। ডাঙায় পাড়ে কতকগুলো ভাঙাকলসী কাপড় কাঁথা মাদুর আর পোড়া বাঁশ। একটু দূরেই, ওকি, কতকগুলো শেয়াল কী যেন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে! একটা আধপোড়া মড়া নিয়ে চলছে কামড়াকামড়ি। কাছেই এক গাছে কতকগুলো শকুন।

সতীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিলো।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখলো দূরে একখানা বেশ বড়গোছের বজরা। বজরার ছাদে কয়েকজন লোক। এবং একটি মেয়েমানুষ। নাচছে মনে হলো। হ্যাঁ তাই। বজরাটা তাদের নৌকোর আরো একটু কাছে আসতেই কানে এলো ঘুঙুরের আওয়াজ। আরো খানিক কাছে আসতেই দেখা গেলো, বজরার ছাদে ফরাস পাতা। একজন বাবু, কোঁকড়ানো চুল, পাকানো গোঁফ, ফিনফিনে ধুতি পিরান পরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। পাশে একটি মেয়েমানুষ মদের গেলাস এগিয়ে ধরেছে। আর বাবু তার গলা জড়িয়ে ধরে মদের গেলাসে মাঝেমাঝে দিচ্ছে চুমুক। বাবুর সামনে একজন

বাঈজী নাচছে। আর একপাশে তবলা আর সারেঙ্গী বাজাচ্ছে দুজন লোক। তার নাচের তালেতালে খুব মাথা নাড়াচ্ছে।

বজরাটা কাছে আসায় বাঈজীর পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজে সতীনাথদের নৌকোর সবাই সোজা হয়ে বসলো। সবাই গিলতে লাগলো নাচ। আহা, এমন দৃশ্য না দেখে থাকা যায়!

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বজরার বাবুটিকে দেখিয়ে সতীনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, উনিই হচ্চেন বাবু!

—তার মানে?—সতীনাথ কৌতুহলী হলো।

—তার মানে ভদ্রলোক বললেন, ও'রাই হচ্ছেন শহরের মহাপুরুষ, সাহেবদের পুষ্যিপুত্তুর। টাকার কুমীর। ও'রা ভারি করিতকম্মা লোক! গেলাস-গেলাস মদ খাওয়া, পায়রা ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, বাঈজী নাচানো, বেশ্যা পোষা, পরস্ত্রী হরণ, আর দুহাতে টাকা ওড়ানো—বহুরকম কাজ ও'দের!

সতীনাথ জিগ্যেস করলো, তা লোকে নিন্দে করে না?

—নিন্দে?—ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঐসব না করলেই বরং বাবুদেরই নিন্দে। তাহলে আর কিসের বাবু?

হঠাৎ চোখে পড়লো সতীনাথের, তাদের নৌকোর বোতল-কার্তিকরাও বেশ উপভোগ করছে বাবু-লীলা। নাচের তালেতালে তারাও মাথা নাড়ছে।

সন্ধ্যার মুখেমুখে সতীনাথরা শ্রীরামপুরে এসে পেঁাছোলো। মাঝিরা বললো, আজ এখানেই রাত্রিবাস। কারণ, শোনা গেলো, রাত্রের অন্ধকারে নৌকো চালানো বিপজ্জনক। পথে জল-ডাকাতের ভয়। দেখা গেলো, আরো অনেক নৌকো ইতিমধ্যেই ঘাটে এসে ভিড়েছে। কয়েকটি নৌকো ডাঙায় উপুড় করা। বোধহয় মেরামত হচ্ছে।

ঘাটে লোকজন কম। সতীনাথদের নৌকোর সবাই নেমে রান্নার যোগাড় করতে লাগলো। দুএকজন গেলো শহরটা ঘুরে আসতে। বোতল-কার্তিক কজন নৌকোতেই গুম হয়ে ছিলো বসে, এমন সময় নৌকোর কাছে এসে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়ালো তিনটি মেয়েমানুষ। বেশ্যা।

—কী গো বাবুরা নামলে না?—একজন বেশ্যা হেসে জিগ্যেস করলো।

আর একজন হেসে বললো, এসো না, কুঞ্জে রাত কাটাবে!

কুঞ্জে! মন্দ বলেনি তো!

—তাই চলো—একজন * বোতল-কার্তিক উঠে দাঁড়ালো : চলো হে, রাধাকুঞ্জে যাওয়া যাক।

গলার চাদর কোমরে বেঁধে আর পরনের কাপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে তারা চললো মেয়েমানুষ তিনজনের সঙ্গে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যবসাদার শশীভূষণের আমন্ত্রণে সতীনাথ তাঁর সঙ্গেই খেতে রাজী হয়েছিলো। আর তিনিও যখন ব্রাহ্মণ। সতীনাথ সব দেখে শুনে মাটিতে গর্ত করে উনুন কাটতে কাটতে বললো, আচ্ছা নির্লজ্জ তো ওরা।

শুনে শশীভূষণ হাসলেন। বললেন, ভায়া, এখনো অনেক দেখবার আছে। বাইরে যখন বেরিয়েচো, চোখে অনেক কিছুই পড়বে। দেখে যেয়ো, তবে চমকে উঠো না। জগন্নাথের রথের চাকা গর্তেও পড়ে আবার ঢিবিতেও চড়ে—

সতীনাথ বললো, শুনেচি এ শহরটায় নাকি অনেক সাহেবদের বাস।

—আছেন কঘর। তবে তাঁরা খ্রীষ্টান পাদরী।—শশীভূষণ বললেন, তবে কেরি আর মার্শম্যান সাহেব বাঙ্গালীদের জন্যে অনেক কিছুই করেচেন। নিজেরা বাংলা শিখে বাংলা অভিধান, বাংলা খবরের কাগজ, ভালো পাঠশালা সব খুলেচেন। অবশ্য কলকাতায় ডেভিড হেয়ার, কলিন্দন, পামার, এঁরাও বাঙ্গালীর জন্যে কম করেননি। পঞ্চকন্যার শ্লোকের মতো তাঁদের নামে শ্লোকই তো আছে—

'হেয়ার কলিন্দন পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা,
পঞ্চগোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥'

সতীনাথ হেসে বললো, বাঃ! তা বেশ তো শোলোক।

এমন সময় অদূরে একটা নৌকো থেকে ভেসে এলো মাঝির গান—

মা বাহের ওপর খাড়াইয়ে কি কর।
তীর দিয়ে ধরচো ঠেসে, সাপ দিয়ে কেমড়ায়ে সারো ॥
পক্ষীর উপর জুহা পায়, বাবুর মতোন দেহা যায়।
তার পাশে ঐ ধবলা ছুঁড়ি, রাখতি পার কিনা পার ॥
তার পাশে ঐ আঙা ছোঁড়া, বোধহয় যেন ঝি বৌ চোরা,
তার পাশে হলদি ছুঁড়ি—

—ও কী গান গাচ্ছে মাঝি?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো।

শশীভূষণ হেসে বললেন, দুগগা প্রতিমার বর্ণনা হচ্চে।

পরদিন ভোরে নৌকো ছাড়বার সময় দেখে বোতল-কার্তিকরা ফেরেনি।

মাঝিদের এ পথেই যাতায়াত। কাজেই সেই বেশ্যাদের চেনে তারা, তাই রক্ষে! একজন গিয়ে তাদের ঠেলেঠুলে নৌকোয় এনে তুললো। নৌকো ছাড়লো।

মাহেশের পাশ দিয়ে, ভদ্রেশ্বর উত্তরপাড়ার গা দিয়ে, বালিখালের মুখ পার হয়ে নৌকো গঙ্গা পার হলো শোভাবাজারের ঘাটের কাছে। সেখানে ভিড়লো এসে নৌকো। বেলা তখন দুপ্রহর। চড়া রোদ্দুর।

সতীনাথ শশীভূষণের কাছে বিদায় নিয়ে নৌকো থেকে নামলো। নামলো আরো কয়েকজন।

২০

সতীনাথ পোটলা হাতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো শোভাবাজারের ঘাটে। কোন দিকে যাবে, ডাইনে বাঁয়ে, না সামনে—বুঝে উঠলো না। গঙ্গার ঘাটে অনেকেই স্নান করছে, কেউ আহ্নিক করছে। কেউ বা স্নান সেরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে চলে গেলো। হুম-হুম করে কয়েকজন বেহারা একটা পালকি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে এক বাবু বসে। বেশ মোটাসোটা। একটা লোক চামড়ার বড়ো একটা ব্যাগে জল বোঝাই করে নিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে।…কাউকেও কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হলো না সতীনাথের।

তবু একপা দুপা এগুতে লাগলো সতীনাথ। সামনে দেখলো একজন লোক একটা কাটা ছাগল কাঁধে করে তার দিকেই আসছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে মালকোচা পরা ধুতি। সতীনাথ তাকেই জিগ্যেস করে বসলো, এখানে মাণিক মুখুজ্জে কোথায় থাকেন জানা আছে?

—কোন মানিক মুখুজ্জে?—লোকটা থমকে থামলো। তার কাঁধ বেয়ে কাটা ছাগলের রক্ত গড়াচ্ছে। বীভৎস।

—আজ্ঞে, বল্লভপুরের লোহারাম বাড়ুজ্জে মশায়ের জামাই।

লোকটা হেসে উঠলো ঃ এ শহরে নতুন আসা হচ্চে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অতএব একটুকু সাবধানে চলাফেরা করা হয় যেন।—লোকটি হেসে বললো, নইলে আমার কাঁধে যে বস্তুটি দেখা যাচ্চে, হঠাৎ তার মতো অবস্থা হওয়া বিচিত্তর নয়। কথাটা বোধগম্য হলো কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সতীনাথ আর দাঁড়ালো না সেখানে। বুঝলো তার কপালে অনেক কষ্ট আছে। কিন্তু আর দুপা এগোলেই যে তার জন্যে একটি আশ্রয় প্রস্তুত হয়ে আছে সতীনাথ তা বুঝবে কেমন করে? বুঝলো, যখন সে আর একটু এগিয়ে একটা বড়ো মশলার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো।

দোকানের কারবারী জিগ্যেস করলো, কি চাই?

সতীনাথ ভয়ে ভয়ে বললো, আজ্ঞে, কিছু না।

—কিছু না তো দাঁড়িয়ে কেন?

—এমনি।

দোকানদার অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললো, এই সুতোনুটি-কলকেতা শহরে তো এমনি কেউ ঘোরে না বাপু! সবাই মতলবে ঘোরে।

সতীনাথের মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে এলো: আজ্ঞে একটু আশ্রয়—

—ও, আশ্রয় আর সাশ্রয়।—দোকানদার তাকে ডাকলো: ভেতরে এসো শুনি। কোত্থেকে আসা হচ্চে? নাম কি?

নাম বললো সতীনাথ।

—ও, বামুন, তা পেটে কিছু…?

জিগ্যেস করতেই সতীনাথ বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, সঙ্গে চিঁড়ে গুড় ছিলো, খেয়েচি।

শুনে দোকানদার হাসলো: বলি, পেটে কিছু বিদ্যে আছে? না ক-অক্ষর গোমাংস।

—আজ্ঞে, তা আছে সামান্য।—সতীনাথ যেন সাহস পেলো: মানে, জমা-খরচ শুভঙ্করী কাঠাকালি বিঘেকালি—

—থাক, থাক।—লোকটা থামিয়ে দিলো তাকে: কালী কলকাত্তাওয়ালীর এখেনে আর কালীর গপ্পে দরকার নেই। বলি, রান্না করতে জানো?

সতীনাথ একটু ভেবে বললো, জানে সে।

দোকানদার বললো, বাসন মাজা বা কাপড়চোপড় কাচা তো তোমায় দিয়ে হবে না। বামুন মানুষ। তা বাজারহাট করতে পারবে?

সতীনাথ ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ পারবো।

দোকানদার বললো, ঠিক আছে। পেট-ভাতা পাবে। রাজী আছো?

—হ্যাঁ।—সতীনাথ রাজী হয়ে গেলো এককথায়। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, এমন একটা আশ্রয় ছাড়া বোকামি।

কাজটা বেশ কষ্টের। গদির সাত-আটজন লোকের রান্না, জল তোলা, তাদের খাওয়ানো। তাছাড়া বাজার করা, উনুন ধরানো—সব কিছুই করতে হয় সতীনাথকে। মালেক দোকানদার রাধাবল্লভ শেঠও গদিতেই থাকেন। তাঁর জন্যে দুচারটে তরকারি বেশি রাঁধতে হয়, মাছের মুড়োটা তাঁকেই দিতে হয়। তাছাড়া দোকানের কারোর অসুখ হলে দাঁড়িপাল্লা নিয়েও বসতে হয়, যদিও এ কাজটি করবার কথা ছিলো না তার। কিন্তু অতো ভাবলে চলে না। আশ্রয়দাতার বাড়তি কাজে এসবগুলো দাঁড়িপাল্লার ফাউ বলেই ধরে নেওয়া উচিত।

রাধাবল্লভ প্রায় রাত্রেই গদিতে থাকে না।

সতীনাথ ভাবে, হয়তো বাড়ি যায়। কিন্তু গদিতে তবে খায় কেন?

কথাটা একদিন তারই সমবয়েসী রাখালকে জিগ্যেস করায় হেসে বললো সে ঃ তা জানিসনে বুঝি? চীৎপুরে কত্তার একজন মাগী আছে। সেখানে রাত কাটিয়ে আসে।

শুনে অবাক হয়ে যায় সতীনাথ। ভাবে, বড়লোকদের ব্যাপারই আলাদা!

তবে দুপুরের দিকটায় সতীনাথের খালি হাত পা। খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই প্রায় দিবানিদ্রা দেয়। গদি বন্ধ থাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। সতীনাথও খেয়েদেয়ে রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে বেরিয়ে পড়ে শহর দেখতে।

অবশ্য সকালেও বেরোয় একবার বাজার করতে। তবে তখন আর ঘোরবার সময় থাকে না। অলিগলি দিয়ে একটা সোজা পথ আছে চীৎপুরে বাজারে যাবার, সেটা দিয়েই যায় সে। এমনিতেই তো সদর রাস্তাগুলো কাঁচা, দুধারে নর্দমাগুলোও তেমনি নোংরা। ময়লা জমে থকথক করছে, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ, তার উপর গলিগুলো আরো জঘন্য। দুপাশের বাড়ির খাটা পায়খানার দৃশ্যে আর দুর্গন্ধে বীভৎস! তবু তাড়াতাড়ি বাজার করে ফেরবার জন্যে সতীনাথ ঝুড়ি আর থলে হাতে ঐ পথেই হাঁটে। কারোর পুকুরের পাশ দিয়ে, কারোর খোড়ো বাড়ির পেছন দিয়ে, কারোর বাগানের ভিতর দিয়ে, আর কোনো বড়লোকবাবুর ফটকের সামনে দিয়ে ওঠে চীৎপুরের রাস্তায়। বড়ো রাস্তায় তখন লোকজন চলা শুরু করে দেয়। গঙ্গাস্নান করে অনেকেই তখন ফিরতি মুখে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাও গঙ্গাস্নান করে কোশাকুশি হাতে বাড়ি বাড়ি সংস্কৃত শ্লোক গেয়ে ঘুরছেন। সতীনাথ প্রথমটা ব্যাপার ঠিক

বুঝতো না, পরে জানতে পারলো, এঁরা বাড়ি-বাড়ি খবর বিতরণ করছেন। কে কেমন দাতা, কে শ্রাদ্ধ-দুর্গোৎসবে কত খরচ করেছে তারই বিবরণ শোনাচ্ছেন। পাছে কারোর বদনাম করেন, তাই ধনী মানীরা এঁদের একটু সমীহ করেই চলেন, ব্রাহ্মণ-বিদায়টাও দেন ভালোই। তাছাড়া ওঁরা কাউকে পাদোদক, কাউকে বা পদধূলি দিয়ে বেশ কিছু উপায়ও করে থাকেন।

সতীনাথ ভাবে, এ শহরে পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিতে জানা চাই।

সতীনাথ বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েও দেখেছে, বহু ব্রাহ্মণ স্নান করে বাড়ি ফিরছেন। গদির রাখালের কাছে শুনেছে, এঁদের অনেকেই ইংরেজ সরকারে কাজ করেন। আর ম্লেচ্ছের কাছে কাজ করে দিনের শেষে মা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শুদ্ধ হন। এবং বাড়ি ফিরে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে তবে সেবায় বসেন।

বড় রাস্তায় পালকি টমটম জুড়ি-গাড়ির যাতায়াতও বাড়তে থাকে ক্রমেই। কাজেই একটু সাবধানেই রাস্তাটা পার হতে হয় সতীনাথকে। জলের উড়িয়া ভারিরা বাঁকে করে জল নিয়ে দৌড়োতে থাকে এবাড়ি-ওবাড়ি। ভালো পুকুর থেকেই আনতে হয় এই রান্না-খাওয়ার জল। তাই তাড়াতাড়িই দরকার। বাজারও তখন জমজমাট। বাবুদের সরকার গোমস্তা চাকর ঝি আর সাধারণ গৃহস্থদের ভিড়। বড়োবড়ো বাবুদের লোকজনই যেন বাজারের জিনিসপত্র অর্ধেক ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। জিনিসপত্রের দামও তাই যেন বাড়তির মুখেই থাকে। নইলে প্রথমদিকে যে দামে জিনিস কিনতো সতীনাথ, পরে সেই জিনিসই বেশি দামে কিনতে হয় তাকে। তাছাড়া কোনো বাবুর ছেলের বিয়ে বা মেয়ের বিয়ে বা অন্নপ্রাশন কিংবা পার্টি, অথবা বিড়ালের বিয়ে বা কুকুরের সাধভক্ষণ উপলক্ষে তো বাজার উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম।

মাছ রোজই দরকার। তাই কোনোদিন তিন আনা সের রুই বা তিন আনা সের ভেটকি, কৈ দুআনা সের, ট্যাংরা বা চুনো চার পয়সা সের কিনতেই হয়। তাছাড়া চার পয়সায় আট-দশ বাণ্ডিল শাক, মুলো পয়সায় গোটা বারো, পাতিলেবু পয়সায় আট-দশটা, দুপয়সায় সের খানেক আলু, কুমড়ো বড় একটা এক আনায়, পাটনাই ছোলা দুআনায় দুসের ইত্যাদি কিনে নিজে যতটা পারে ঝুড়িতে আর থলেতে ভরে, আর অনেক সময় ঝাঁকা-মুটেও ডাকতে হয় সতীনাথকে। অবশ্য ঘি ময়দা চাল আটা কর্তা নিজেই কেনেন। ওসব বোধহয় সতীনাথকে দিয়ে বিশ্বাস হয় না তাঁর। দাম তো কম নয়! টাকায় মাত্র তিরিশ সের আটা বা বারো সের ময়দা। গাওয়া

ঘি-র দাম তো চড়েছেই—টাকায় মাত্র দুসের। চিনি মাত্র দুসের টাকায়। চাল আগে টাকায় এক মণ পাওয়া যেতো, এখন কমে আটত্রিশ সের হয়েছে।

আর দুধটা মাত্র কর্তার জন্যেই নেওয়া হয়। গয়লা দিয়ে যায় গরু দুয়ে। এমনি টাকায় চোদ্দ সের, তবে কর্তার বরাবরের জোগান বলে দুসের আরো বেশি। কর্তা দৈনিক দুসের করে নেন।

সতীনাথ অবাক হয়ে যায়। এখানে সব কিছু ওজন দরে কিনতে হয়। অথচ দেশে লোকে শুনলে হাসবে। তরিতরকারি আবার লোকে কেনে নাকি? বাগানেই তো ফলে। ধান তো সারা বছরের গোলাতেই থাকে, পুকুরে মাছের অভাব? গরু কার না বাড়িতে? হুঃ। এখানে শহরে পয়সা চিবিয়ে খায় লোক!

শহরের ঘোর কাটতে সময় লাগলো সতীনাথের।

গেঁইয়া খোলিস ছেড়ে শহুরে পোশাক পরতে শিখলো সে রাখালের কাছে। দোকানের হরেকৃষ্ণের কাছে শিখলো আদবকায়দা অনেক। আর দোকানের সতীশ সরকারের কাছে শিখলো নতুন নতুন ইংরেজী বুলি: ফিলজফার—বিজ্ঞ লোক, প্লৌম্যান—চাষা। পর্মকিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শসা। আর শুনলো তার কাছে মজার-মজার ইংরেজী বলার গল্প—সরকারবাবুরা কেমন ইংরেজীতে তাদের ইংরেজ মনিবকে সব বুঝিয়ে দেয়। কোনো সরকার নাকি তার সাহেবের ঘোড়ার দানা খোলা চুরি করে ধরা পড়ায় বলেছিলো, ইয়েস স্যার, মাই হাউস মর্নিং এন্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস ফল, লিটল-লিটল পে, হাউ ম্যানেজ? মানে, হ্যাঁ স্যার, চুরি করেচি সকাল-সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে রোজ কুড়িখানা করে পাতা পড়ে, এই অল্প মাইনের চলে কেমন করে?

সতীশ সরকারের গল্প শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠে। আর সতীশ সরকার থেলো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে এক একটা গল্প ছাড়ে। কর্তা যখন রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে তার মেয়েমানুষের বাড়ি রাত কাটাতে যায়, তখনই দোকানের আড্ডাটা জমে ওঠে। ঝাঁপ-বন্ধ দোকানে জিরে হলুদ গোলমরিচ কালোজিরে শুকনো লঙ্কা তেজপাতায় ভরতি বস্তার ফাঁকে-ফাঁকে সবাই গোল হয়ে বসে।

রাখাল তাতিয়ে দেয়: সেই গল্পটা ছাড়ুন না দাদা! সেই লিভ আর ডাই—না কি যেন?

বুড়ো সতীশ সরকার হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিয়ে বলে, শুনবি তবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তো শুনিনি।—সতীনাথ বলে।

—শোন তবে।—সতীশ সরকার বলে,এক সাহেব তো খুব রেগে গিয়েছে সরকারের ওপর। দেখে সরকারের অবস্থা তো কাপড় নষ্ট হবার মতো। কাঁদো-কাঁদো হয়ে হাতজোড় করে বললে, ম্যাস্টর ক্যান লিব, ম্যাস্টর ক্যান ডাই। মানে, বলতে চেয়েছিলো, প্রভু বাঁচাতেও পারেন, মেরে ফেলতেও পারেন। কিন্তু সাহেব উলটো বুঝিলি রাম। লাঠি উঁচিয়ে বললে, কী, আই ডাই? তখন তাড়াতাড়ি সরকার নিজেকে দেখিয়ে বললে, ডাই মি।…হায়, হায়। ইফ ম্যাস্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কৌ ডাই, মাই ব্ল্যাকস্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেশন ডাই। মানে, মনিব মারা গেলে, আমি মরবো, আমার গরু মরবে, আমার শালগ্রাম ঠাকুর মরবে, আমার চোদ্দ পুরুষ মরবে।

কখনো-কখনো আবার ছেলেছোকরাদের আবদারে ফোকলা দাঁতে কবি-গানও ধরতে হয় সতীশ সরকারকে—

‘একে আমার এই যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো,
এসময় প্রণনাথ প্রবাসে গেলো।
যখন হাসি-হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে, ছি-ছি ধরো না।
মনে রৈল সই মনের বেদনা।—’

এই সতীশ সরকার একদিন সতীনাথকে আড়ালে ডেকে বললো, দেখো বাপু, তোমার নাম আর আমার নামের মানেটা একই, শিবঠাকুর।—বলেই একটা প্রণাম জানিয়ে বললো, তাছাড়া তুমি আমার ছেলের বয়েসী। কাজেই বলে রাখি, এ শহরটা খুবই খাপাপ, মদ-মেয়েমানুষের পাল্লায় যেন পড়ো না। —তারপর আরো গলা খাটো করে বললো, ঐ যে ব্রজেশ্বর ছোঁড়াটা, মাসের প্রথমেকাঁচা পয়সা হাতে পেলেই সন্ধ্যাবেলায় কালোপেড়ে ধুতি পরে, বুটপায়ে বাঁকা সিঁতে কেটে,দাঁতে মিসি লাগিয়ে কোথায় যায় জানো? বেশ্যাবাড়িতে। ওকে যতটা পারো এড়িয়ে চলো। তোমারও কাঁচা বয়েস কিনা, তাই বললাম।

সতীনাথ ঘাড় নাড়লো, তাই হবে।

কিন্তু তার আগেই সতীনাথের একবার নরক-দর্শন হয়ে গেছে এবং ঐ ব্রজেশ্বরের কৃপাতেই।

মাসের প্রথম দিকে ব্রজেশ্বর একদিন বিকেলে সেজেগুজে সতীনাথকে আড়ালে ডেকে বললো, চল, বেড়িয়ে আসি। অবিশ্যি, আমি আগে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াই গিয়ে, তুই পরে আয়।

সতীনাথ বললো, কেন? লুকোচুরি কেন?

ব্রজেশ্বর বললো, পরে বলবো। তুই আয় তো।

সতীনাথ ব্রজেশ্বরের কথামতো পরে বেরিয়ে ব্রজেশ্বরের সঙ্গ নিলো। ব্রজেশ্বর হেসে বললো, তুই কি এখানে শুধু রাঁধুনীগিরিই করবি? শহর বাজার দেখবিনে? এখানকার হালচাল?—তারপর চোখ-ইশারায় বললো, একটু মজা দেখবিনে? মজা লুটবিনে?

এবং তার মতামতের অপেক্ষা না করেই ব্রজেশ্বর প্রায় সতীনাথকে বগলদাবায় করে টেনে নিয়ে চললো। অলিগলি পার হয়ে একটা রাস্তায় এসে দেখে, অবাক কান্ড। রাস্তায় দুধারে কাঁচ-পাকা বাড়ি। বাড়ির দরজায় বা দোতলার বারান্দায় মেয়েরা সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে রং মাখা। খোঁপায় বেলফুলের মালা। চোখে কাজল। মুখে হাসি। কয়েকজন মেয়েমানুষ দোতলায় বারান্দায় বসে ফরসিতে তামাক টানছে।

সতীনাথ অবাক হয়ে দেখতে লাগলো: ওরা সব কে?

ব্রজেশ্বর চোখ নাচিয়ে বললো, হুরী, রূপসী, চাঁদবদনী সব।

রাস্তায় সতীনাথ দেখলো, মালীরা নানারকম সুগন্ধী ফুলের মালা, গুড়-গুড়ি, আড়ানি, পাখা ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। পথের ধারেধারে আতর গোলাপ ফুলেল তেল বিক্রি হচ্ছে। আর অনেকগুলো মদের দোকান এদিক-ওদিক। দোকানগুলোর সামনে ফুলুরি, চিংড়ি, তপসে, ইলিশ মাছ ভাজা, পাঁঠার মাংস, হাঁসের ডিম সেদ্ধ, আলুর দম, পেঁয়াজ দিয়ে তেলেভাজা ছোলা এবং আরো বহুরকমের মদের চাট সাজানো। অবশ্য খাবারের দোকানও আছে দুএকটা।

সতীনাথ দেখলো, ঐসব বাড়িতে পুরুষরা কেউকেউ ঢুকছে, আবার বেরুচ্ছেও কেউ-কেউ। কোনো-কোনো বারান্দা থেকে মেয়েমানুষগুলো হেসে পথচলতি লোকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আশ্চর্য, না গেলে গালাগালি দিচ্ছে তাদের। একজন মেয়েমানুষ একটা লোকের গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিলো খানিকটা। একজন পানের পিক।

দেখে সতীনাথের গা-টা ঘিনঘিন করে উঠলো: আচ্ছা মেয়েমানুষ তো। অসভ্য। সতীনাথ থেমে গেলো। ব্রজেশ্বর তার হাত ধরে রংবেরংয়ের

গণিকাদের দেখতে দেখতে চলছিলো, হঠাৎ তার হাতে টান পড়ায় ফিরে দাঁড়ালো : কি হলো রে ? আয় ।

—না ।—সতীনাথ বললো ।

এমন সময় সামনের বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো কয়েকটি মেয়েমানুষের মধ্যে একজন এসে ব্রজেশ্বরের হাত ধরলো : এসো ভাই এসো, বসবে এসো !

ব্রজেশ্বর সতীনাথকে বললো, আয়, চল যাই ভেতরে ।

কিন্তু সতীনাথের সেই উত্তর : না ।

বেশ্যাটা ব্রজেশ্বরের গলা জড়িয়ে অন্তরঙ্গতার সুরে বললো, কেন ভাই ঐ কাঁচ খোকাকে ধরে এনেছিস ? দেখলে ভয় পাবে যে !

শুনে মেয়েগুলো হো-হো করে হেসে উঠলো ।

আর সতীনাথ এক ঝটকায় ব্রজেশ্বরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দে দৌড়, প্রায় পাঁড়-মরি করে ! আর কোন দিক দিয়ে, কীভাবে যে সে রাধাবল্লভ শেঠের মশলার গদিতে এসে পেঁছুলো, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না ।

সতীনাথ সতীশ সরকারের কাছে কথাটা একেবারেই চেপে গেলো । বরং একদিন তুললো মানিক মুখুজ্জের কথা : তাকে চেনেন দাদা ?

—থাকে কোথায় ?—সতীশ সরকার জিগ্যেস করলো ।

সতীনাথ বোঁচকা থেকে ঠিকানাটা বার করে তাকে দেখাতেই প্রায় আঁতকে উঠলো : এ যে কলকাতার এক নামকরা বাবুর ঠিকানা ! সেখানে থাকে ? কী করে সেখানে ?

—তা তো জানিনে !

সতীশ সরকার বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললো, বুঝেচি : লোকটা বোধহয় ঐ বাবুর আশ্রয়েই থাকে । বাবুর মোসাহেব । তা বাপু, তুমি সেখানে যাবে কি করে ? দারোয়ানরা যে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে ।

—তাই নাকি ?—সতীনাথ ভয় পেলো : তবে দরকার নেই ।

—কিন্তু কী দরকারটা ছিলো শুনি ?

—এমন কিছুই নয় । মানে, আশ্রয় ।—সতীনাথ বললো, উনি আমাদের জানিত লোহারাম বাঁড়ুজ্জের জামাই ।

শুনে হেসে উঠলো সতীশ সরকার : সে এখন হয়তো জামাইবাবুটি সেজে বাবুর মোসাহেবী করচে ।

সতীনাথ জিগ্যেস করলো, সে আবার কী কাজ ?

—সে অতি মহৎ কাজ।—সতীশ সরকার বললো, এতে দিব্যি দু'পয়সার মুখ দেখতে পাওয়া যায়, বোতলের পেসাদ পাওয়া যায়, এ'টো মেয়েমানুষের স্বাদ পাওয়া যায়। আর কাজের মধ্যে বাবু হে'-হে' করলে ওদেরও হে'-হে'-হে'-হে' করতে হয়, বাবু হো-হো করে হাসলে ওদেরও ওহো-ওহো করতে হয়। বাবু হাই তুললে ওদের তুড়ি দিতে হয়। বাবু বাহা বললে ওদের আহা-হা বলতে হয়। বাবুর প্রস্রাব পেলে ওরা হাঁ করতে যায়. আবার কেউবা হয়তো বাবুর হয়ে নিজেই কম্মোটি সেরে আসে।

—ছ্যা-ছ্যা!—সতীনাথ মুখবিকৃতি করে।

—তাইতো বাপু, তুমি দেখচি ভালো লোকের ভরসায় এসেচো।— সতীশ সরকার বললো, তা এখন আশ্রয় তো একটা পেয়েচো। কিন্তু তোমার মতলবটা কি বলো তো হে বাপু?

—এই একটা চাকরিবাকরি করা। দেশে বিধবা মা আছে। তার—

শুনে সতীশ সরকার বাধা দিলো: আরে মা তো দু'দিন আছে। তারপর তো সংসারধম্মো আছে গো। বলি ন্যাকাপড়া কতদূর?

—পাঠশালা পার হয়েচি।

—তবে এক কাজ করো—সতীশ সরকার বললো, কিছু ন্যাকাপড়া শেখো আরো। তাতে ইংরেজ সরকারে একটা ভালো কাজও জুটে যেতে পারে। নইলে বাজার সরকার বা এইরকম রাঁধুনীগিরি করেই কাটাতে হবে।

অতএব সতীনাথ 'ন্যাকপড়া'র দিকেই ঝোঁক দিলো। চেয়েচিন্তে যোগাড় করলো টমাস ডীন প্রণীত পুরোনো স্পেলিং বুক, স্কুল-মাস্টর, কামরুপা আর পারসী বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ তুতিনামা। দোকানের সবাই ঘুমুলে সতীনাথ রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তে লাগলো: Well মানে আচ্ছা, ভালো, পাতকো। Bear মানে সহ, বহ, ভাল্লুক। শিখতে লাগলো, Flower মানে ফুল, Flour মানে ময়দা, Floor মানে মেজে। খাম্বাজ রাগিণী আর তাল ঠুংরীতে লেখা ইংরেজী শব্দের গানও সে মুখস্থ করলো—নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেস্ট (Nearest) অতি কাছে। কট (Cut) কাট, কট (Cot) খাট, ফলোয়িং (Following) পাছে।

তারপর সতীনাথ ধরলো Pert Royal Grammer—এক বিরাট ব্যাপার। যাকে বলে, রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ। আর সেই সঙ্গে ইংরেজী বাংলা ডিক্সনারী মুখস্থ করা। এ যদি পারে, তাহলে তো সতীনাথ হবে

ইংরেজীতে বিদ্যাদিগগজ। সতীনাথ রাত থাকতে উঠে দ্বলেদ্বলে শ্বর্ব করলো পড়া—ইংরেজী ভাষা শিক্ষা। সতীনাথের কাণ্ড দেখে রাখাল হরেকৃষ্ণ ব্রজেশ্বর শ্বর্ব করলো ঠাট্টা : ছায়েব। সতী-ছায়েব।

কিন্তু সতীনাথ সে ঠাট্টা গায়েও মাখলো না। জানে সে, রাস্তা দিয়ে হাতী চলতে দেখলে পথের কুকুর ঘেউ-ঘেউ করবেই।

অথচ ওদেরই মধ্যে হরেকৃষ্ণের যখন 'লোনা' লাগলো, তখন সতীনাথই নিলো তার দেখাশোনার ভার। কলকাতার ঐ এক ম্বশকিল। ইংরেজ নতুন শহর গড়ে তুললে কি হবে, জল-হাওয়া মোটেই ভালো নয়। বিশেষ করে মফঃস্বলের লোকেরা কলকাতায় এসে প্রায়ই এই অজীর্ণ রোগে ভুগতে থাকে। ···সতীনাথের কলকাতার আসার কিছ্বদিন আগেই হরেকৃষ্ণ এখানে এসেছিলো, কিন্তু দোকানের কাজের চাপ, খাওয়ার অনিয়ম আর অত্যন্ত লোভী হওয়ায় যা-তা যেখানে-সেখানে খাওয়ার দর্বন তার শরীরটা যেন ভেঙে পড়লো। কিছ্ব খেলে আর হজম হয় না। ম্বখে অর্বচিও দেখা গেলো : ক্রমে শরীরটা ভেঙে পড়লো হরেকৃষ্ণের। মাটির ভাঁড়ে অনেকদিন ন্বন রাখলে যেমন হয়, তেমনিই হলো হরেকৃষ্ণের দেহের অবস্থা। গায়ের চামড়া উঠতে যেতে লাগলো, গায়ের রংটা ফ্যাকাশে হতে লাগলো। ক্রমে দ্বর্বল হয়ে পড়লো হরেকৃষ্ণ।

রাধাবল্লভ শেঠের সেদিকে নজরও নেই, সময়ও নেই। তার কাজ চাই, কাজ হলেই হলো। চাকরি যাবার ভয়ে হরেকৃষ্ণ মালিককে ম্বখে কিছ্বই বললো না। তবে সতীশ সরকারের নির্দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। আর সেবার ভার নিলো সতীনাথই। নিয়মিত তাকে কাঁচা থোড় খাওয়াতে লাগলো, কলমীর ঝোল রেঁধে দিতে লাগলো আলাদা করে। দ্বপ্বরে স্নানের সময় তার গায়ে কাঁচা হল্বদ ঘষে ঘষে মাখিয়ে দিতে লাগলো সতীনাথ।

তাছাড়া কোবরেজী ওষ্বধও খেতে লাগলো হরেকৃষ্ণ। কিন্তু কিছ্বতেই যেন কিছ্ব হলো না।

শেষে সতীশ সরকারই বললো, বাপ্ব, বাঁচতে যদি চাও, পালাও। এখানকার এই 'লোনা' লাগা রোগ বড়ো ভয়ানক। এখন দরকার তোমার ত্রিবেণী বা শান্তিপ্বরে গিয়ে হাওয়া বদলে আসা। এখানকার বহ্বলোক ওখানেই যায় হাওয়া বদল করতে। খ্বব জল-হাওয়ার গ্বণ। আর নয়তো সোজা চলে যাও দেশে।

এবং শেষপর্যন্ত হরেকৃষ্ণ সোজা দেশেই চলে গেলো। হাওয়া বদলাবার জন্যে বাইরে যাবার পয়সা কোথায় তার?

কিছুদিন পরে ব্রজেশ্বরের গা দিয়ে যে ঘা বেরুলো, তা দেখে সতীশ সরকারই প্রথমে হাঁ-হাঁ করে উঠলো ঃ সব্বোনাশ, ঐ ফিরিঙ্গী রোগ এনেচিস এখেনে? আমি যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই হলো। গামছা-বিছানা একাকার করবে এখেনে—সেটি তো চলবে না। তুমি বাপু এখেন থেকে বিদেয় হও।

ব্রজেশ্বর কেঁদে পড়লো সতীশ সরকারের পায়ে ঃ বাঁচান দাদা! যা হয় একটা করুন।

—আমি কি করবো? মাগীর বাড়ি যাবার সময় মনে ছিলো না।—সতীশ সরকার দাঁত খিঁচুতে লাগলো ঃ জানো না, জাহাজের সব ফিরিঙ্গীরা এসে ঐ রোগ ছড়িয়ে যায় মাগীদের শরীরে আর তাই সব বয়ে নিয়ে আসা ঘরের মধ্যে! হ্যাঁ, কলকাতার বড়োবড়ো বাবুদের মতো মাগী পোষবার ক্ষেমতা থাকতো বুঝতাম। তা যখন নেই, তখন গরীবের এসব ঘোড়ারোগ কেন?

কিন্তু কেমন করে যেন ব্রজেশ্বরের ঘোড়ারোগের খবর পৌঁছুলো রাধাবল্লভ শেঠেরও কানে। এবং সঙ্গেসঙ্গে কর্তা ব্রজেশ্বরকে ডেকে বললো, ওহে রসের নাগর, তোমার পোঁটলা বেঁধে ফেলো তো! এখুনি, এই মুহূর্তে—

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোঁটলা হাতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

অর্থাৎ আরো কাজের চাপ পড়লো সতীনাথের ঘাড়ে।

সতীনাথ দেখলো, পড়ার দফা গয়া! হিসেবী রাধাবল্লভ শেঠ সতীনাথের কাঁধে চাপালো হরেকৃষ্ণ আর ব্রজেশ্বরের কাজ। অবশ্য এবার মাস-মাইনে ধার্য করে দিলো দুটাকা। কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা কাজের পর আর তার বই সামনে নিয়ে বসা হলো না। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরই মড়ার মতো ঘুমুতে লাগলো সতীনাথ আর সকালে জাগতে লাগলো সতীশ সরকারের ধাক্কায়। বইগুলোতে ধুলো জমতে লাগলো।

শেষে একদিন সতীনাথ বললো সতীশ সরকারকে, দাদা, কি করি বলুন তো?

সতীশ সরকার তার হুঁকোয় টান দিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, বলবো?

—বলুন দাদা, একটা পরামর্শ দিন।—সতীনাথ প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

—তবে শোনো—সতীশ সরকার নীচু গলায় বললো, এখেন থেকে সরে পড়ো। নইলে কিসসু হবে না। গাধার খাটনি খাটতে-খাটতে শেষে গাধাই বণে যাবে।

—কিন্তু খাবো কি, থাকবো কোথায়?—সতীনাথ নিশ্চিন্ত হতে পারলো না।

সতীশ সরকার এবার মুখ ভেংচে উঠলো : আরে গাধা, বাইরে ঘুরে একটা কাজ বা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে, তারপর। একটা ডাল ধরে তবেই তো আগের ডালটা ছাড়তে হয়, এ তো হনুমানেও জানে!

শুনে সতীনাথের মনে হাসি দেখা দিলো : ঠিক বলেচেন দাদা! বাঁচালেন। গাধার খাটনি খাটতে-খাটতে গাধাই বণে যাচ্চি যেন!

২১

সতীনাথ একরকম আদা-জল খেয়ে একটা নতুন আশ্রয় আর চাকরির খোঁজ করতে লাগলো। দুবেলার হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝখানে দুপুরবেলাটায় ঘণ্টা দুয়েকের অবসর। গদির কাজ করে, রান্না করে সবাইকে খাইয়ে, নিজে কোনোরকমে নাকে-মুখে গুঁজে বেরুতে লাগলো কাজের সন্ধানে। কোনোদিন বেলগাছিয়া, কোনোদিন সিমুলিয়া, কোনোদিন শিয়ালদা, কোনোদিন হিস্তাল, কোনোদিন বা চেরাঙ্গী ঘুরতে লাগলো সে।

রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া পালকির উপদ্রব কম নয়, হাতীর চলাচলও আছে, কাজেই বড়োবড়ো রাস্তাগুলো সাবধানেই পার হয় সতীনাথ। একদিন তো হিন্তালের কাছে নিজের চোখেই দেখলো, এক সাহেবের চলতি টমটম গাড়ি পথচলতি এক গেঁয়ো চাষীকে প্রায় চাপা দিয়ে যাবার যোগাড়। লোকটা রাস্তায় পড়ে গেলো, গাড়ির পেছনের চাকায় চোট লাগলো তার বাঁ পা-টায়, রাস্তার ধুলোয় মাখামাখি হলো তার সর্বাঙ্গ। উপরি পাওনা পেলো কোচোয়ানের ছিপটি, আর সোয়ারী সাহেবের ইংরেজী গালাগাল : রাসকেল, ননসেন্স, গোটোহেল! লোকটার শক্ত প্রাণ, তাই ধুলো ঝেড়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে এসে বসলো রাস্তার পাশে ঘাসের উপরে।

সতীনাথ লোকটাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময়ে একজন গোরা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে 'ইউ ব্লাডি নিগার, হটো' বলে গালাগাল দিয়ে তার গা ঘেঁসে চলে গেলো ধুলো উড়িয়ে। সতীনাথ হকচাকিয়ে সরে না গেলে নিজেই হয়তো ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে একটা মাংসের তাল হয়ে যেতো! সতীনাথের চোখ-মুখ ধুলোয় ভরে গেলো। সে তাড়াতাড়ি গায়ের উড়নি দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে সরে গেলো পাশেই পুকুরের ধারে। আঁজলা

করে পুকুরের জল নিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে ফেললো। ভাবলো, ইস খুব বাঁচা গেছে! একেই বলে হয়তো, রাখে কেষ্ট মারে কে?

তবে সতীনাথ তার খোলা চোখ দিয়ে শহরের অনেক দিছু দেখলো। দেখলো ধাপার পাশে মালাঙ্গাদের নূন তৈরি করা, দেখলো নতুন তৈরি সার্কুলার রোডে সাহেব-মেমদের চলাফেরা, অবশ্য দূর থেকেই। দেখলো ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কাছে কোম্পানির কেরানীদের বাড়ি। বাঙ্গালী বেনিয়ান নিমাই মল্লিক, হিদারাম বাঁড়ুজ্জে, অক্রুর দত্তদের বিরাট-বিরাট বাড়ি। আর চোখে পড়লো ইংরেজী পড়বার ফিরিঙ্গীদের স্কুলঃ চিৎপুরে শেরবোর্ন সাহেবের স্কুল, ধর্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, শিয়ালদার কাছে হ্যাটম্যান সাহেবের স্কুল। চলতে চলতে সতীনাথ দাঁড়িয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য এই স্কুলগুলোর সামনে, মনে-মনে অনেক কিছুই ভেবেছিলো সে ঃ আহা, যদি ঢুকতে পারা যেতো ঐ গেটের মধ্যে! ঐ গেটের মধ্যেই সতীনাথের স্বপ্নের তীর্থ! মা সরস্বতী বুঝি ওখানেই বিদ্যা দান করছেন অকৃপণ হাতে। অথচ তার ভাগ্যে না, না, ভাবাই যায় না। সতীনাথ আর দাঁড়ায়নি সেখানে।

অবশ্য একদিন হাটখোলায় বিরাট এক প্রাসাদের গেটের বাইরে থমকে থামতে হয়েছিলো সতীনাথকে। আশেপাশে কাঁচা নর্দমা, অথচ তার নাকে এলো ভুরভুর করে গোলাপের সুবাস। ব্যাপার কি? কাছে তো কোনো ফুলের বাগান নেই। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো সতীনাথ। নিঃশ্বাস টেনেটেনে হাওয়া শুঁকতে লাগলো সে।

হঠাৎ পেছন থেকে এক ফুলবাবুর ডাকে সতীনাথের চমক ভাঙলো ঃ কী বাওয়া? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটুকু হাওয়া টেনে নিচ্চে? ব্যাপার কি?

সতীনাথ দেখলো, চওড়া কালো পাড় ধুতি, পিরান পরনে, পামসু জুতো পরা এক ভদ্রলোক। প্রজাপতির মতো একজোড়া গোঁফ, মাথায় কোঁকড়ানো চুলের সোজা সিঁথি। কোঁচা পিরানের বুকপকেটে গোঁজা। হাতে ছড়ি।

সতীনাথ বললো, মশায়, এখানে এতো সুবাস কোত্থেকে আসচে, তাই ভাবচি!

—ভাবচো? ভাবো।—হাত ঘুরিয়ে ফুলবাবুটি বললো, সাত দিন সাত রাত ভেবেও কূলকিনারা করতে পারবে না। আমরাও পারতাম না, যদি না বাবুর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরতে পারতাম।

কথাটা শুনেই সতীনাথ বুঝতে পারলো, ইনি কোন চীজ। সতীশ

সরকার চিনিয়ে দিয়েছে : ঐ বড়োবাড়ির বাবুর মোসাহেব বোধহয়। আর মোসাহেবের কথা মনে পড়তেই মনে পড়লো মানিক মুখুজ্জের কথা, বল্লভপুরের লোহারাম বাড়ুজ্জের জামাই। তাকে ভরসা করেই সে এই শহরের দিকে পা বাড়িয়েছিলো। তার কাছে একবার গেলে হয় না? যদি—

—বলি, এ কোন বাবুর বাড়ি জানো?

ফুলবাবুর জেরায় সতীনাথের আশ্রয়-চিন্তার সুতো গেলো ছিঁড়ে। তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বললো, না তো।

—সে কি?—ফুলবাবু আকাশ থেকে পড়লো : আচ্ছা তো উল্লুক ভল্লুক হে! বলি কোন মুল্লুকে বাড়ি?—হাতের ছড়িটা সতীনাথের বুকের উপর ঠেকালো।

ভয় পেয়ে সতীনাথ বললো, আজ্ঞে গাঁ থেকে আসচি কিনা, তাই জানিনে।

—অ। তাই বলো।—হো-হো করে হেসে উঠলো ফুলবাবু : এই যে এখানে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেচো, আর খোদ কর্তার পেয়ারের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারচো, এতেই জেনে রাখো, তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেলো। আর বিনে পয়সায় এখানকার এতোটা যে সুগন্ধি হাওয়া বুকে ভরে নিলে তাও এই আমারই দয়ায়। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি তোমার নাক-মুখ বন্ধ করে তোমার একদম 'হাওয়া-বন্ধ' করে দিতে পারি। বুঝলে?

সতীনাথ তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, বুঝলাম।

—আর এটা তো বুঝলে না এখনো, কোন স্বর্গের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েচো তুমি? হ্যাঁ হে?

—আজ্ঞে বোঝান।—হাত কচলে বললো সতীনাথ।

—গানুবাবু। গানুবাবু।—ছড়িসুদ্ধ হাত তুলে জোড়হাতে প্রণাম করলো প্রাসাদ লক্ষ্য করে।

দেখাদেখি এবং ভয়ে ভয়ে সতীনাথও তাই করলো।

—বাবু তো বাবু গানুবাবু। বুঝলে?—ছড়ি ঘুরিয়ে বললো ফুলবাবু : এতো সুবাস কিসের শুনবে? রোজ এই বাড়ির ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত আতর আর গোলাপজলে ধোয়া হয়। বলি, মাথায় গেলো কিছু?

—আজ্ঞে, মাথাটা ঝিমঝিম করচে শুনে।—নিজের কপালটা টিপে ধরলো সতীনাথ।

—আহা, তা তো করবেই!—ফুলবাবু বিজ্ঞের মতো বলেই হঠাৎ জেরা করলো: কিসে খাও তুমি?

—আমি?—অবাক হলো সতীনাথ এই অদ্ভুত প্রশ্নে: এই কলাপাতায়, শালপাতায়, কখনো মাটির থালায় আর কখনো বা কাঁসার থালাও জোটে বরাতে!

—আর গানুবাবু খান সোনার থালায়!—ফুলবাবু উদাস হয়ে বললো, আর তাছাড়া উপায়ই বা কি? কাঁসা-পেতল কিছু ঘরে থাকলে তো? কাজেই দুবেলা একশোখানা করে সোনার আর রুপোর বাসন পড়ে উঠোনে মাজবার জন্যে!

—সর্ব্বোনাশ! চুরি হয় না!—আঁতকে উঠলো সতীনাথ।

—চুরি? বলি, ঘাড়ে তো লোকের একটা করেই মাথা! না, তোমার দশটা আছে রাবণের মতো?

নিজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে সতীনাথ বললো, আজ্ঞে না, একটাই। আচ্ছা, চলি এখন মশায়। প্রণাম হই।

—সে কি?—বাধা দিলো ফুলবাবু: এর মধ্যে প্রণাম করলে চলবে কেন? বলি বাবু তো বাবু গানুবাবু খান কিসে তো শুনলে। কি পরেন, তা তো শুনলে না বাপু!

—আজ্ঞে বুঝতে পেরেচি!—সতীনাথ বললো, বাবু বোধহয় সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকেন!

—দুর হতভাগ্য!—ফুলবাবু হাসলো: এ কি তোমার ঐ ঝামাঘষা শরীর! মা আমার, হ্যাঁ! আমার রক্তমাংসের শরীর আর গানুবাবুর ননীর শরীর। কাজেই রোজ তাঁকে নতুন নতুন মিহি ঢাকাই ধুতি পরতে হয়, তাও আবার কোমরের দিকের পাড়টা ছিঁড়ে ফেলে!

—কারণ!

—কারণ তোমাকে বাৎলাতে হবে?—হঠাৎ যেন ফুলবাবুর খেয়াল হলো, এতক্ষণ একটা পথের গেঁয়ো লোকের সঙ্গে কথা বলাটা খুব ভুল হয়ে গেছে। তাই চেঁচিয়ে ছড়ি উঁচিয়ে বললো, ড্যাম ব্লাডি, গেট আউট!—বলেই আবার ছড়ি নামিয়ে বললো, অল রাইট, দাঁড়াও, বলবো। গানুবাবুর নুন যখন খাচ্ছি, গুণ গাইতে হবেই। বেইমানি করা চলবে না।

—সে তো বটেই!—সতীনাথ সায় দিলো।

—তবে বোঝো এখন গানুবাবু পাড় ছিঁড়ে পরেন কেন?

সতীনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললো, বোঝান আপনি।

—আরে গর্দভ, নইলে তাঁর শ্রীকোমরে দাগ হয়ে যাবে না?—ফুলবাবু প্রজাপতি-মার্কা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বললো, আরে বাপু, তাঁর টাকায় ছাতা ধরে বলে সিন্দুক থেকে বার করে রোদ্দুরে শুকোতে হয়। তাঁর পক্ষে ওসব তো—

—অ্যাঁ বলেন কি? আমার মাথা – আজ্ঞে আমি আসি।

ফুলবাবু বললো, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এমন সোনার গল্প শোনার অভ্যেস নেই তো, তাই মাথাটা তোমার—তাছাড়া, একেবারে তুমি কানট্রি-মেড, মানে গেঁয়ো।—বলেই বুঝি মনে পড়ে গেলো ফুলবাবুর ঃ যাব্বাবা, পকেটেই তো কানট্রি-মেড নয়, খাস বিলিতী মাল আছে। বললো, একটু হবে নাকি?

শুনেই ভয় পেয়ে গেলো সতীনাথ ঃ আজ্ঞে না মশায়, ওসব আমার—আমি চলি!

সতীনাথ আর সেখানে দাঁড়ালো না, হনহন করে সোজা হাঁটা দিলো সে।

ফুলবাবু সতীনাথের কাণ্ড দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো ঃ ব্যাটা ধেনো। পিরানের পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করে ছিপি খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে নিলো ফুলবাবু ঃ ব্যাটা ধেনোর সঙ্গে বকবক করে শালার গলাটা একদম শুকিয়ে গেছলো। ইস্টুপিড!

সতীনাথ রোজ ঘুরে ঘুরে অনেক রকম লোক, অনেক রাস্তাঘাট দেখলো, কিন্তু চাকরি বা আশ্রয়ের কোনো আশাই দেখতে পেলো না। সাহস করে কোথাও চাকরির কথা বললেই তেড়ে আসে, আশ্রয়ের কথা মুখ দিয়ে বলাই যায় না।

শেষে সতীশ সরকারকে সতীনাথ বললো একদিন ঃ হবে না দাদা। কপাল একদম পাথর চাপানো।

—তবে মুখ থুবড়ে এখানেই পড়ে থাকো।—সতীশ সরকার হুঁকো টানতে লাগলো ঃ কথাই আছে পুরুষস্য ভাগ্যং।

হ্যাঁ, পুরুষস্য ভাগ্যংই বটে!

নইলে দুদিন পরে চেরাঙ্গীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সতীনাথের ভাগ্য খুলে যাবে কেন? সতীনাথের সুযোগ জুটে গেলো এক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

সতীনাথ যে রাস্তা পার হচ্ছিলো তার খানিক দূরে আসছিলো এক হাতী। পিঠে হাওদা, কোনো বড়লোক তার সোয়ারী। হঠাৎ দেখে, একটা টমটম গাড়ি পাশের রাস্তা থেকে বার হতেই তার ঘোড়া দুটো গেলো ভড়কে সামনেই বিরাট হাতী দেখে। আর সঙ্গেসঙ্গে এলোমেলো ছুটতে ছুটতে গাড়িসুদ্ধ নিয়ে পড়লো গিয়ে পাশের কাঁচা নর্দমায়। কোচোয়ান লাগাম টেনেও কিছুই করতে পারলো না।

কান্ড দেখে কাছাকাছি দুচারজন যারা ছিলো ছুটে ছুটে গেলো। সতীনাথও। কোচোয়ান ততক্ষণে কোচবাক্স থেকে লাফ মেরে রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘোড়া দুটো গাড়িতে জোতা অবস্থায় চওড়া নর্দমার মধ্যে বসে পড়ে পরিত্রাহি চীৎকার করছে—চিঁ-হি-হি! আর গাড়ির সামনের চাকা ভেঙে নর্দমার পাঁকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ায় গাড়ির ভেতরে আটকানো সোয়ারী এক সাহেব আর মেম দুর্গন্ধ পাঁকে মাখামাখি হয়ে কাতরাচ্ছে—হেল্প, হেল্প।

ব্যাপারটা দেখে সতীনাথের হঠাৎ যেন সাহস বেড়ে গেলো, শরীরে এলো যেন হাতীর বল। গায়ের উড়নি কোমরে বেঁধে নিয়েই নর্দমার পাঁকে খানিকটা নেমে গিয়ে জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিলো গাড়ির দরজায়। ঘড়াৎ করে খুলে গেলো দরজা। সামনেই বসে ছিলো মেমসাহেব—কোমর পর্যন্ত পাঁকে ডোবা। কাম, ম্যাডাম—বলেই তার হাত ধরে উঠিয়ে কাঁধে তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলো তাকে। দিয়েই আবার পাঁকে নেমে সাহেবের হাত ধরে টেনে বললো, কাম স্যার। বুক পর্যন্ত পাঁকে ডোবা সাহেবও সতীনাথের হাতের টানে খানিকটা এগিয়ে আসতেই তার কোমর জড়িয়ে ধরে সতীনাথ তাকেও এনে তুললো মেমসাহেবের পাশে।

কোচোয়ান আর আশেপাশের লোকেরা হতভম্ব হয়ে সতীনাথের কান্ড দেখলোই শুধু, কিছু করবার সুযোগই পেলো না। বরং অনেকেই ভাবলো, যাক, পাঁক ঘাঁটবার হাত থেকে বাঁচা গেলো। কয়েকজন সরে পড়লো আস্তে-আস্তে।

সতীনাথ নিজের কোমর থেকে উড়নি খুলে সাহেবের হাতে দিয়ে মোছবার ইংরেজী কথাটা খুঁজে না পেয়ে ইশারায় জানলো, মুছে ফেলো গায়ের কাদা।

সাহেব উড়নি এগিয়ে দিলো মেমসাহেবকে। মেমসাহেব উড়নি দিয়ে গায়ের পাঁক যতটা সম্ভব মুছে সেটা এগিয়ে দিলো সাহেবকে। সাহেবও সেটির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করলো।

সতীনাথ পাঁক মাখানো উড়নি হাতে নিয়ে সাহেব-মেমকে নমস্কার জানিয়ে বললো, আই গো !

—নো ! ওয়েট ।—সাহেব দাঁড়াতে বললো সতীনাথকে এবং হঠাৎ একটু দূরে দাঁড়ানো কোচোয়ানের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাদামাখা বুটসুদ্ধ তার কোমরে মারলো এক লাথি ঃ ড্যাম্, ব্লাডি, সোয়াইন !

কোচোয়ান পড়ে গেলো মাটিতে ! আর তাই দেখে আশপাশের বাকি কজন লোক ভয়ে যে যেদিকে পারলো দিলো ছুট । সতীনাথও ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেলো । কিন্তু আশ্চর্য, এদিক-ওদিক থেকে পালকি-বেহারারা ব্যবসা-বুদ্ধি খরচ করে তিন-চারটে পালকি নিয়ে উপস্থিত হলো ঘটনাস্থলে ।

সাহেব হাতের কাছে পালকি পেয়ে মেমসাহেবকে একটায় উঠিয়ে নিজে একটায় উঠে সতীনাথকে আর একটা পালকি দেখিয়ে বললো, ইউ প্লীজ গেট ইন ।

সাহেবের কথায় থতমত খেয়ে সতীনাথ বললো, আই ? আই ?

—ইয়েস । ইউ ।—সাহেব বললো ।

হেসে মেমসাহেবও বললো, প্লীজ !

অগত্যা সতীনাথ পালকিতে চড়ে বসলো । বেশ ভয়ে ভয়েই । তার জীবনে এই প্রথম পালকি চড়া ।

২২

চেরাঙ্গী থেকে কিছুদূরে বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডে ঢোকবার মুখে কম্পাউন্ড সমেত বিরাট বাড়িটার এক কোণের ঘরে সতীনাথ আশ্রয় পেলো । হেনরি জনসনের বাড়ি ।

জনসন বললো, ম্যান, টুমি আমাডের বাঁচাইয়াছে । টুমি উট্টম লোক আছে । হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ?

সতীনাথ সাহেবের শেষ কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলো না, তবে বুঝলো যে সাহেব তার উপর খুশি । তাই সাহস করে বলেই ফেললো ঃ একটা চাকরি দিন না সাহেব ?

—চাকরি ? সার্ভিস ?—সাহেব খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললো, অ'রাইট ! টুমি হামাকে বাংলা পড়াইবে, অ্যান্ড—অ্যান্ড—মানে, এবং এখানে ঠাকিবে, খাইবে, দুই টাকা মাহিনা পাইবে ।

শুনে সতীনাথ যেন হাতে চাঁদ পেলো। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো তার, সাহেবরা গোমাংস খায়, এখানে সে খাবে কি করে? তাই ভয়ে ভয়ে সতীনাথ বললো, আই ব্রাহ্মণ স্যার!

—আই সী!—জনসন হাসলো: ইউ ব্রাহ্মিণ? টবে টুমি ঠাকিবে, নিজে খাইবে অ্যান্ড—অ্যান্ড—

—অ্যান্ড মানে এবং – সতীনাথ মাস্টারি শুরু করেই দিলো।

—ইয়েস, এবং পাঁচ টাকা মাহিনা পাইবে। রাইট?

সতীনাথ ঘাড় নেড়ে বললো, যে আজ্ঞে সাহেব!—পরে দু'হাত কচলে বললো, কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে সাহেব।

—হোয়াট?

সতীনাথ বললো, সাহেব, অনেকদিন থেকেই আপনাদের ঐ মাতৃভাষা শেখবার খুব বাসনা। যদি কৃপা করে—

শুনে সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলো: ইয়েস, ইয়েস, সার্টেনলি। গ্ল্যাডলি—মানে—কৃপা করে—কৃপা করে হামি টোমাকে ইংলিশ শিখাইবে।

অর্থাৎ জনসন সাহেবের কৃপায় সতীনাথ শুধু আশ্রয় পেলো না, নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করবার সুযোগও পেলো। রাধাবল্লভ শেঠের মশলার গদি থেকে আবার গাদায় না পড়ে একটা মান্যগণ্য পদ পেলো সতীনাথ। বাড়ির এক কোণে একখানা পুরো ঘর পেলো সাজানো-গোছানো। রান্নার ব্যবস্থা নিজেই করে নিলো সতীনাথ। আর শুরু হলো, সকাল-বিকেল সাহেবের অফিস থাকায়, দুপুরবেলায় খাওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ভাষা-বিনিময়। এই ভাষা-শিক্ষা হতো অদ্ভুত কৌশলে—অর্থাৎ যাকে বলে হাতে-কলমে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী লাফঝাঁপ আর ইশারায়। সাহেবকে 'ক্রন্দন' কথাটার মানে বোঝাবার জন্যে নিজের চোখে উড়নির খুঁট চেপে এঁ্যা-এঁ্যা করে কেঁদে দেখাতে হলো সতীনাথকে। আবার হো-হো করে হেসে বোঝাতো হাসি বা হাস্য কথাটার মানে। এবং সাহেবও সতীনাথকে Jnmp কথাটার মানে বোঝাবার জন্যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাফঝাঁপ শুরু করে দিতো, আবার নেচে বোঝাতো dance কথাটার মানে। Ball dance-এর মানে বোঝাবার জন্যে সাহেব তো একদিন সতীনাথকে টেনে উঠিয়ে তার কোমর ধরে নাচতে শুরু করে দিলো।

কিটি, অর্থাৎ মেমসাহেব কাছেই সোফায় বসে হাত-পাখায় হাওয়া খেতে খেতে দুই শিক্ষক-ছাত্রের পড়াশোনা মন দিয়েই শুনতো রোজ আর রপ্ত

করবার চেষ্টা করতো হয়তো, তবে বেশির ভাগ সময়েই চেয়ে থাকতো সতীনাথের দিকে। জনসনের বল-ডান্স দেখে কিটি হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললো, হেনরি, ইউ আর এক্সপ্লেনিং রংলি। দ্য বল-ডান্স শুড বি উইথ এ লেডি।

জনসন নিজের ভুল বুঝে বললো, রাইট।—সতীনাথকে বললো, হামার সিস্টার—আই মীন, আই মীন, ইয়েস, ভগ্নী কিটি বলিটেছে, বল-ডান্স লেডির সাহিট হইবেক।

সর্বনাশ! সতীনাথ ভয় পেয়ে গেলো। একে তো ম্লেচ্ছ ইংরেজের হঠাৎ আলিঙ্গনে তার শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করছে, এখন এক নারীর সঙ্গে আলিঙ্গন! কিন্তু উপায় নেই। তার মনে হলো, পড়েচি যবনের হাতে, নাচতে হবে একসাথে।

কিটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সোফা থেকে। এগিয়ে এসে বললো, কাম মাই পাণ্ডিট। লেটস ডান্স।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি বললো, মেমসাহেব, আমি বুঝতে পেরেচি বল-ডান্সের মানে। আর কষ্ট করে দেখাতে হবে না।

কিন্তু কমলী ছাড়লে তো!—নো, লেটস হ্যাভ প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেসন।

এবং কিটি সতীনাথের আড়ষ্ট ডান হাতখানা নিজের কোমরে জড়িয়ে দিয়ে, নিজের ডান হাতে সতীনাথের বাঁ হাতখানা শূন্যে তুলে ধরলো। সতীনাথ সিঁটকে রইলো আতংকে। কিন্তু কিটি তাকে টানতে লাগলো, এগিয়ে এলো সতীনাথের বুকের কাছে, তার বুকে বুক লাগালো কিটি।

দেখে জনসন হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো: রিয়েলি অ্যান ইন্টারেস্টিং পার্টনার ফর ইউ।

ভারি পাথর নিয়ে আর কতক্ষণ নাড়াচাড়া করা যায়। সতীনাথের শক্ত সবল আড়ষ্ট দেহটাকে নিয়ে কতক্ষণ নাড়াতে পারবে কিটি তার নরম পেলব হাতে? তাছাড়া সতীনাথ একবার তো কিটির পা মাড়িয়ে দিতে দিতে সামলে নিলো। আর সঙ্গেসঙ্গে সতীনাথ নিজেকে মেমসাহেবের বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, ম্যাডাম, নো অ্যাংগ্রি। আর একটু হলেই ইয়োর ফুট প্রেস।

সতীনাথের ইংরেজী শুনে কিটি হি-হি করে হেসে উঠলো: অ'রাইট। থ্যাংকু পাণ্ডিট।

সেদিন সতীনাথ ছাড়া পেয়েই বাইরে বেরিয়ে দোকান থেকে একমুঠো খোল কিনে নিয়ে ছুটলো কাছেই এক পুকুরে। সর্বাঙ্গে খোল ঘসে ঘসে স্নান করলো অনেকক্ষণ ধরে। কী কাণ্ড। কী ঘেন্না।···কিন্তু মেমসাহেবের শরীরটা কী নরম। যেন ননী দিয়ে গড়া।

জনসন সাহেবের বাড়িতে একগাদা ঝি আয়া চাকর বেয়ারা বাবুর্চী মালী দারোয়ান কোচোয়ান সহিস—এলাহি ব্যাপার। দুজন লোকের জন্যে বিশজন সেবক। সেই কথাই লিখেছিলো জনসন হোম-এ তার বোন কিটিকে: তুমি চলে এসো ইণ্ডিয়ায়। এখানে রাজার হালে আছি। বিরাট বাড়ি, বহু দাস-দাসী, নিজেদের গাড়ি-ঘোড়া, প্রচুর ভোজের ব্যবস্থা আর এতো মানসম্মান যে তুমি ভাবতেই পারবে না। আর নেটিভগুলোর মাথায় জুতো রাখলে তারা কৃতার্থ হয়ে যায়, জুতো মারলে দাঁত বার করে হাসে। তাছাড়া আমোদ-প্রমোদেরও হরেকরকম ব্যবস্থা আছে: পার্টি নাইট-ক্লাব থিয়েটার রেস, অনেককিছুই পাবে।···লাস্ট মেলে খবর দিয়েচো, রবার্টের সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেচে। ভালই হয়েচে। হতভাগাটা মাতাল চশমখোর, মেয়েদের মান রাখতে জানে না। এখানে এলে দেখো ইংরেজ ছোকরারা যেকোনো একটি ইংরেজ তরুণীকে পাবার জন্যে হুগলীর জাহাজঘাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। তোমার মতো, সত্যি বলচি কিটি, একটি সুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না যুবতীকে স্ত্রীরূপে পেলে যেকোনো ছোকরা স্বর্গ পাবে হাতে। আর তারাও সব এখানে ভালো মাইনে পায়, ভালো থাকে, ভালো খায়। মনে রেখো, কোম্পানির এই রাজ্যে সব ইংরেজই রাজা। তুমি দ্বিধা না করে নেক্সট অ্যাভেলেবল শিপ-এই চলে এসো—এই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তাছাড়া ইণ্ডিয়া ইজ এ সানি ল্যাণ্ড। প্রচুর রোদ্দুর। অবশ্য গ্রীষ্মকালে বেশ গরম পড়ে। তবে তার জন্যে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল পাংখা খসখস ইত্যাদি অনেকরকম ব্যবস্থাই আছে।

আর তুমি যাতে সাহস পাও, তাই জানিয়ে রাখি, ইণ্ডিয়ায় বাঘ ভাল্লুক সাপ ইত্যাদি আছে বটে, তবে সেসব বনে থাকে। সুটানাটি গোবিন্দপোর বা ক্যালকাটার শহরে থাকে না। এখানে গভর্নর-জেনারেল থাকেন, আরো বড়োবড়ো মিলিটারী অফিসাররা থাকেন আর ফোর্টে থাকে বহু ইংলিশ সোলজার্স। অতএব ডোণ্ট বি অ্যাফ্রেড মাই ডার্লিং।

আর হ্যাঁ, তুমি আমার কথা জানতে চেয়েচো। আমি ভালোই আছি।

স্ত্রী মারা যাবার পর কয়েকমাস খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম, এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি। তবে আবার বিয়ে করবো কিনা ঠিক করিনি এখনো। তাছাড়া এদেশে, ঐ যে বললাম, বিশুদ্ধ ইংরেজ মহিলা পাওয়া বড়ো শক্ত। অবশ্য, তাই বলে কিটি, তুমি যেন ওখান থেকে কোনো খেঁদিপেঁচীকে ধরে এনো না। তবে এটা ঠিক, তেমন কেউ এলেও তাদের এখানে একটা হিল্লে হয়ে যাবে নির্ঘাত! এখানে নীল রক্ত আর সাদা চামড়ার দর অনেক! ইত্যাদি...

জনসন যে কথাটা চিঠিতে বোনের কাছে চেপে গেছলো, সেটা হচ্ছে, মিসেস জনসন ইহলোক ত্যাগ করলেও স্বামীকে তিনি অসহায় করে যাননি। গৃহকর্মের দিক থেকে ঝি-চাকরের কোনো অভাবই ছিলো না। আর দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার জন্যে জনসন বাড়ির মধ্যেই হাতে পেলো মিসেস জনসনেরই খাস-চাকরানী মাদ্রাজী যুবতী কৃষ্ণাকে। মিসেস বেঁচে থাকতেই জনসনের নজর ছিলো মেয়েটির উপর। কৃষ্ণার গায়ের কালো রংটাই ছিলো তার কাছে আকর্ষণীয়ঃ একটু মুখ বদলাবার সাধ। কিন্তু স্ত্রী বেঁচে থাকায় তেমন সুযোগ পায়নি জনসন। সব বাধা কেটে গেলো মিসেসের মৃত্যুতে এবং এক রাত্রে কৃষ্ণার ঘুমন্ত অবস্থাতে জনসন মদ ও মদনে উন্মত্ত হয়ে ঘরে ঢুকে তার ধর্মনষ্ট করলো। অবশ্য কিছু টাকা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে গুঁজে দেওয়ায় এবং ভবিষ্যতে আরো দেবে আশা দেওয়ায় প্রথম রাত্রে মৃদু আপত্তি করলেও কৃষ্ণা পরের রাত্রি থেকে নিজেই গোপনে সাহেবের ঘরে যাতায়াত করতে লাগলো। হয়তো তারও খানিকটা সাদা চামড়ার মোহ ছিলো।

কিন্তু দু'তিন মাস পরেই কৃষ্ণার কুমারী-দেহে অযথা ক্লান্তি আর আলস্যের ভাব দেখা দিলো, মুখে দেখা দিলো অরুচি। মেয়েমানুষ সে, সভয়ে বুঝলো ব্যাপারটা কি, এবং জনসন বুঝলো, সমাজে নিজের মান রাখবার জন্যে মানে-মানে চাকরানীটাকে বিদায় করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব কৃষ্ণাকে তার এক দেশের লোকের সঙ্গে বিদায় করে দিলো, অবশ্য বেশ কিছু টাকাও দিলো তার হাতে।

সতীনাথ কৃষ্ণা-বিদায়ের খবর পেলো। সাহেব-বাড়িরই পুরনো আর্দালী খানসামাদের কাছ থেকে আরো খবর পেলো সে ক্রমেঃ জনসন সাহেবের নাকি এখন দুজন রক্ষিতা! একজন হিন্দু বাঈজী এবং আর একজন মুসলমানী। কোনো এক বাবুর নাচ-পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে বাঈজীর নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং সেই বাবুই ঐ বাঈজীর ব্যবস্থা করে দেন

সাহেবকে। শুধু তাই নয়, ঐ বাবুই নাকি বাঈজীর খরচা দেন সাহেবের হয়ে। কারণও আছে। জনসন সাহেব নাকি কোম্পানীর একজন বড়ো অফিসার, কাজেই তাঁর কাছে ঐ বাবু বেশ মোটা রকমের উপকার পান।... আর ঐ মুসলমানী—সতীনাথ শুনলো, এ বাড়িরই এক আর্দালীর আমদানী, তারই দূরসম্পর্কের কেউ নাকি। মতলেব মিঞা দেশে গিয়ে লোকদেখানো সাদি করে সাকিনা বিবিকে কলকাতায় এনে ডালি দিলো জনসন সাহেবের পায়ে আর পরিবর্তে পেলো মোটা বকশিস আর কোথায় যেন বড় ধরনের একটা চাকরি।

হোম থেকে এসে দাদার কাণ্ড বুঝে নিতে কিটির খুব বেশি দেরি হলো না। মেয়েমানুষের চোখ-কান একটু বেশিই খোলা থাকে এবং কিটি দেখলো জনসন প্রায় দিনই রাত্রে ফিরতে দেরি করে। ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ দুজনে একসঙ্গে খেলেও ডিনারটা একলাই খেতে হয় কিটিকে। একদিন কিটি সরাসরি প্রশ্ন করায় জনসন প্রথমটা একটু ঢোক গিলে পরে সব ব্যাপারটা খুলেই বললো। বললো, জেনী মারা যাবার পর থেকেই দেহের স্বাভাবিক দাবি তাকে এইভাবেই মেটাতে হচ্ছে! আর নেটিভগুলোই এজন্যে দায়ী! আর মুখের সামনে খাবার ধরলে—

—আই সী!—ছোট্ট সুগন্ধি রুমাল মুখে চেপে এবং হাসিও চেপে বললো কিটি। আর মনে-মনে বুঝলো কিটি, এখানে—বুঝিবা এদেশে মুখের সামনে খাবার ধরলে খাওয়াই রীতি। নইলে নেটিভরাই খাইয়ে দেয়।

কিন্তু দেখা গেলো কিটির গন্ধে তারই বহু স্বজাতি পুরুষ খাদ্যবস্তুরূপে একে-একে উপস্থিত হতে লাগলো। কিটি কখনো কৃপাদৃষ্টি দিলো, কখনো দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলো, কখনো বা একটু ছুঁয়ে দেখলো এবং কৌতুক করে আর কৌতূহলী হয়ে কোনোটা মুখে ঠেকালো শুধু। অর্থাৎ কৃপাপ্রার্থী ইংরেজ তরুণদের নিয়ে কিটি খেলতে লাগলো, তাদের খেলাতে লাগলো। যে যেমন টাকা খরচ করতে পারে, প্রেমের বুলি আওড়াতে পারে, পার্টি রেসে ঘোরাতে পারে, কিটি তার জন্যে তেমনি সময় দিতে লাগলো। একটু হাসি একটু কটাক্ষ একটু মিঠে বুলির যে এতো দাম ইণ্ডিয়ায়, কিটি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। জনসন ঠিকই লিখেছিলো। কিটি প্রেমসে প্রেমিক বদলাতে লাগলো। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে, দুদিন বাদে তার সঙ্গে —যেন ড্রেস পালটাতে লাগলো কিটি। তবে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে কোনো-কোনো ভাগ্যবান যুবককে অনুগ্রহ করতেও দ্বিধা করলো না সে।

অথচ সে ধরা দিলো না কাউকে। ভেবে দেখলো, যখন মাথার উপর কারোর তাড়না নেই, দেহের খিদে মেটাবার অজস্র উপায় আর সুযোগ, তখন তাড়াতাড়ি বাঁধা পড়াটা মূর্খতা। যদি কোনোদিন এ খেলায় অবসাদ আসে, ঘর বাঁধবার বাসনা হয়, তখন যা হয় দেখা যাবে।

জনসন বোনের কান্ড দেখলো আর হাসলো মনে-মনে। নেটিভদেরই একটা প্রবাদ আছে ঃ এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়।

এমন সময়েই কিটির সামনে এসে পড়লো সতীনাথ। অতর্কিতে। দুর্ঘটনার পঙ্ক থেকে যেনেটিভ যুবক তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিলো. কিটি তার বিশাল বক্ষ আর দুহাতের শক্ত পেশীর পেষণ তখনই অনুভব করেছিলো তার সর্বাঙ্গ দিয়ে, এখন চোখ মেলে দেখলো তার অপরূপ কান্তি। অলিভ রংয়ের লোকটা। মাথায় একঝাঁকড়া চুল। গোঁফ জোড়া প্রজাপতির মতো। গলায় কয়েকটি সরু সুতো—কিটি জানে, সেক্রেড থ্রেড। মানে ব্রাহ্মিণ, উঁচু জাতের লোক। খালি গা, কোমরে চাদর বাঁধা। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা আর পায়ে কোনো শু নেই।

তারপর একদিন বল-ডান্স ব্যাপারটা বোঝাবার নাম করে সতীনাথের শক্ত দেহে নিজের কামনা-জরজর তনুলতা চেপে ধরলো। তাতে দেহের আগুন নিভলো কই? বরং দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো। অথচ একটা নূতন ধরনের খাদ্যবস্তু তার সামনে। জনসনের মতো তারও যেন মনে হলো. মুখের সামনে খাবার থাকলে—হ্যাঁ. মুখ বন্ধ রাখা খুবই শক্ত!

সতীনাথ কিটির মনের কথা বুঝতেই পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, এমন যে অস্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে সতীনাথ হাজার ভাবলেও তার মাথায় ঢুকতো কিনা সন্দেহ। একে রাজার জাত, তার উপর মনিব-ভগ্নী এবং যাকে ঘরণী করবার জন্যে ইংরেজ তনয়রা এ বাড়িতে সদা-প্রার্থী—সেখানে সে একজন আশ্রিত, এককথায় আজ্ঞাবহ ভৃত্য, নেটিভ, কালা-আদমী, গেঁয়ো অশিক্ষিত, বিলিতী আদবকায়দায় গোমূর্খ!

অতএব নিশ্চিন্তমনেই সতীনাথ সাহেব-বাড়িতে থাকে, রান্না করে খায়, সাহেবকে বাংলা শেখায়, নিজে ইংরেজী শেখে, কিটি মেমসাহেবও মাঝেমাঝে কিছু জিগ্যেস করলে অঙ্গভঙ্গী করে তার উত্তর দেয় আর বিকেলবেলায় বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে।

একদিন চৌরাঙ্গী থেকে সতীনাথ একখানা বাংলা খবরের কাগজ কিনে

নিয়ে এলো : সমাচার-দর্পণ। কাগজখানা শ্রীরামপুর থেকে পাদরী সাহেবরা নাকি বার করেছেন। জনসন সাহেব ক্যালকাটা-গেজেট নেয় এবং তাই থেকে মাঝেমাঝে খবর শোনায় সতীনাথকে : এক ধনী ব্যাংকার নাকি তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে তিন লাখ টাকা খরচ করেছেন। কোথায় যেন ভালো কবির লড়াই হয়েছে। কিংবা গঙ্গায় ঘাট বাঁধিয়েছেন কোনো বড়লোক। আবার কেউ বা তৈরি করে দিচ্ছেন একটা বড়ো ধর্মশালা। কোন গ্রামে যেন সতীদাহ হয়েছে, স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় চিতায় উঠেছে।

কিটি শুনে বললো, ইমপসিবল!

সতীনাথ কথাটার মানে জানতো, বললো সাহেবকে, আপনি মেমসাহেবকে বুঝিয়ে বলুন, আমাদের দেশের মেয়েরা অন্য ধাতুতে গড়া!

কিন্তু একদিন সংবাদ-প্রভাকর পড়ে সাহেব-মেমকে শোনাবার সময় দেখে এক গ্রামে সতীদাহের সময় স্ত্রীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ঠেলে চিতার উপরে ওঠানো হয়!

কিটি শুনে হেসে বললো, নাও ইউ সী? দোজ পিপল আর ব্রুটস!

আর একদিন সংবাদ-প্রভাকরে কুলীন বিবাহের খবর শুনে এবং জনসনের কাছে ব্যাপারটা বুঝে মুচকি হেসে কিটি জিগ্যেস করলো সতীনাথকে : হাউ ইউ পিপল ম্যানেজ সো মেনি ওয়াইভস অ্যাট এ টাইম?

কিটির একথার মানে অল্পস্বল্প বুঝলো, তবে জনসন ভালো করে বুঝিয়ে দিলে সতীনাথ বললো, মেমসাহেব, আমাদের দেশের পুরুষরাও বিচিত্র ধাতুতে গড়া!

এবং এক বিচিত্র বাঙ্গালী পুরুষসিংহের খবর পেলো সতীনাথ খবরের কাগজের মাধ্যমেই। নাম, রামমোহন রায়। গায়ে খুব শক্তি, খানও তেমনি। একাধারে ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত ফার্সীতে বেশ বড়ো পণ্ডিত।

একদিন কাগজেই পড়লো সতীনাথ, ঐ বাবু রামমোহন রায় সতীদাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্যে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও বিবর্তকের সম্বাদ' নামে নাকি একখানা বই প্রকাশ করেছেন!

তবে? সতীনাথ পরদিন দুপুরে ভাষা পড়াবার সময় কিটিকে কাগজ দেখিয়ে বললো, এই দেখুন মেমসাহেব, এক হিন্দু বাঙ্গালী ঐ সতীদাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্যে বই লিখেচে।

শুনে কিটিও ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে বললো, দেন পাণ্ডিট, হিন্ডু উই-ডোজ উইল এগেন—আই মীন, পুনরায় বিবাহ করিবে!

—করতে পারে। আর ক্ষতিই বা কি? —সতীনাথ ঠাট্টাটা বুক পেতে নিয়েই বললো, মুসলমানীরা যদি পারে, আপনারা যদি পারেন, আমাদেরও হয়তো একদিন এ নিয়ম হতে পারে—

—আ।—জনসন হেসে বললো, আউয়ার পাণ্ডিট ইজ এ সোস্যাল রিফরমার।

সতীনাথ শুনে লজ্জা পেয়ে বললো, না সাহেব, আমি একজন দীন হীন সামান্য ব্রাহ্মণ। তবে সত্যের জয় হবেই—

—অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যাবাউট পলিগ্যামি?

জনসন বুঝিয়ে বললো, কিটি প্রশ্ন করিটেছে, বহুবিবাহে হোয়াটস ইয়োর ওপিনিয়ন—অরঠাট টোমার···টোমার মট কি?

সতীনাথ বললো, মনে হয় এই বর্বর কৌলীন্য-প্রথাও একদিন উঠে যাওয়া উচিত।

কিটি বললো হেসে, বাট ইয়োর মেন আর এনজয়িং!

সতীনাথ শুধু বললো, হয়তো!

এবং কিটি হয়তো মনে মনে বুঝেছিলো ইণ্ডিয়ার পুরুষরা এক-একটি পুরোদস্তুর নারী-মাংসখাদক। অতএব তাদের সামনে নারীদেহের লোভনীয় নৈবেদ্য তুলে ধরলেই তারা তা গপগপ করে মুখে পুরে থাকে। হ্যাঁ, থাকে। যদিও সবাই নয়। এ বিষয়ে কলকাতার বহু বাবুর রোমাঞ্চকর নারীঘটিত কাহিনী কিটির কানে ইতিমধ্যেই নানাভাবে এসে পেঁছেছে।

আর, এইরকম একটা ধারণা নিয়েই কিটি একদিন জাল ফেললো সতীনাথের সামনে।

জনসন তার আগের দিন কোম্পানি বাহাদুরের কাজে গেছলো মফস্বলে দিনকয়েকের জন্যে। কিটি সে সুযোগ ছাড়লো না।

সতীনাথ রান্না-খাওয়া সেরে শুতে যাবে, এমন সময় কিটি মেমসাহেবের খাস-চাকরানী এসে দরজায় মৃদু ধাক্কা দিলো। দরজা খুলতেই বললো, আসেন গো মশাই, মেমসাহেব ডাকচেন!

—মেমসাহেব?—চমকে উঠলো সতীনাথ: আ—আ—আমাকে? এ—এ—এখন? এই—এই রাত্রে? কেন?

—তা বাপু জানিনে। - চাকরানীর মুখে যেন মৃদু হাসি। বললো, বোধহয় মেমসাহেব ভাষা পড়তে চায়।···

—এখন ? এই রাত্রে ?—কী ভেবে নিয়ে সতীনাথ বললো, না, বলোগে মেমসাহেবকে, কাল সকালে দেখা করবো।

—সব্বোনাশ! তা কখনো হয় ?—কপালে চোখ তুলে, নিজের গালে বা হাতের তর্জনী লাগিয়ে বললো চাকরানী : তোমার সাহসও তো কম নয় ঠাকুর! মেমসাহেবের হুকুম, না মানলে তোমার আমার দুজনেরই গর্দান—সে খেয়াল আছে ?···নাও চলো ঠাকুর, আর দেরি করো না!

সতীনাথ ভয় পেয়ে নীচু গলায় জিগ্যেস করলো, তা হ্যাঁরে. মেমসাহেবের হঠাৎ এই অসময়ে তলব কেন বলতে পারিস ? কই, আমি তো বাপু কোনো দোষ করিনি ?

চাকরানী ঝটকা মেরে বললো, অতশত বাপু জানিনি। আমাকে বললো, পণ্ডিটকো বোলাও আর আমিও ছুটে তোমাকে বোলাতে এলাম।—বলেই মুচকি হেসে বললো, তা ডাকচে যখন, একবার শুনেই এসো না বাপু। বাঘ নয় তো গিলে ফেলবে! আর দোষ যখন করোনি কিছু তখন ভয়টা কিসের ?···আর এও বলি, মেয়েমানুষের কাছে যেতেও ভয়, আচ্ছা ভীতু মিনসে তো!

সতীনাথ ভাবলো সত্যিই তো! তাছাড়া এই চাকরানীর বাক্যবাণ সহ্য না করে ওর সঙ্গ নেওয়াই যাক। বললো, দাঁড়াও আসচি।

কাপড়-জামা বদলে সতীনাথ চললো চাকরানীর সঙ্গে। বিরাট বাড়িটা আধ-অন্ধকার। ঝাড়বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে-ওখানে দু'একটা মোমবাতি জ্বলছে আপনমনে। সাহেব বাড়ি না থাকায় চাকর-আর্দালীরা কোথাও আড্ডা জমিয়েছে বা বিছানায় লম্বা হবার চেষ্টায় আছে।

চাকরানী হলঘর বারান্দা পার হয়ে ভেতরের লম্বা দরদালানের শেষে নিয়ে এলো সতীনাথকে একেবারে মেমসাহেবের ঘরের সামনে।

ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই চাকরানী বাইরে থেকে দরজার পাল্লা টেনে দিলো। সতীনাথ সভয়ে দেখলো, আধ-অন্ধকায় ঘরে কিটি একটা আরাম-কেদারায় আধশোয়া হয়ে আছে। হাতে একটা কাঁচের গেলাস, বোধহয় মদই। সোনালী চুলের খোঁপাটা যেন ভাঙা তার কাঁধের 'পরে। চোখ দুটো মনে হলো ঢুলঢুলে। গোলাপী মুখখানা থমথমে। আর উপর গায়ের জামাটা এমনি খোলা যে মেমসাহেরেব সুগোল স্তনদুটির বেশ খানিকটা চোখে পড়লো সতীনাথের।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলো তার দৃষ্টি। কিটি হাসলো। পরে বললো, প্যাণ্ডিট, প্লীজ সীট ডাউন।

কিটি একটু সরে আরাম-কেদারাতেই তার পাশে বসতে বললো সতীনাথকে।

সতীনাথ পাশেই একটা চেয়ার দেখে বললো, এখানে বসচি।

—নো, মাই ডিয়ার!—কিটি জেদ করলো: টুমি এখানে বসিবে।

অগত্যা সতীনাথকে জড়সড় হয়েই বসতে হলো সোফার একপাশে। তারপর ঢোঁক গিলে জিগ্যেস করলো, আমাকে ডেকেচেন মেমসাহেব?

—ইয়েস! –কিটি বললো, আই অ্যাম ফিলিং ভেরি লোনলি। তাই কোঠা বলিটে ইচ্ছা করি।

এর উত্তর কী দেবে সতীনাথ! ভাবলো, বড়লোকদের খেয়ালই আলাদা। বিশেষ করে এই সাহেব-মেমদের। নইলে রাত্রে পুরুষমানুষ ডেকে নিয়ে গল্প করতে চায়! আর লজ্জাশরম বলেও কি মাগীর কিচ্ছু নেই! ছ্যাঃ!

— ডিয়ার. উইল ইউ হ্যাভ সাম ড্রিংক?

সর্বনাশ! মেমসাহেব তার দিকে মদের গেলাস এগিয়ে দেয় যে! তাড়াতাড়ি সতীনাথ বলে উঠলো, না মেমসাহেব, ওসব আমি খাইনে।

—অ'রাইট, বাট ইউ ডোন নো, হোয়াট ইউ আর মিসিং!···আ, বাই দ্য বাই—কিটি জিগ্যেস করলো, পাণ্ডিট, মে আই নো ইয়োর নেম?

—সতীনাথ।

—আ। স্যাটিনাট! কিটি বললো, তুমি সুটানাটি ঠাকিটেছ—সো দিস নেম?

সতীনাথ মৃদু হেসে বললো, না মেমসাহেব। ও নামের অন্য মানে আছে।

—আচ্ছা, টুমি বিবাহ করিয়াছে?—আবার প্রশ্ন।

—না।

—কেনো? হোয়াই?—কিটি গেলাসে একটা চুমুক দিলো: বহুবিবাহ করিবে না?

—না।—সতীনাথ বললো, তাছাড়া আমি গরীব মানুষ।

—আ, ডোণ্ট ওয়ারি!—কিটি বাঁ হাত তুলে অভয় দিলো: হামি টোমাকে বহুট রুপেয়া ডিবে। রাইট?

—সে আপনার দয়া।—সতীনাথ দুহাত কচলালো।

—টবে, টুমি হামার কোঠা শুনিবে। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?—কিটি

সোজা হয়ে বসলো। হাতের গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে ঢুলঢুলু নয়নে কিটি বললো, সাটি, ডু ইউ লাইক মি ?

সেকি! মেমসাহেব বলে কি? সতীনাথ মাথা নীচু করে রইলো।

—অ্যাম আই নট বিউটিফুল, সাটি?—বলেই হঠাৎ বুকের জামাটা দুহাত দিয়ে খুলে তার নিটোল নগ্ন বক্ষযুগল দেখিয়ে বললো, আর দে নট লাভলি মাই লাভ?

এবং সঙ্গেসঙ্গে সতীনাথের গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলো কিটি। কিন্তু সতীনাথ স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু বাঘিনী তার শিকার ছাড়বে কেন? সেও উঠি দাঁড়িয়ে সতীনাথের গলা আবার জড়িয়ে ধরতে গেলো: সাটি, সাটি, আই লাভ ইউ!

কিন্তু পরক্ষণেই সতীনাথের এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখে কিটি অবাক হয়ে গেলো। সতীনাথ হঠাৎ কিটির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, মেমসাহেব, দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। আমার ধর্মনষ্ট করবেন না মেমসাহেব। আমায় জাতমান মারবেন না মেমসাহেব। আমার মা আছে, আমার আত্মীয়-স্বজন আছে, আমার সমাজ···

হতভম্ব হয়ে কিটি জিগ্যেস করলো, হোয়াট ননসেন্স ইউ আর স্পীকিং? ডোণ্ট ইউ লাভ মি?

সতীনাথ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, আমাকে লোভ দেখাবেন না মেম-সাহেব। আমি পুরুষমানুষ, আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে দেবেন না। তাছাড়া সাহেব···আমাকে যেতে দিন মেমসাহেব···আমি যাই।

উঠে দাঁড়ালো সতীনাথ।

—বাট আই ওয়াণ্ট ইউ মাই হানি। – কিটি তার গায়ে প্রায় লেপটে যেতে চায়।

সতীনাথ দেখলো, ব্যাপার বেশ ঘোরালো। ছাড়া পাওয়া দুষ্কর। তখন তাড়াতাড়ি বুদ্ধি খেলিয়ে বললো, আচ্ছা মেমসাহেব, এই রাতটা আমাকে ভাবতে দিন, আমার বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করচে। আমি বরং কাল সকালে আপনার ওই চাকরানীকে দিয়ে খবর দেবো।

বলেই আর দাঁড়ালো না সেখানে সতীনাথ। টান মেরে ভেজানো দরজা খুলতেই মনে হলো কে যেন সরে গেলো পাশ থেকে। ঐ চাকরানীটা বোধহয়। যাকগে। হারামজাদী!

সতীনাথ ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে দরদালান হলঘর বারান্দা পার হয়ে ঢুকলো গিয়ে নিজের ঘরে এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়াম করে দিলো ঘরের খিল।

সেরাত্রে সতীনাথ দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না। তার চোখের উপর ভাসতে লাগলো কিটির অর্ধনগ্ন দেহবল্লরী, তার সুপুষ্ট স্তনযুগল, তার ঢুলুঢুলু চোখদুটি, তার রসালো রাঙা ঠোঁট। আর সেই সঙ্গে জনসন সাহেবের চেহারা, পিস্তল, চাবুক,—বাড়িসুদ্ধ চাকর আর্দালী মালী সহিস কোচোয়ান। আর ভেসে উঠলো তার বিধবা মায়ের করুণ মুখখানা, গ্রামের সেই চণ্ডীমণ্ডপ, আর সেখানকার সমাজের বড়োবড়ো মাথাগুলো।···

কিন্তু কে দেখতে যাচ্ছে তার কীর্তি! সতীনাথ ভাবলো : কে জানতে পারবে তার অধঃপতনের কথা?···কি, পারবে না? পারবে।—সতীনাথের খেয়াল হলো : মাথার উপরে একজন আছেন না? সবজান্তা ভগবান! তাঁর চোখ কে বন্ধ করবে? আর তার স্বর্গত বাবা? ছেলের পাপে তাকেও তো নরকগামী হতে হবে শুধু তাকে কেন, তার চোদ্দপুরুষকে! উঃ! এতো পাপ বইবার শক্তি কোথায় তার? না, না—

না। এখানে আর থাকা নয়।—সতীনাথ অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। আর এখানে নয়। এ পাপপুরীতে আর নয়। এখানে থাকলেই মন কলুষিত হবে। হয়তো বা···ঘি আর আগুন তো।···ঋষিরা ঠিকই বলেছেন। উঃ! খুব বেঁচে গেছি। আর নয়।

ভোর না হতেই সতীনাথ বন্ধ গেটের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললো, গেট খুলে দাও, গঙ্গাস্নানে যাবো। এবং গামছা জড়িয়ে যেটুকু নেওয়া চলে তাই সম্বল করে এবং ট্যাঁকে জমানো টাকা কটা নিয়ে সতীনাথ জনসন সাহেবের আশ্রয় ত্যাগ করলো।

আর রাস্তায় পা দিতেই হঠাৎ কেন যেন মনে হলো সতীশ সরকারের কথা : পুরুষস্য ভাগ্যং। আর সেই সঙ্গে সতীনাথ ম্লান হেসে মনেমনে বললো : এবং স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম!—দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।

সতীনাথ গঙ্গার দিকেই চললো।

গঙ্গাস্নান করা দরকার। দেহ-মন পবিত্র করতে হবে। সাহেব-মেমদের গোমাংস শুয়োরের মাংস কিছুই বাদ যায় না। অথচ হুট করে একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লো মাগীটা। আর গায়েও কেমন যেন একটা বোটকা গন্ধ। কী সব খায় যে! না, স্নানটা করে ফেলাই দরকার।

ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। সম্প্রতি বুজিয়ে দেওয়া ডিঙ্গাডাঙ্গা খাল (এখন ক্রীক রো) পার হলো সে। পথে শুধু গর্ত আর ধুলো। এক জায়গায় দেখলো কয়েকটা ঘর পুড়ে গেছে! বোধহয় হোগলা-পাতার ছিলো। তাই সতীনাথ কাগজে দেখেছে পুলিশের ফার্স্টক্লার্ক জানিয়েছে, আর হোগলা পাতার ঘর করতে দেওয়া হবে না। লটারী করে টাকা তুলে শহরটার উন্নতি করা হচ্ছে নাকি। তবে এখনো অনেক কিছুই করা দরকার। বহু দূরে দূরে রাস্তার মোড়ে কেরোসিনের আলো জ্বলছে বটে, তবে কোনো কাজের নয়। তাছাড়া পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও আছে। অবশ্য থাকবার মধ্যে তো ট্যাঁকে কয়েকটা টাকা। তবু সাবধানে এদিক-ওদিক নজর রেখেই চললো সতীনাথ। পথে কোনো লোক নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। সতীনাথের কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। শেষে নিজের মনেই গুনগুন করে গাইতে লাগলো—জয় রাধে, রাধে, গোবিন্দ জয়।

—কে বাওয়া রাধে?—কোনো মানুষের গলা।

সতীনাথ থমকে থেমে গেলো। দেখে, একটা আলোর পোস্টের তলায় একজন মানুষ শুয়ে। কাছে গিয়ে দেখে কাঁচা নর্দমার পাশে কাদামাখা হয়ে পড়ে আছে।

—বাওয়া রাধে, এই গোবিন্দকে একবার ওঠাও তো? কুঞ্জে নিয়ে চলো।—লোকটার কথা জড়ানো।

সতীনাথ বুঝলো, লোকটা মাতাল। মদ খেয়ে নর্দমায় পড়ে গেছলো বোধহয়। তারপর সারারাত এইখানেই পড়ে আছে।

সতীনাথ আরো কাছে গিয়ে তাকে হাত ধরে ওঠাতে গিয়ে ম্লান আলোতে দেখে—সেই ফুলবাবু। অনেকদিন আগে গানুবাবুর বাড়ির সামনে দেখা হয়েছিলো।

—আপনি?

—হ্যাঁ বাওয়া আমি। সৎ ব্রাহ্মণ। কাজেই বুইলে, ছুঁলে জাত যাবে না। আর নাম হচ্ছে—মা-নি-ক-চ-ন্দ-র-মু-খু-জ্জে।

হঠাৎ একটা পরিচিত নাম সতীনাথের মনে পড়ে গেলো। সতীনাথ কাছে বসে নীচু হয়ে জিগ্যেস করলো, আপনি কি বল্লভপুর গাঁয়ের লোহারাম বাঁড়ুজ্জের ছোট জামাই?

মানিকচন্দ্র সতীনাথের কাঁধে ভর দিয়ে বললো, জামাই? তা হতে পারি।

তবে ছোট নই। বুইলে? বরং কোনো ছোটলোকের মেয়ের গলায় হয়তো মালা পরিয়েচি কোনোদিন! মানে, কুলীন তো!

সতীনাথ আবার প্রশ্ন করলো, আপনি কি···

—যা মাইরি! এখন রাতদুপুরে আপনি কি, আপনি কি, করতে হবে না মাইরি! বরং একটু এগিয়ে দাও না মাইরি বাড়ি পর্যন্ত। তোমার দুগালে চুমু খাবো তাহলে—

সতীনাথ হেসে বললো, থাক, আর অত কষ্ট করতে হবে না।

মনে-মনে হাসলো সে। কাল রাত্রে মেমসাহেবও তাকে আর একটু হলে চুম্বন করেই বসতো। আর এই মশায়েরও সেই একই ইচ্ছে। বলতে হবে, ভাগ্যবান সে।

—আসুন আমার কাঁধে ভর দিয়ে।—সতীনাথ বললো, হুঃ! কেনই বা এসব খাওয়া আর এইভাবে পড়ে থাকা!

মানিকচন্দ্র সতীনাথের গলা জড়িয়ে, মাথাটাকে ঝুলিয়ে, তার কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনেটেনে কোনোরকমে চলছিলো। সতীনাথের কথা শুনে বললো, কে বললে আমি মদ খাই?—বলেই ভাঙা গলায় গান ধরলো: সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে!···মাইরি বলচি, আমি তো এতক্ষণ কমলমণির কুঞ্জেই ছিলাম। পরে সে বললে, ভাই বাড়ি যাও। আমিও বললাম, ভাই বাড়ি যাই। আর বাড়ি যেতে গিয়েই তো—

সতীনাথ কিন্তু চলতে চলতে নিজের মনেই ভাবছিলো, এ এক মজার শহর। এখানে যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এখানে কেউ কারোর নয়। এখানে কেউ না খেয়ে মরে, কেউ টাকার উপর গড়ায়। এখানে এর মতো কেউ নর্দমায় গড়াগড়ি খায়, আবার কেউ এই মাটি ধরেই উঠে দাঁড়ায়, বড়ো হয়। এখানে আশ্রয় কেউ দেয় না, আশ্রয় করে নিতে হয়। এখানে কেউ ডেকে কথা বলে না, হাঁকডাক করতে পারলে তবেই লোকে চেনে। এখানে বিদ্যা আর বিদ্যাধরী পাশাপাশি, মদ আর মঠ কাছাকাছি—যে যেমনটি চায়। অদ্ভুত এই শহর।

—এবার এদিকে মাইরি।—মানিকচন্দ্র নেশার ঘোরেও বাড়ির পথ দেখালো ঠিকই।

এবং বাড়ির দরজার সামনে আসতেই মানিকচন্দ্র কোনোরকমে দরজার চৌকাঠ ধরে নীচু হয়ে পশ্চাৎদেশ বার করে দাঁড়ালো। পরে সতীনাথকে বললো, এই আমার ডেরা, বুইলে? এবার আমার পাছায় কসে মারো।

এক লাথি—! আর আমি মাইরি এক ধাক্কায় বাড়ি ঘুসে গিয়ে ধপ করে ঠিক বিছানায় গিয়ে পড়বো।…নাও লাগাও…

উত্তরে সতীনাথ বললো, আচ্ছা, আমি আসি।

—সে কি? দিলে না মাইরি?—নিজের পশ্চাদ্দেশ উঁচু করে রেখেই মানিকচন্দ্র বললো, শেষ উপকারটুকু করলে না ব্রাদার? তবে দুশ— শা—লা—

সতীনাথ ততক্ষণে সেখান থেকে সরে গেছে।

পুবের আকাশ ততক্ষণে ফরসা হয়ে গেছে। রাস্তায় অল্প অল্প লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সতীনাথ গঙ্গার ঘাটের দিকে এগুতে লাগলো। নর্দমার পাঁক সমেত মাতালটার উপকার করতে গিয়ে সর্বাঙ্গ তার নোংরায় মাখামাখি। স্নান করারই দরকার। এবং গঙ্গাস্নান।

গঙ্গার ঘাটে এসে সতীনাথ দেখলো স্নানার্থীদের ভিড় মন্দ হয়নি। কোনো বড়লোক বাবুর বাড়ির পালকি এসেছে চার বেহারা কাঁধে করে পুরমহিলাকে গঙ্গাস্নান করাতে। সঙ্গে এসেছে দুজন ঝি। সতীনাথ দেখলো বেহারারা সোয়ারী সমেত পালকিই ডোবালো গঙ্গায় বারকতক। পর্দানশীন বটে! নৌকার মাঝিরাও ওদিকে হাঁকতে শুরু করেছে: ছিরামপুর চন্নননগর হুগলী তিবেণী—

ত্রিবেণী। ওখানে নামলেই আর কয়েক ক্রোশ হাঁটলেই তার গ্রাম। তার মা সেখানে। অনেকদিন খবর পায়নি সে। কেমন আছে কে জানে?

সতীনাথ মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে জলে নামলো।

আবার ডাক: বাবু আসুন, ছিরামপুর চন্নননগর হুগলী তিবেণী—

ত্রিবেণীর নামটা যেই কানে আসছে, সতীনাথ কেমন যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে। স্নান করছে, কিন্তু ভাবছে, যাবে নাকি একবার দেশে? ঘুরে আসবে? অনেকদিন যায়নি। মাকেও দেখেনি অনেকদিন। একবার ঘুরে এলে হয়। ঘুরে এসে না হয় ইংরেজ বাহাদুরের কাছে একটা চাকরি যোগাড় করে নেবে। বিশেষ করে চাকরি করবার মতো ইংরেজী বিদ্যে সে যখন জনসন সাহেবের কাছে শিখেছে।

আর শিখেছে এবং জেনেছে অনেক কিছুই।

ডুব দিয়ে স্নান করলো সতীনাথ। অনেকবার ডুব দিলো।

আঃ! এতক্ষণে দেহটা পবিত্র মনে হলো যেন। কিন্তু মনটা? কই? যুবক সতীনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কিটি মেমসাহেবের মুখ।

আর হ্যাঁ, বুকও। নিটোল সুগোল শুভ্র···ধ্যেৎ! মনের এ কালি সে গঙ্গার জলেও ধুতে পারছে না কেন?

আবার ডুব।

উঠতেই কানে এলো: ত্রিবেণী—

হ্যাঁ ত্রিবেণী। এখন এখানে থাকলেই ঐ পাপ বাসনা অহরহ—

সতীনাথ তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই কাছেই নৌকোর ঘাটে এলো: দাঁড়াও গো মাঝি, আমি যাবো ত্রিবেণী!

—আসেন বাবু!

সতীনাথ ভিজে কাপড়েই ঘাটের কিনারায় রাখা ছোট পুঁটলিটা নিয়ে নৌকোর পাটাতনে গিয়ে বসলো।

২৩

তার পরের দিন স্বর্ণমঞ্জরী বেঁকে বসলো।

রাত্রে কিছুতেই গেলো না লোহারামের ঘরে শুতে। বিরাজমণি কতো বোঝালেন: ওরকম করতে নেই, যেতে হয় বরের ঘরে।

কিন্তু স্বর্ণমঞ্জরীর এক কথা: না, আমি যাবো না ঐ বুড়োর ঘরে। ও বুড়ো আমার বর না হাতি!

—ছিঃ, ওরকম বলতে নেই।—বিরাজমণি বোঝালেন: ওতে লোক খারাপ বলবে।

—বলুকগে।—স্বর্ণ জোরগলায় বললো, হ্যাঁ, আমি খারাপ, আমি খারাপ, জগতের লোক ভালো, আমি খারাপ। হলো তো?

কাছাকাছি ইন্দু বা বিন্দু না থাকায় বিরাজমণি জিগ্যেস করলেন, কেন? যাবিনে কেন?

—এমনি।

—তোকে তো আর মারেনি!

—না।

—তোকে বরং আদর করেছিলো বল?—বিরাজমণি বললেন।

—আদর না ছাই!—স্বর্ণ বিরাজমণির বুকে মুখ লুকোলো।

—তবে?—আবার প্রশ্ন। কৌতুহল।

তেমনি মুখ গুঁজেই স্বর্ণ বললো, এমন চেপে ধরে ফোকলা দাঁতে আমাকে চুমু খেলো যে আমার নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আর কী সব ··না, সে আমি বলতে পারবো না।—বলেই স্বর্ণ আরো চেপে ধরলো মুখ বিরাজমণির বুকে : তুমি আমাকে যেতে বোলো না। তোমার পায়ে পড়ি।

শুনেই বিরাজমণির বুকটার মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মুখে বললেন, তুই তো মুশকিল করলি ছুঁড়ি! শখ করে তোকে নিয়ে এলো, অথচ তার ঘরে যাবিনে, এ কেমন কথা?

—না, না। আমাকে মেরে ফেলো বরং! গলা টিপে মেরে ফেলো! —স্বর্ণ নিজের গলাটা এগিয়ে দিয়ে বিরাজমণির হাত টানতে লাগলো।

—আঃ, কী পাগলামো করচিস!—বিরাজমণি ধমক দিলেন।

—বেশ, তবে আমি আত্মহত্যা করবো। জলে ঝাঁপ দেবো, কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরবো। না হয়, মা-র মতো গলায় দড়ি দেবো।—স্বর্ণ আত্মহত্যার সব পন্থাই বললো।

শুনে বিরাজমণি হেসে বললেন, খুব হয়েচে। এতো আর কষ্ট করতে হবে না। দেখি, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলবো'খন। তা তুই শুবি কোথায়?

—কেন, ইন্দুদি বা বিন্দুদির কাছে।—স্বর্ণ সমস্যার সমাধান করে দিলো।

বিরাজমণি আবার হাসলেন : ওরা বুঝি তোর দিদি হয়? আচ্ছা পাগলী তো! ওরা যে তোর সম্পর্কে মেয়ে!

স্বর্ণ উত্তরে বললো, আহা-হা, আমাকে আর ঠকাতে হবে না। মেয়ে আবার মা-র চাইতে বয়সে বড়ো হয় নাকি।

—হয় রে হয়, সব হয়।—বিরাজমণি গম্ভীর হয়েই বললেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা তুই না হয় ওদের মাসী বলেই ডাকিস।

শুনেই স্বর্ণ বললো, হ্যাঁ দিদিমা, আমি আজ রাত্রে তবে ইন্দু মাসী বিন্দু মাসীর কাছেই শোবো তো?

— তাই শুস পোড়ারমুখী। যখন বরের কাছে শুবিনে বলে পণ করেছিস, তখন আর কি বলবো বল?—পরে স্বর্ণর গাল টিপে দিয়ে বললেন, বর যে কি জিনিস পরে বুঝবি হতভাগী!

—আমার দরকার নেই বুঝে। তুমি বোঝোগে!—বলেই স্বর্ণ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বিরাজমনি হাসলেন।

ইন্দু আর বিন্দু তখন ঘরের রেড়ির তেলের প্রদীপের সলতে কমিয়ে দিয়ে আধ-অন্ধকার ঘরে কী যেন গোপন কথায় ব্যস্ত ছিলো।

এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকলো স্বর্ণ: জানো আজ আমি তোমাদের কাছে—মানে, তোমাদের দুজনের মাঝখানে শোবো। কেমন মজা!

বিন্দু বললো. কেন, বাবার কাছে শোবে না?

—না। স্বর্ণ তাদের ঘাড়ের উপর এসে বসলো: দিদিমা বলেচে ঐ বুড়োটার কাছে আমাকে শুতে হবে না। কোনোদিনও না—

সেকি?—ইন্দু অবাক হয়ে গালে হাত দিলো।

বিন্দু জিগ্যেস করলো, তা [illegible] হলো। কিন্তু সতীনকে দিদিমা বলতে কে বললো?

—কে আবার বলবে?—স্বর্ণ জবাব দিলো: আর জানো তোমরা আমার কে?

—কে?—বিন্দু হেসে জিগ্যেস করলো।

—তোমরা আমার মাসী গো।—স্বর্ণ বললো, তুমি হলে বিন্দু মাসী, আর তুমি হলে ইন্দু মাসী। বুঝলে?

—এও কি নিজের তৈরি?—বিন্দু হাসলো।

—না।—বেশ ভরাট গলায় স্বর্ণ বললো, দিদিমা বলে দিয়েচে।

ইন্দু কিন্তু সে কথায় জবাব না দিয়ে বললো, তুমি বরং মার কাছে শুয়ো।

—বারে!—স্বর্ণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, দিদিমা তো ঐ বুড়োর কাছে শুতে যাবে। আমি বলে এতো করে—

বিন্দু ইন্দুর দিকে চোখ ইশারা করে স্বর্ণকে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা তুমি—তোমাকেই বা কী বলে ডাকবো আমরা—এতটুকু মেয়ে—আচ্ছা, ছোট ঠাকরুণ বলে ডাকা যাবে'খন—

—তা বেশ। ছোট ঠাকরুণ!—স্বর্ণ হাততালি দিলো আনন্দে: আমি ছোট ঠাকরুণ।···তা তোমাদের কাছে শোবো তো? তোমাদের মাঝখানে শোবো কিন্তু। নইলে আমার ভয় করে।

—বেশ তাই হবে গো ছোট ঠাকরুণ।—বিন্দু হাসলো।

সে রাত্রে স্বর্ণ ইন্দু আর বিন্দুর মাঝখানেই শুলো এবং খানিকক্ষণ পরে দেখা গেলো ইন্দু অতি সাবধানে বিছানায় উঠে বসলো। একবার ভালো করে

লক্ষ্য করে দেখলো স্বর্ণর দিকে। হ্যাঁ, অকাতরে ঘুমুচ্ছে সে। কাজেই উঠে দাঁড়ালো ইন্দু।

ঘরের প্রদীপ খুব কম করাই ছিলো। ইন্দু একবার বিন্দুর দিকে চাইলো। বিন্দু জেগেই ছিলো। ইন্দুকে উঠতে দেখে সে হাত ইশারায় বললো তাকে বাইরে যেতে। ইন্দু গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে ঘোমটা দিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

দাওয়া থেকে নেমে উঠোনের বাতাবি লেবুর গাছটার তলা দিয়ে ওকোণের শিউলিগাছের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে উঠলো ইন্দু বার-বাড়ির একটা ঘরে। ঘরের দরজা ভেজানোই ছিলো। ইন্দু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল এঁটে দিলো।

—এসো, এসো চাঁদবদনি।—চাপা গলায় বললো গোপীচরণ।

গোপীচরণ, লোহারামের সরকার। তাঁর জমিজমা দেখাশোনা করে, হিসেবপত্র রাখে। বেশ কয়েকঘর প্রজা আছে. দাখিলা বই বগলে করে তাদের খাজনা আদায় করতে যায়. তাছাড়া সদরে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারেও নথিপত্র নিয়ে তাকে ছুটতে হয়।

গোপীচরণ জাতে কৈবর্ত। তবে চেহারাটা বেশ ভালো। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, একজোড়া ঘন গোঁফ—বেশ একটা পুরুষালী ভাব। বয়সে চল্লিশের উপর হলেও চেহারা দেখে বোঝা যায় না সহজে। তবে চাঁদেরও যদি কলংক থাকতে পারে, তবে গোপীচরণেরও খুঁত দোষণীয় নয়। গোপীচরণের বাঁ হাতটা কনুই পর্যন্ত কাটা। তার কারণ নাকি, বর্ধমান জেলায় গোপীচরণের দেশের বাড়ীতে একবার ডাকাত পড়েছিলো। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ শব্দ শুনে পাড়ার কেউই বাড়ি থেকে বার হয়নি, তবে গোপীচরণ আর তার ছোট ভাই লাঠি আর কাটারি নিয়ে যথাসাধ্য তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি। ডাকাতরা তার বুড়ী মাকে তো পিটিয়েই শেষ করলো, ছোট ভাইটিকেও চোখের সামনে এককোপে কাটলো এবং গোপীচরণকেও কোপ বসাতে গিয়ে সে কোপ গিয়ে পড়লো তার বাঁ হাতে। গোপীচরণ 'বাপরে' বলে ডান হাতের লাঠিটা দিলো ফেলে। এমনসময় গোপীচরণের বৌটাকে তারা দেখতে পেয়ে সেদিকেই ছুটে গেলো, আর গোপীচরণ চামড়ার সঙ্গে ঝুলতে-থাকা বাঁ হাতখানাকে তার ডান হাতে চেপে ধরে অন্ধকারে ছুটে কাছেই বিচুলির গাদায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। এ সবই ঘটলো ভাগ-চাষের ধান বিক্রীর কয়েকশো মাত্র টাকা আর বউয়ের ক'টা গয়নার জন্যে।

পরে গাঁয়ের লোকদের সেবাযত্নে গোপীচরণ দেড়খানা হাত নিয়ে উঠে দাঁড়ালো বটে, তবে বৌটার আর খোঁজ পাওয়া গেলো না এবং একদিন সেও গাঁ থেকে হলো নিখোঁজ।

তারপর এখানে-ওখানে ঘুরতে ঘুরতে গোপীচরণ বল্লভপুরে লোহারাম বাঁড়ুজ্জের বাড়িতেই পেলো আশ্রয়।

গোপীচরণের সব সময়েই মনে হতো, সে অঙ্গহীন। আর পাঁচটা মানুষের চাইতে সে খানিকটা নীচু। সব সময়েই গায়ে একটা মোটা ধরনের চাদর দিয়ে কাটা হাতটাকে ঢেকে রাখলেও মনের হাহাকারকে কোনদিনই সে ঢাকা দিতে পারেনি। আর বৌটা? কোথায় গেলো সে? কী হলো ভাবতেও সে শিউরে ওঠে। নাঃ, তারা তাকে মেরে ফেলেছে। হাতের দুগাছি রুলি খুলে নিয়ে তাকে মেরে ফেলে কোনো ডোবায় পুঁতে ফেলেছে হয়তো। ঐরকম একটা ভেবে নিয়ে মনটায় সান্ত্বনা দেয় গোপীচরণ।

আর সব সময় কাজে ডুবে থাকে। তবু অন্যমনস্ক থাকা যায়। তাছাড়া কেউ বলতে পারেনি, গোপীচরণ কোনো মেয়েছেলের দিকে কুদৃষ্টি দিয়েছে। বরং দেখা গেছে, মেয়েদের দেখে সে-ই তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে।

এমন হয়েছে, লোহারাম ইশারায় বলেছেন, অমুক জায়গা থেকে আমাকে যেতে বলেচে, কিছু টাকাও দিয়ে গেচে, কবে নাকি সেখানে কুলরক্ষে করে এসেচি। তা আমার আজ এক জায়গায় যাবার কথা, তাছাড়া শরীরটেও ভালো নেই। তা তোমাকে কিছু টাকা দিই—তুমি একটু আমার হয়ে দেখা দিয়ে—

শুনেই গোপীচরণ জিব কেটে বলেছে, বাবু, এ হুকুমটা করবেন না। একে তো পাপের শাস্তি ভোগ করচি, আর বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপাতে চাইনে।

সেই গোপীচরণ।

সেই গোপীচরণ পরস্ত্রীর প্রেমে মজলো। মজালো ইন্দুই।

একদিন দুপুরে কেউ কাছাকাছি নেই, রান্নাঘরের দাওয়ায় গোপীচরণের ভাত দিতে এসে পাতায় বেশ খানিকটা ভাত দিলো ঢেলে।

—একি! এতো ভাত কেন?—গোপীচরণ হাঁ হাঁ করে উঠলো।

—কেন আবার!—ইন্দু বললো, এতো বড় জোয়ান মানুষটা, এই ক'টা ভাত খেতেই যতো ভয়!—বলেই মুচকে হেসে রান্নাঘরে ঢুকে গেলো।

দেখে গোপীচরণ তো থ! ইন্দু হঠাৎ হাসলো কেন? নাকি, ভুল দেখলো সে।

তারপর দেখা গেলো, দু'চারখানা মাছও যেন বেশি পড়ছে তার পাতায়।

শেষে একদিন ভাতের মধ্যে ঢাকা একটা মাছের মুড়ো।

ভাত ভাঙতে গিয়েই গোপীচরণ অবাক হয়ে গেলো, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো: এ কী!

রান্নাঘরে আধভেজানো দরজার আড়াল থেকে মুখ বার করে ইন্দু বললো মৃদু হেসে: লুকোচুরি খেলা!

শুনে হেসে ফেললো গোপীচরণ। পরে এদিক-ওদিক চেয়ে এবং আড়চোখে বারেবারে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে ইন্দুর দেওয়া মাছের মুড়ো চুষতে আর চিবোতে লাগলো।

সেই থেকে গোপীচরণ গেলো বদলে।

তার মনে হলো, অঙ্গহীন হলেও সে পুরুষ। সুপুরুষ। মেয়েদের মন কেড়ে নেবার মতো ক্ষমতা তাহলে আছে তার। সুপ্ত সিংহ যেন জেগে উঠলো তার দেহ-মনের বনে-জঙ্গলে।

তাবলে গোপীচরণ কি উচিত-অনুচিতের কথা ভাবেনি? ভেবেছে। ভেবেছে, তার বোধহয় সামলে চলাই উচিত। যার আশ্রয়ে আছি, তার ক্ষতি করাটা ঠিক নয়। তাছাড়া সে মনিব-কন্যা, তার সব কিছুই মানায়। রাজার নন্দিনী প্যারি, যা করে তা শোভা পায়। কিন্তু সে? তাদের আশ্রয়প্রার্থী, কৃপাপ্রার্থী r আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু প্রতিরাত্রের নির্জন অন্ধকারে গোপীচরণের মনের শয়তানটা এসে তার বিবেকের গলা টিপে ধরতে লাগলো। কেবলই বোঝাতে লাগলো, তুমি না পুরুষ! একটি নারী উন্মুখ হয়ে রয়েছে তোমাকে দেহ-মন সমর্পণ করবার জন্যে আর তুমি ঐ মূর্খ বিবেকের ভয়ে পালিয়ে যাবে? কী? আশ্রয়দাতার কন্যা? তাতে হয়েছে কি? তুমি তো নিজে তার কোনো ক্ষতি করতে যাওনি। সেই বরং নিজে থেকেই···না, না, অযথা ভেবো না। পরে যদি জানাজানি হয়, মেয়েটার পেটে যদি······? ওরে মূর্খ, তোমার একখানা হাত কাটা বটে, পা দুখানা তো ঠিকই আছে—হাঁটা দিতে কতক্ষণ! আর তুমি কৈবর্তের ছেলে, আর ও বামুনের মেয়ে? আরে, রাখো তোমার জাত-ধর্ম! আর ঐ মেয়েরই বা দোষ কি? বর পোড়ারমুখো রোজ রাত্রে এখানে-ওখানে ফুলশয্যা করে বেড়াচ্ছে, আর মেয়েটার বুঝি

যৌবন-জ্বালা বলে কিছু নেই ? তুমি কিচ্ছু ভেবো না, দুগ্গা বলে ঝুলে পড়ো ।

শেষে আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে গোপীচরণ একদিন খাবার সময় ইন্দুকে একলা পেয়ে অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলে ফেললো, আজ রাত্রে ঘরের দরজা খোলা রেখেই শোবো, যা গরম !

ইন্দু শুনে হাসলো নিজের মনে । আর সেই রাত্রেই হলো ইন্দুর প্রথম অভিসার !

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ইন্দু ধরা পড়ে গেলো বিন্দুর কাছে । মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই বিন্দু দেখে পাশে দিদি নেই । দরজাটাও ভেজানো, খিল খোলা । সন্দেহ হতেই মটকা মেরে পড়ে থাকলো সে, আর বেশ কিছুক্ষণ পরে চোরের মতো নিঃশব্দে ইন্দু ঢুকতেই বিন্দু তার হাত চেপে ধরলো ঃ এ সব কী ব্যাপার ?

হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে ইন্দু থতমত খেয়ে গেলো । বুঝলো, লুকিয়ে কোনো লাভ নেই ।

অগত্যা ব্যাপারটা সবই খুলে বলতে হলো ইন্দুকে, আর শেষপর্যন্ত কেঁদে ফেললো সে বিন্দুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, কী করবো বল, কিছুতেই আর সামলাতে পারলাম না রে !

কিন্তু বিন্দু নিজেকে এ পর্যন্ত সামলে এসেছে ।

কতজন তাকে লোভ দেখিয়েছে । ঝি-নাপিতনীকে দিয়ে মনের কথা বলে পাঠিয়েছে । তাতে ঝিয়েরই কাজ গেছে ওবাড়ি থেকে । নাপিতনীকে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে গেছে বিন্দু ।

গ্রাম-সম্পর্কে প্রৌঢ় যোগীনদাদু প্রায় আসতেন লোহারামের বাড়ি । একটু-আধটু কবিরাজী আর টোটকাও চিকিৎসা করতেন বলে এ বাড়ির অন্দরমহলেও ছিলো তাঁর অবাধ যাতায়াত । সেই সুযোগে বিন্দুকে নির্জনে পেলেই যোগীনদাদু রসিকতা করতেন, কী গো ছোটগিন্নী, পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করেই ফেলো না । ভয় নেই, ওষুধ আমার কাছেই আছে !···বিন্দু হেসে বলেছে, বিন্দি-বামনী এতো কাঁচা মেয়ে নয় । আজ বাদে যে খড়ির তলায় যাবে, তার সঙ্গে আবার পাকাপাকি কি করবো ? আর ওষুধ খাওয়াতে হয়, দিদিমাকে খাইয়ো, কাজে লাগবে । মাগীকে আঁতুড়ঘর থেকে তো বেরুতে দাও না !···শুনে যোগীনদাদু বুঝেছিলেন, এ বড়ো শক্ত

ঠাঁই, এখানে পাত পাতা চলবে না। তাই পরে আর কখনো অমন রসিকতা করতে যাননি।

এসেছিলো পুকুরধারে ওপাড়ার অবনী দত্তের মেজ ভাই মাছধরার ছুতো করে। আর বিন্দু গেছলো বিকেলে পুকুরে গা ধুতে। গা ধুয়ে এক কলসী জল কাঁকে নিয়ে সাবধানে কাঁচা ঘাটটায় পা টিপে-টিপে উঠছিলো, এমন সময় দেখে পাশের ঝোপের আড়ালে বসে ছিপ হাতে নিয়ে তার দিকে চেয়ে অবনী দত্তের ভাই হাসছে। দেখে অঙ্গ জ্বলে গেলো তার। বললো, বলি এই মিনসে, মেয়েমানুষের ঘাটের ধারে বসে কেন?

লোকটা তেমনি দাঁত বার করে হেসে বললো, বস্তর হরণ করবো বলে।

—বটে!—বিন্দু জ্বলে উঠলো: বাড়িতে মা-বোনের বস্তর হরণ করা হয়ে গেচে বুঝি? এখন এখেনে মরতে এয়েচো!—বলেই বিন্দু কাঁক থেকে ভরা কলসী নামিয়ে রেখে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে তেড়ে গেলো: তবে আয় মিনসে, দেখি কে কার বস্তর হরণ করতে পারে!

এমনটা যে হবে ভাবেনি লোকটা, বিশেষ করে একটা সামান্য মেয়ের এমন তেজ দেখে লোকটা ভড়কে গেলো। বেগতিক বুঝে লোকটা ছিপটা ফেলেই দে ছুট!

বিন্দুর চেঁচামেচি শুনে তৎক্ষণে পুকুরধারে বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এলো। তারাও ওসব শুনে কম অবাক হলো না বিন্দুর মনের সাহস দেখে।

তাছাড়া লোহারাম যখন বাড়ি ছিলেন না, তখন হঠাৎ রাতদুপুরে কয়েকদিন বিন্দুদের টিনের চালে ঢিল পড়তে লাগলো। ইন্দু তো ভয়েই কাঁটা। বোধহয় ভূত। বিরাজমণি লোহারামের ঘরেই শুয়েছিলেন, ঘরের সোনাদানা টাকাকড়ি আগলাবার জন্যেই। গোপীচরণ থাকে উঠোনের ঐ কোণের ঘরে, চাকর দুজন বার-বাড়িতে। কাজেই ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে ডাকবার সাহস হলো না দু'বোনেরই। তবে বিন্দু বুঝলো, ওসব ভূতটুত নয়। কোনো বদমায়েসের কাণ্ড। তাই দিদিকে সাহস দিয়ে বললো, তুই ভয় পাসনে। আমি তো রয়েচি।...এবং ভাগ্যি ভালো, কিছুক্ষণ বাদেই সে রাত্রে ঢিল পড়া বন্ধ হলো।

কিন্তু পরদিন রাত্রে বিন্দু বাড়ির পদ্মঝিকে বাড়ি যেতে না দিয়ে নিজেদের ঘরে শোওয়ালো আর মাথার কাছে রাখলো ধারালো একখানা রামদা।

বিরাজমণি বললেন, তোরা বরং আমার এই ঘরে শো। কিন্তু বিন্দু রাজি হলো না : দাঁড়াও না, বদমাইসটাকে ঢিট করতে হবে তো!

সে রাত্রেও আবার শুরু হলো চালে ঢিল পড়া। তিনজনেই জেগে ছিলো, বিন্দু হাতে রামদাখানা শক্ত করে ধরে ইন্দু আর পদ্মঝিকে উঠিয়ে আস্তে করে দরজা খুলে যেই চিৎকার করেছে, কে রে হারামজাদা, মুখপোড়া—দেখে কুয়োতলার ধার থেকে দুটো ছায়া যেন হঠাৎ সরে গেলো। বিন্দু সেই ছায়া লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো রামদাখানা আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের কানে এলো একটি আর্তনাদ—উ-উঃ।

বিন্দু চিৎকার করে উঠলো : ঠিক হয়েচে, বদমাইস, হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া, হতচ্ছাড়া ইত্যাদি। আর সাহস পেয়ে ইন্দু আর পদ্মঝি তখন চেঁচাতে লাগলো : ধর হারামজাদাকে, মার হারামজাদাকে!

তাদের চিৎকার শুনে গোপীচরণ বেরিয়ে এলো, বার-বাড়ি থেকে চাকর দুজন,—এবং লোকজনের গলা পেয়ে বিরাজমণিও এলেন বাইরে। তারপর মশাল একটা জ্বালিয়ে কুয়োতলায় খোঁজাখুঁজি করে কাউকে পাওয়া গেলো না বটে, তবে পাওয়া গেলো রামদাখানা আর তার ডগায় লেগে খানিকটা ··হ্যাঁ রক্তই। সবাই বুঝলো ব্যাপারটা, কারণ ভূতের গায়ে রক্ত থাকে না।

আর ঢিল পড়া বন্ধ হলো সেই থেকে।

সেই বিন্দু দিদির কান্না দেখে যেন গলে গেলো। মনে মনে বললো, আহা বেচারি! তা, আর কি করবে? সবাই তো আর আমার মতো পাথর নয়, রক্ত-মাংসের শরীর তো! পরে ধিক্কার দিলো নিজেদের : কেন যে কুলীনের মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম!

তবে মুখে বললো বিন্দু : যাই করো তাই করো দিদি, কেলেংকারি করো না যেন!

সেই কেলেংকারি হবারই উপক্রম।

মাসখানেক পরের কথা। ইন্দু সেরাত্রে ম্লানমুখে ঢুকলো গোপীচরণের ঘরে। গোপীচরণ যথারীতি ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললো, এসো, আমার চাঁদবদনী এসো!

ইন্দু বন্ধ দরজায় পিঠ লাগিয়ে শুকনো গলায় বললো, এবার চাঁদবদনীর মুখে চুন-কালি পড়লো।

—কেন? কেন? ব্যাপার কি?—গোপীচরণ ভয় পেলো।

—আর কি ? মনে হচ্চে পেটে বোধহয়—কাথাটা শেষ না করেই ইন্দু এসে গোপীচরণের পাশে বসলো : এখন উপায় ?

গম্ভীর হয়ে গোপীচরণ বললো, ভাবালে দেখচি !

উত্তরে ইন্দু যেন নিজের মনেই বললো, ভাবা আগেই উচিত ছিলো ।

গোপীচরণ সে কথায় জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলো, কর্তা বা গিন্নীমা জানতে পারেননি তো ?

ইন্দু বললো, বাবা জানেন না এখনও, তবে মা ধরে ফেলেচে । কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কিছু খেলেই বমি হয়ে যায়, দেখে মা আজ ধবে ফেলেচে । মেয়েমানুষের চোখ তো !

—আর বিন্দু ?

—তাকে আমিই বলেচি সব খুলে ।

—আর নতুন বৌ ?

—সে ছেলেমানুষ । অতশত বোঝে না । তবে পরে সেও কি আর না বুঝতে পারবে !—পরে ইন্দু বললো, তবে সেও কুলীনের মেয়ে, তাছাড়া বুড়ো বর । কাজেই তার কপালেও হয়ত এমনতরই কিছু নাচে । তবে সে ঘরের লোক, তার জন্যে তত ভাবিনে, ভাবচি পোড়া পাড়াপড়শীদের জন্যে, আর সমাজের মাথারা তো সব এ ব্যাপারে নাক উঁচিয়েই আছে । অথচ দেখোগে, তাদের অনেকের ঘরেই কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বেরিয়ে পড়বে ।

শুনে গোপীচরণ অসহায়ের মতোই জিগ্যেস করলো, তাহলে উপায় ?

ইন্দু যেন রেগেই বললো, উপায় ঠিক করো । টোটকা-টুটকি কিছু করা দরকার । বাগদীপাড়ায় কে এক বুড়ী আছে নাকি, এই সব করে বেড়ায় । আর নইলে দড়ি-কলসী তো আছেই ।—বলেই হঠাৎ গোপীচরণের কোলে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো ইন্দু : তবে দোহাই, তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়ো না যেন । তাহলে আমি পাগল হয়ে যাবো—তারপর মাথাটা একটু উঠিয়ে অশ্রুসজল চোখে বললো, যাক, তুমি ভেবো না কিছু । মা আর বিন্দু যাহোক একটা ব্যবস্থা করবে'খন ।—বলেই ইন্দু গোপীনাথের গলা জড়িয়ে ধরলো দুহাত দিয়ে : বলো তুমি, আমাকে ছেড়ে যাবে না তো ?

—না গো না ।—গোপীচরণ তার সবল ডান হাতখানা দিয়ে ইন্দুর কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললো, আমি কি এতই কাপুরুষ ইন্দু, যে তোমাকে ছেড়ে পালাবো ?

সেরাত্রে বিরাজমণি লোহারামকে বললেন, বলি, নিজে তো কচি কাঁচ কুলীনকন্যেদের কুলরক্ষা করে বেড়াচ্চো, এদিকে তোমার বড়ো মেয়ে যে একুল ওকুল—দ্বকুলে কালি দেবার যোগাড় করেচে!

কিন্তু লোহারামের মনমেজাজ কিছুদিন থেকেই খুব ভালো নেই।

একে তো স্বর্ণমঞ্জরী সেই প্রথম ফুলশয্যার রাত্রে তাঁর কাছে এসেছিলো, তারপর মাঝে একদিন বিরাজমণি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে ঠেলে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোহারাম যেই তাকে আদর করে একটি চুমু খেতে গেছেন, অমনি স্বর্ণ তাঁকে এমনি জোরে একটা চিমটি কাটলো যে, 'উঃ বাপরে' বলে ককিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। আর সেই ফাঁকে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে একেবারে সোজা বিরাজমণির কোলের মধ্যে। ঐ এক মেয়ে। বাড়ির সব কাজে এগিয়ে যাবে, দাসীর মতো সব করবে—গোরুর জাবনা দেওয়া, ঘর-দাওয়া ঝাঁট দেওয়া, সব ঘর গোছানো, সকলের বিছানা পাতা, সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া, শাঁখ বাজানো, ঘরে ঘরে আলো দেখানো, এমন কি লোহারামের হাত-পা ধোয়ার জল দেওয়া, গড়গড়ায় কলকে সাজিয়ে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া—সব যেন দশ হাত বার করে স্বর্ণ করবে, কিন্তু লোহারামের ঘরে সে কিছুতেই শুতে যাবে না। যেতে বললেই কান্নাকাটি!

অবশ্য লোহারাম মনেমনে ভেবে রেখেছেন, ছেলেমানুষ, আর একটু বয়েস হলে বুঝবে যখন, তখন আসবে। কিন্তু এখন যে আসছে না, সেটাও লোহারামের পক্ষে খুব সুখপ্রদ ব্যাপার নয়।

তাছাড়া এই কিছুদিন আগে বল্লভপুর থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে এক কুলীনকন্যা, এ কন্যাটিও নাবালিকাই, তার কুলরক্ষা করতে গেছলেন। কিন্তু সেখানকার পাড়ার ছেলেরা দুষ্টুমি করে একটি ছোটছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তাকে সাতপাক ঘুরিয়েছিলো লোহারামের সঙ্গে। পরে বাসরঘরে ছেলেটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লোহারামের টাক মাথায় জোরসে গুমগুম করে ক'টা কিল মেরেই সোজা দৌড় তার আড্ডায়। লোহারাম রেগে টঙ। কিন্তু কয়েকজন জোয়ান-জোয়ান ছেলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁর রাগটা যেন এক নিমেষেই জল হয়ে গেলো। শুধু বললেন, আমাকে আজকের রাতের মতো কোথাও থাকতে দাও বাবারা, আমি কাল সকালেই চলে যাবো।

লোহারামের সঙ্গে গেছলো তাঁরই দুই বন্ধু। তিনজন পাড়ারই এক বাড়িতে আশ্রয় পেলেন এবং পরদিন রাত থাকতে থাকতে সোজা পাড়ি দিলেন বাড়িমুখো বল্লভপুরে। কথাটা যাতে জানাজানি না হয়, সেজন্যে লোহারামকে কুড়ি টাকা করে চল্লিশটি টাকা গুনে দিতে হলো দু'বন্ধুকে বাড়িতে এসে।

কাজেই লোহারামের মনমেজাজটা একেই খুব ভালো ছিলো না, আর তার উপর বিরাজমণির হঠাৎ ঐ দুঃসংবাদের ইঙ্গিতে এবং ঠেস মারা কথায় স্বভাবতই তাঁর মেজাজটা আরো গেলো খিঁচড়ে। বললেন, বাজে কথা রেখে আসল কথাটা বলোদিকি। ব্যাপারটা কি?

—ইন্দুর পেটে বোধহয়—।

—এঁ্যা, বলো কি?—মুখ ঝুলে গেলো লোহারামের।

বিরাজমণি ম্লান মুখেই বললেন, রকমসকম দেখে তাইতো মনে হচ্চে!

—কিন্তু কে, কে সে হারামজাদা?

—তোমারই সরকার গোপীচরণ।

—গোপীচরণ!—চাপা হুংকার দিয়ে উঠলেন লোহারাম: ঐ হারামজাদা কৈবত্তর পো? যে পথে-পথে ঘুরছিলো, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। শেষে ঐ ব্যাটা! ব্যাটা নুলো আমার বুকের উপর বসে আমারই দাড়ি ওপড়ালো!

—থামো!—বিরাজমণি স্বামীর হুংকার চাপা দিয়ে বললেন, এখন কি করা যায়, তাই ভাবো।

—কী আবার করা হবে?—লোহারাম তখনও গরম লোহার মতোই তপ্ত: ওকে তো আগে খুন করা দরকার। তারপর—

—থাক! আর বীরত্ব দেখাতে হবে না!—বিরাজমণি বললেন, কেলেঙ্কারি আরো ছড়াতে চাও, না? তাছাড়া ঐ জোয়ান একটা লোকের সঙ্গে পারো তুমি? ও ইচ্ছে করলে ওর ঐ এক হাতেই তোমার গলা টিপে—

—থামো তুমি!—লোহারাম ধমক দিলেন: মেয়েমানুষের ঐরকমই বুদ্ধি। আমি ওর সঙ্গে লড়াই করতে যাবো নাকি?—পরে গলাটা আরো নীচু করে: টাকা দিয়ে ওর পেছনে লোক লাগিয়ে দেবো, বুঝলে?

শুনে বিরাজমণি বললেন, আজ্ঞে মশায়, ওতে আসল সমিস্যের কিছুই হবে না।

তখনই সমস্যার সরল সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন লোহারাম: তাহলে মেয়েটাকে বলো দাঁড়-কলসী নিয়ে পুকুরে ডুবে মরতে। হারামজাদী কোথাকার!

– থাক, খুব হয়েচে।—এবার বিরাজমণি গরম হলেন : নিজে তো এই বয়েসেও কুলীনকন্যেদের বাড়িতে ষাঁড়ের মতো ঢুঁ মেরে-মেরে রাত কাটিয়ে আসচো, আর মেয়ে দুটো যে যৌবনে যোগিনী হয়ে আছে, তা দেখবার চোখ আছে?

—তা কুলীনের মেয়ে হয়ে জন্মায় কেন?

—ওদের পোড়া কপাল, তাই।—বিরাজমণি বললেন, বিন্দি শক্ত মেয়ে কাজেই ওর ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না আর ইন্দু, সেও তো এতদিন চুপ করেই ছিলো।—পরে একটু থেমে বিরাজমণি বললেন, তবে বাড়ির মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটেচে. একদিক দিয়ে ভালো।···আর এও বলি বাপু, পোড়ারমুখো জামাই সেই যে বিয়ে করে গেলো আর এমুখো হবার নামও নেই!

—তা আমি কি করবো বলো?—লোহারামের সুর একটু নরম : তাকে তো আনতে লোক পাঠিয়েচি কতবার. সে যদি না আসে তো তার পায়ে ধরতে হবে নাকি?

—তা দরকার হলে হবে বৈকি—এবার বিরাজমণি বোঝাতে বসলেন : শোনো যা বলি। তুমি কাল নিজে একবার যাও ইন্দুর শ্বশুরবাড়িতে। বেয়াইমশায়কে বুঝিয়ে বলোগে, তাঁদের বৌ বড় কান্নাকাটি করচে, হয় তাকে ক'দিনের জন্যে নিয়ে যান, নয়তো জামাইকে একবার যেন পাঠিয়ে দেন। আর আসা-যাওয়ার খরচ হিসেবেও টাকার কথা বলো। জামাই একবার ঘুরে গেলেও জাতরক্ষে হয়।

লোহারাম সব শুনে চিন্তিত হয়েই বললেন, বলচো যখন যেতে পারি। তবে কতটা কী হবে জানিনে।

২৫

পরদিন লোহারাম সত্যিই নিজে গেলেন তিন-চার ক্রোশ দূরে হৃদয়পুরে জামাই কাশীনাথ গাঙ্গুলীকে যদি আনতে পারেন, কিংবা তার বাবাকে বলে যদি মেয়েকে পাঠাতে পারেন সেখানে।

শয্যাশায়ী বেয়াই বৃদ্ধ তিনকড়ি গাঙ্গুলী সব শুনে বললেন, বুঝলাম তো সবই বেয়াইমশায়। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, ছেলে এখন লায়েক হয়েচে, তার যদি অমত না থাকে, আমার কোনো অমত নেই।—বলেই হাঁপানী রোগী তিনকড়ি বিছানায় হাঁপাতে লাগলেন।

অগত্যা লোহারামকে জামাইয়ের শরণাপন্নই হতে হলো।

কাশীনাথ তখন আমবাগানে গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে বুলবুলি পাখি একটা হাতে নিয়ে শিস দিচ্ছিলো। পাশে বসে ছিলো তার দু'তিনজন ইয়ার বন্ধু। সকলেরই মাথায় কেয়ারি-করা চুল, একজোড়া করে গোঁফ, পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ভিজে গামছা জড়ানো। তবে তার মধ্যে দুজনের গলায় ঝুলছে বেশ মোটা পৈতে।

লোহারাম সেই ক'বছর আগে বিয়ের সময় জামাইকে দেখেছিলেন, কাজেই কাশীনাথকে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারলেন না। আর জামাইয়ের অবস্থাও তদ্রূপই। আসলে যে মেয়েটির আইবুড়ো নাম ঘোচাতে গিয়েছিলো কাশীনাথ তার মুখই মনে নেই, তা তার বাপের মুখ।

লোহারাম কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, এখানে কাশীনাথ গাঙ্গুলী কার নাম বাবাজীবনরা?

উত্তরে কাশীনাথের এক বন্ধু জিগ্যেস করলো, তার আগে আপনার পরিচয়?

—আমার নাম শ্রীলোহারাম বাড়ুজ্জে। বল্লভপুরে বাস, শ্রীকাশীনাথ গাঙ্গুলী বাবাজীবন আমার জামাতা হন।

শুনে কাশীনাথ শিস দেওয়া বন্ধ করে তেমনি বসে বসেই জিগ্যেস করলো, তা মশায়ের আগমনের হেতু?

—হেতু একটু গোপনীয়। কথাটা তাকেই বলতে চাই।

তখন কাশীনাথ ছাড়া আর সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো: আমিই তিনি, আমিই তিনি। আমাকে বলতে পারেন।

লোহারাম গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন বাবাজীবনরা, জামাই আমার একটিই। সেই বিয়ের সময় তাকে দেখেছিলাম, তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছিনে। আমি বুড়োমানুষ, চোখেও ভালো দেখিনে, স্মৃতিশক্তিও তেমন নেই। কাজেই আমার সঙ্গে বাবাজীবনরা মস্করা না করে কোনটি আমার জামাতাবাবাজী দেখিয়ে দিলে ভালো হয়।

অগত্যা কাশীনাথকে বলতে হলো বন্ধুদের: না, উঠতেই হলো দেখছি। আড্ডাটা আজ মাটি হবার যোগাড়। নে, বুলবুলিটা ধর!—পাখিটাকে একজনের হাতে গছিয়ে দিয়ে কাশীনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমিই কাশীনাথ গাঙ্গুলী। বলুন আপনার গোপনীয় কথাটা।

—আমি তোমাকেই শুধু বলতে চাই বাবাজী,—লোহারাম বললেন।

শুনে কাশীনাথ বিরক্ত হয়েই বললো, আরে মশায়, এরা আমার অতি আপনার জন। এদের সঙ্গে আমার হরিহরআত্মা। আপনি বিনাদ্বিধায় যা বলবার বলতে পারেন।

—তবু বাবাজী আমার ইচ্ছে, তোমাকেই শুধু বলি। তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো।—বলে কাশীনাথের ডান হাতখানা ধরে লোহারাম তাকে টেনে নিয়ে গেলেন বেশ খানিকটা দূরে।

কাশীনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধের সঙ্গে চললো, তবে তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলো, ব্যাপারটা শুধু গোপনীয় নয় গোলমেলেও বটে।

কাশীনাথ একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আপনার যা বক্তব্য এখেনে বলতে পারেন।

লোহারাম আর দেরি না করে দুহাতে কাশীনাথের হাতখানা জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবাজী, তোমার স্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্যে এখানে নিয়ে এসো, কিংবা তুমি একবার আমার ওখানে চলো। ইন্দুমা তোমার জন্যে বড়োই কান্নাকাটি করচে, কিছু খাচ্চে না, কারোর কথাও শুনচে না। তুমি একবার চলো বাবাজী, তোমার কুলীন-মর্যাদা আমি যথাযোগ্য দেবো।

কাশীনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, সে তো বুঝলাম। কিন্তু মশায়, ব্যাপারটা খুব সহজ আর সরল বলে মনে হচ্চে না। হঠাৎ আমাকে স্মরণ করার আসল কারণটা খুলে বলুন তো শুনি?

লোহারাম বললেন, এব আর কারণ অকারণ কি? জামাই শ্বশুরবাড়ি যাবে, এতে আর—

—উঁহু মশায়, অতো সোজা নয় ব্যাপারটা। কাশীনাথ লোহারামের কথায় বাধা দিলো: আসল ঘটনাটা খুলে বলুন দিকি? আপনার কন্যা বুঝি বাধিয়ে বসেচে? এখন শিখণ্ডী খাড়া করা দরকার।

এমন স্পষ্ট কথায় লোহারাম হকচাকিয়ে গেলেন। থতমত খেয়ে কাশীনাথের হাতটা আবার চেপে ধরে বললেন, হ্যাঁ বাবা, মুখপুড়ি কেলেংকারি বাধিয়ে বসেচে। দোহাই বাবা, তুমি রক্ষে করো।

শুনে কাশীনাথ রীতিমতো ব্যবসায়ী চালে বললো, তা এসব ক্ষেত্রে দু'শত মুদ্রার প্রয়োজন।

টাকার অংক শুনে লোহারাম প্রায় আঁতকে উঠলেন: দু—শো টা—কা—

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।—কাশীনাথ অম্লানবদনে বললো, অন্যের ছেলের বাপ সাজতে হলে ঐ মুদ্রাই পেয়ে থাকি।

—কিছু কম করো বাবা।—মিনতি করলেন লোহারাম।

—কম?—খানিক ভেবে কাশীনাথ বললো, তা—হতে পারে। তবে আমি যেতে পারবো না, আমার ঐ বন্ধুদের কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারি। কেউ ধরতে পারবে না। আপনিও তো পারেননি। তবে সেক্ষেত্রে দেড়শো মুদ্রার প্রয়োজন।

—বাবাজী শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি!—লোহারাম বললেন, একশোটি টাকা নিয়ো, আমার জাতমান রক্ষে করো বাবা!

কাশীনাথ মুখ বেঁকিয়ে বললো, আজ্ঞে, এটা মাছের বাজার নয়। আপনি আসতে পারেন। আপনার পেছনে আর সময় নষ্ট করা যায় না। আমার সময়ের মূল্য আছে।

বলেই কাশীনাথ আর সেখানে দাঁড়ালো না।

লোহারাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওখান থেকেই ফের রওনা হলেন বল্লভপুরের দিকে।

২৬

বিরাজমণি লোহারামের কাছ থেকে সব কিছুই শুনলেন। পরে কী যেন ভেবে বললেন, তুমি ভেবো না কিছু। আমি এর ব্যবস্থা করচি। তুমি আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দাও শুধু।

—টাকা কি হবে?

লোহারাম জিগ্যেস করতে গিয়ে ধমক খেলেন: দাও না বলচি!

অগত্যা সিন্দুক খুলে পঞ্চাশটা টাকা বার করে দিলেন বিরাজমণির হাতে।

বিরাজমণি সেরাত্রে প্রায় জোর করেই স্বর্ণকে লোহারামের ঘরে শুতে পাঠালেন। স্বর্ণ কান্নাকাটি করতেই দিলেন ধমক: নে, এখন ন্যাকামি রাখ। লোকটা বাঘ নাকি যে তোকে গিলে ফেলবে? যা তুই, তোর কিচ্ছু ভয় নেই।···পরে বললেন, আচ্ছা বুড়োকে বুঝিয়ে বলবো, তোকে যেন বিরক্ত না করে, ঘুমোতে দেয়।

স্বর্ণ যেন আশ্বস্ত হলো। বললো, একটু ভালো করে বুঝিয়ো দিদিমা। আমাকে যেন একেবারে ছোঁয় না। আমি বিছানায় গিয়ে দুম করে পড়েই ঘুমিয়ে পড়বো! এ্যাঁ?

—হ্যাঁ। তাই করিস।

এবং বিরাজমণি সত্যিই লোহারামকে বলে এলেন এক ফাঁকে : আজ সন্ন তোমার ঘরেই শোবে। তবে তার কাছে যেন পুরুষমানুষি ফলাতে যেয়ো না। তাকে ঘুমুতে দিয়ো, নইলে ও যদি ছিটকে বেরিয়ে আসে রাতদুপুরে, তবে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে।

পরে সময়মতো স্বর্ণকে লোহারামের ঘরে ঠেলে দিয়ে বিরাজমণি ইন্দু আর বিন্দুদের ঘরে এসে দরজায় খিল দিলেন। গোপন পরামর্শটা বিন্দুর সঙ্গেই হলো বেশি, ইন্দু শ্রোতা হিসেবেই বসে রইলো। পরে বিরাজমণি দুই মেয়েকে দুপাশে নিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েই নাক ডাকাতে লাগলেন।

তার পরদিন খুব ভোরেই উঠলেন। ইন্দুকে খাটে শুয়ে ঘুমের ভান করে থাকতে বলে বিন্দুকে নিয়ে বেরুলেন ঘর থেকে। বিন্দু রান্নাঘর পরিস্কার করে উনুন ধরাতে গেলো আর বিরাজমণি গেলেন লোহারামের ঘরের দিকে।

লোহারামের খুব ভোরে ওঠাই অভ্যাস। তিনি উঠে বাইরে গেছেন, বিরাজমণি ঘরে ঢুকে দেখলেন স্বর্ণ বিছানায় ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে।

তাকে ঠেলা দিলেন বিরাজমণি : এই সন্ন ওঠ।

স্বর্ণ ঠেলা খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠলো।

—কাল রাতে তো খুব ঘুমিয়েছিস ?—বিরাজমণি হাসলেন।

—হ্যাঁ।—স্বর্ণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, তুমি বলে দিয়েছিলে কিনা, তাই বুড়ো আমাকে ছোঁয়নি একেবারেই। আমি তো দুম করে পড়েই ঘুম!

বিরাজমণি হেসে বললেন, সে তো কাল মাঝরাতে এসেই দেখলাম।

—তুমি বুঝি দিদিমা এসেছিলে ?

—হ্যাঁরে। তোর জামাই এসেছিলো যে কাল রাত্রে।

শুনে অবাক হলো স্বর্ণ : কে জামাই গো ?

—কে আবার ?—বিরাজমণি হাসলেন : ইন্দুর বর, আবার কে ? বাবাজীর বোধহয় হঠাৎ ইন্দুর কথা মনে পড়েছিলো, তাই একবার ঘুরে গেলো। আমি তখন শুতে যাচ্ছিলাম, সেইরাত্রে আমি আর বিন্দু আবার রান্না করি, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করি—

শুনে স্বর্ণ নাকে কান্না শুরু করলো : ওমা আমার কি হবে। আমার জামাই দেখা হলো না। দিদিমা কি হিংসুটে, আমাকে জামাই দেখালো না। যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি।

বলেই স্বর্ণ মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

বিরাজমণি হেসে বললেন, তা আমি কি করবো বল? রাত্রে ডাকতে এসে দেখি ঘর বন্দ। তা রাত্রে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবো, না, জামাইয়ের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করবো? তুই বল।

স্বর্ণ হয়তো ভাবলো, কথাটা ঠিকই। এবং হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসলো, তাহলে বুড়োও তার জামাই দেখতে পায়নি বলো?

—ওঁর সঙ্গেও দেখা হতো না।—বিরাজমণি বললেন, তবে কত্তা যে খুব ভোরে ওঠেন, তাই জামাই যাবার সময় তাকে পেন্নাম করে গেলো আর আমাকেও পেন্নাম করে পঁচিশটা টাকা দিয়ে গেলো।

—পঁচিশ টাকা!—স্বর্ণ চমকে উঠে জিগ্যেস করলো, কেন দিদিমা?

—কেন আবার?—বিরাজমণি বললেন, ইন্দুর বন্ধুবান্ধব আছে, আমোদ করবে, খাওয়াদাওয়া করবে··—তা দেবে না? আর দেবার যখন সামথ আছে?

—জামাই বুঝি খুব বড়লোক?

—তা জানিসনে বুঝি?—বিরাজমণি বললেন, ওরা যে হৃদয়পুরের জমিদার!—বলেই কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন বিরাজমণি: তা দ্যাখ সন্ন, তোর সঙ্গে যে জামাইয়ের দেখা হয়নি, তা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েচে বাপু—

—কেন দিদিমা?

—দেখা হলে তো পরিচয় দিতে হতো তোর! কি বলতাম তখন? বাবাজী, এও তোমার এক নতুন শ্বাশুড়ী!

শুনে স্বর্ণ লজ্জা পেয়ে হেসে উঠলো: ও মাগো! সত্যিই তো! এতটুকু আবার শ্বাশুড়ী হয় নাকি?

—তবে দ্যাখ, ভালো করিনি বল?

—খুব ভালো করেচো দিদিমা!—স্বর্ণর মনে হলো যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। বিরাজমণিকে জড়িয়ে ধরে বললো, উঃ, খুব বেঁচে গেচি! তোমার কি বুদ্ধি! না দিদিমা?

—হ্যাঁ রে পোড়ারমুখি!—হেসে বললেন বিরাজমণি: এখন যাই ইন্দুর বন্ধুদের খবরটা দিইগে, আজ দুপুরে তারা এখেনে খাবে।

স্বর্ণ লাফিয়ে উঠলো: আমিও যাই ইন্দুমাসীর কাছে গিয়ে তার বরের গপপো শুনিগে!

শুনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন বিরাজমণি: দূর পাগলি, তুই শুনবি মেয়ে-জামাইয়ের পিরীতের কথা!—বলেই মুখ টিপে হাসলেন বিরাজমণি: আজ

সে এখন ঘুমোচ্চে। সারা রাত্তির জেগেচে তো। তুই আর তাকে ওঠাসনে এখন।

এমন সময় লোহারামের খড়মের শব্দ শোনা গেলো।

স্বর্ণ আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা পালালো কুয়োতলার দিকে।

বিরাজমণি লোহারামকে একলা পেয়ে তাঁর মতলবটা খুলে বললেন স্বামীকে এবং বলে দিলেন, তিনিও যেন কথায়-কথায় লোককে বলেন, কাল রাত্রে জামাই এসেছিলো বাড়িতে।

লোহারাম উঠোনের কোণে গোপীচরণের ঘরের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, হুঁ।

কিন্তু গোপীচরণ তখন তার ঐ ঘরে ছিলো না। সে ডান বগলে দাখিলা-বই চেপে নিয়ে মাঠ ভেঙে চলছিলো প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করতে।

বিরাজমণি ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে পঁচিশটা টাকা রেখে দিয়ে বাকি পঁচিশ টাকা হাতে নিয়ে বাইরে এসে বললেন, এই নাও পঁচিশটা টাকা। দশখানা লালপেড়ে শাড়ি কিনে এনো, আর গয়লাপাড়া থেকে দই আর মিষ্টি। আর যাবার সময় হরি জেলেকে বলে যেয়ো, আজ পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে দিয়ে যায় যেন। বুঝলে?

লোহারাম শুধু বললেন, বুঝলাম।

লোহারাম দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বিরাজমণি যেন একাই দশজন হয়ে উঠলেন। মনের তার তিনি বেঁধে নিলেন বেশ চড়া সুরেই। মুখর হয়ে উঠলেন তিনি।

উপায় কি? জাত-মান বাঁচাতে গেলে এছাড়া উপায় নেই। তিনি পাড়ায় এবাড়ি ওবাড়ি চক্কর দিতে শুরু করলেন:

—ওরে ও নারানী, বাড়ি আছিস নাকি লা?

—কে? মাসীমা?

—হ্যাঁ রে আমি।

—এই সাতসকালে যে?

—এলাম এক দরকারে। আজ দুপুরে তুই আমাদের বাড়ি খাবি বুঝলি?

—না, বুঝলাম না তো মাসীমা!

—আরে ছুঁড়ি, ইন্দুর বর কাল মাঝরাত্তিরে হঠাৎ এসে হাজির।

—তাই নাকি মাসীমা?

—হ্যাঁ রে। এদিকে কোথায় যে বললো ছাই, কোন গাঁয়ে, আমার বাপু নামও মনে থাকে না—গেছলো কিনা, তাই ফেরবার পথে, কি ভাগ্যি, হঠাৎ জামাইবাবাজী পূর্ণিমার চাঁদের মতো উদয় হলেন।

—ওমা, তারপর?

—তারপর আর কি? সেই রাত্তিরে উনুন ধরানো, রান্না করা—এক কাণ্ড! আর জামাইয়ের কী দুঃখু! বলে কালই ভোরে আবার নাকি কোথায় যেতে হবে, তাই ভোরে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে একটা নাড়ু আর চন্দ্রপুলি একটা ভেঙে মুখে দিয়েই দে ছুট! বললো, এ আসা ঠিক হলো না, কারোর সঙ্গে দেখা হলো না, যেন চোরের মতো এসেই চলে যাওয়া। ইন্দুর বন্ধুদের সঙ্গে গপ্পোগাছাও করা গেলো না।...তবে জামাইয়ের খুব কাণ্ডজ্ঞান দেখলাম।...বুঝলি,তোদের একসঙ্গে আনন্দ করে খাওয়ার জন্যে পায়ের কাছে টাকা রেখে প্রণাম করলো। তা যাস তুই, বুঝলি?

—নিশ্চয়ই যাবো মাসীমা। আর ইন্দুকে একবার দেখে নেবো—একলা-একলা বর নিয়ে ফুর্তি করা। খবর দিলে আমরা বুঝি তার বরকে কেড়ে নিতাম!

—সে বাপু তোরা ইন্দুর সঙ্গে বোঝাপড়া করিস। এখন যাই আবার মলিনাদের বাড়ি।

এমনি করে মলিনা, কালিদাসী, হরসুন্দরী, সুলোচনা, ফুলকুমারী এবং আরো অনেকের বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেন বিরাজমণি এবং একই সংবাদ একই রকম ভঙ্গীতে তিনি চমৎকার আউড়ে যেতে লাগলেন। কোথাও ইন্দুর বন্ধুদের মা কাকী বা ঠাকুমার মুখোমুখিও দাঁড়াতে হলো বিরাজমণিকে, কিন্তু তিনি অটল হয়েই রইলেন। অনেকের জেরার উত্তরও তিনি দিলেন গুছিয়েই। শেষপর্যন্ত বিরাজমণির যেন মনে হলো জামাই তাঁর সত্যি-সত্যিই এসেছিলো গতরাত্রে!

তবে তাঁর ইষ্টদেবতাকেও ভুললেন না তিনি। এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাবার পথে একটু ফাঁক পেলেই হাত দুখানা কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বললেন, ঠাকুর, মুখ রেখো। দোষ নিয়ো না ঠাকুর। সবই ঐ মেয়েটার মুখ চেয়েই করচি।

বিরাজমণির মুখের উপর কেউ যখন কিছু বললো না, তখন ধরেই নিতে হবে, ঠাকুর তাঁর মুখ রাখলেন। তবে তাঁর পেছনে যে কেউ কিছু বললো না, তা নয়।

হরসুন্দরীর ঠাকুমা পরে বললেন মুখ বেঁকিয়ে, মাগী বোকা বোঝাতে এসেছিলো। বলি এ বয়সে কতই দেখলাম। এখনও দেখতে হবে। হুঃ! হরি হে, তুমিই সত্য!...তা যাস বাপু, বলে গেলো যখন বড়মুখখানা করে।

হেসেছিলেন কালিদাসীর মা-ও। আড়ালে তা-কে ডেকে বললেন, সেই পুরোন গপপো আবার নতুন করে শুনতে হলো। ঐ সঙ্গে ইন্দুর সাধের নেমন্তন্নটাও সেরে গেলেই মাগী পারতো!

তা বলুক। রক্ষে, জোর গলায় কেউ এসব বলতে পারবে না। কারণ অনেকেরই গোপন ঘটনার সূক্ষ্ম টিকি বিরাজমণির হাতেও ধরা আছে। টান দিলেই হলো।

কিন্তু তা দিতে হলো না। কারণ দুপুরে ইন্দুর সব বন্ধুরাই ইন্দুকে নিয়ে হৈ-হল্লা করলো, খেলো একসঙ্গে বসে, আর যাবার সময় সবাই পেলো একখানা করে লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি।

বিরাজমণি মনেমনে হাসলেন এবং ফেললেন স্বস্তির নিশ্বাস।

২৭

মানিকপুরের বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জে এবার বেশ মুশকিলেই পড়লেন। না, স্বর্ণমঞ্জরীর জন্যে নয়। তাকে তো বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে দিয়ে দিয়েছেন। বর বুড়ো বটে, তবে সুখেই আছে সে। এখবরটাও পেয়েছেন বেণীমাধব।

এবং বাসনাময়ীও নিশ্চিন্ত।

ননদ মাগী তো গলায় দড়ি দিয়ে এক কাণ্ড করে গেলো, তার মেয়েটাও বাসনাময়ীর গলায় কাঁটা হয়ে ফুটছিলো। সে কাঁটা বার করা গেছে অনেক কষ্টে।

অতএব শিবরাত্রের সলতের মতো খোকনকে আঁচল ঢাকা দিয়ে এবং স্বামীকে মুঠোর মধ্যে রেখে বাসনাময়ীর দিনগুলো কাটছিলো ভালোই। আর বেণীমাধবও বাসনাময়ীর রূপের ফাঁদে পড়ে এবং তার জিবের ধারের কথা মনে করে বহুদিন আর কোনো কুলীনকন্যার কুলরক্ষাও করেননি।

এটাও বাসনাময়ীর পক্ষে কম অহংকারের কথা নয়।

এবং সেক্ষেত্রে বাসনাময়ীর পক্ষে বেণীমাধবের কাছে হঠাৎ কোনো আবদার করে বসা স্বাভাবিকই। তাই রাত্রে সুযোগ বুঝে কথায়-কথায় বেণীমাধবের কাছে বায়না ধরলো বাসনাময়ী :

শুনিচি, মাহেশে নাকি স্নানযাত্রায় খুব ধুমধাম। আমায় একবার দেখিয়ে আনো না গো?

শুনে বেণীমাধব একটু শংকিত হলেন। কারণ, খরচ। এক, যাতায়াতের খরচ, তারপর মেলায় খরচ কেনাকাটার। বেণীমাধবও শুনেছেন, মাহেশে স্নানযাত্রায় খুবই ধুমধাম হয়, মেলা বসে, লোকের ভিড় হয় খুবই। কিন্তু···

তাই জেরা করলেন বেণীমাধব: তোমাকে কে বললে সেখানে ধুমধাম হয়?

—শুনিচি একজনের কাছে।

একজনের কাছে! বেণীমাধব কেমন যেন চমকে উঠলেন,—একজনের কাছে! কে সে? কোনো পুরুষমানুষ নয় তো? বেণীমাধব বিরক্তিমনেই ভাবলেন, সুন্দরী বৌয়ের ঐ এক ঝামেলা! তার উপর অল্পবয়সী!

বিরক্তি চেপেই বেণীমাধব বললেন, আগে বলো কার কাছে শুনেচো, তখন ভেবে দেখা যাবে।

বাসনাময়ী ভাবলো, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললো, ও পাড়ার মানময়ী এসেছিলো, সেই গল্প করছিলো।

বেণীমাধব জিগ্যেস করলেন, কে? চন্ডী মিত্তিরের মেয়ে মানময়ী?

—হ্যাঁ।

—সে শুনলো কার কাছে?

—তার মার কাছে।

—তার মা মাহেশে গেছলো বুঝি?

—বোধহয় না।

—তবে?

এবার বাসনাময়ীও বিরক্ত হলো: অতশত জানিনে বাপু। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কিনা তাই বলো?

—কিন্তু—

—কি কিন্তু?—এবার তাড়া দিলো বাসনাময়ী।

—মানে, অনেক কাজ যে।

—কাজ তো আছেই বারোমাস।—বাসনাময়ী বললো, তাছাড়া এবার ধান বিক্রি করে টাকাও তো পেয়েচো হাতে কিছু। আবার আপত্তিটা কিসের? যাকগে, তোমাকে যেতে হবে না।

বলেই বাসনাময়ী ফিরে শুলো।

নারীর এই ধরনের অসহযোগ-আচরণে অনেক পুরুষই স্থির থাকতে পারে না, বেণীমাধবও চঞ্চল হলেন : আহা-হা, শোনোই না কথাটা।

বাসনাময়ী এবার মৃদু ঝংকার দিয়ে উঠলো : না, তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনে।—তেমনি মুখ ফিরিয়ে শুয়েই বললো, তোমাকে কিছু বলাই আমার ঘাট হয়েচে, অন্যায় হয়েচে, আমি ক্ষমা চাচ্চি। তোমার হাতে পড়েচি যখন, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিলো দাসী-বাঁদীর আবার অতো শখ কেন। আমোদ-আহ্লাদ করা কপালে আবার থাকা চাই তো। পোড়া কপাল আমার।

নাকী সুরে বাঁশি হয়তো আরো বেজে চলতো, তবে বেণীমাধবের হঠাৎ-আশ্বাসে বেসুরো সুরটা যেন আচমকাই থেমে গেলো।

—বেশ তো যাওয়া যাবে'খন।—বেণীমাধব মিনতি করলেন : দেখি শোনো, এদিকে ফেরো।

এবার ফিরে শুলো বাসনাময়ী। হেসে বললো, কথা দিচ্চো তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, মাহেশে স্নানযাত্রায় ধুমধামের কথাটা বাসনাময়ী মানময়ীর কাছেই শুনেছিলো। তবে সেখানকার গল্প সে তার মা মোক্ষদাসুন্দরীর কাছে শোনেনি। কারণ মোক্ষদাসুন্দরী সেই যে নববধূ হয়ে মানিকপুরে শ্বশুরের ভিটেতে এসেছিলেন, সেই থেকে আর তিনি কখনো বাইরে পা দেননি। দেবার সুযোগও হয়নি, কারণও ঘটেনি।

মাহেশের গল্প শুনেছিলো মানময়ী উমাচরণের কাছে, দীনু কোবরেজের মেজ ছেলে উমাচরণের কাছে। মানময়ীর স্বামী ভবতারণ ঘোষ সেই যে রাত্রে মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলো, তার সুযোগ পুরোমাত্রায় আদায় করলো উমাচরণ। মানময়ীর দুর্বল মুহূর্তই হলো উমাচরণের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এবং সেই থেকে উমাচরণ রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে প্রায় এসে হাজিরা দিতে লাগলো মানময়ীর ঘরে।

এবং মোক্ষদাসুন্দরী দেখেও দেখলেন না কিছুই। বরং উমাচরণের সামনে পড়ে গেলে সরেই যান তাড়াতাড়ি।

উমাচরণ বন্ধুদের সঙ্গে গেছলো গত বছরে মাহেশে স্নানযাত্রায়। আর রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেখানকার সব মজার মজার গল্প শোনাতো মানময়ীকে। স্নানযাত্রায় মাহেশে হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদ-এর ঘটা, মেলার জৌলুস,

জগন্নাথের স্নান, লোকজনের ভিড়, ঘাটে নৌকো-বজরার ঠেলাঠেলি, কলকাতা আর সুতোনুটির বাবুদের বেলেল্লাপনা, নৌকোয় বাঈজীদের নাচের কথা, মেলার বেশ্যাদের বেসাতি ইত্যাদি গল্প উমাচরণ বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলেছিলো মানময়ীকে। আর সেই সঙ্গে মানময়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় গেয়ে শুনিয়েছে তরজা গানের বাছা-বাছা অশ্লীল লাইনগুলো।

শুনে মানময়ীরও ইচ্ছে হতো মাহেশের স্নানযাত্রা দেখতে।

এবং একদিন কথায়-কথায় সেই গল্পই করেছিলো সে বাসনাময়ীর কাছে। তবে কার কাছে সে গল্প শুনেছে সে, সেটা আর বললো না। আর বলেনি উমাচরণের রসের গল্প এবং অশ্লীল গানের লাইনগুলো। কিন্তু বাসনাময়ী জিগ্যেস করায় চট করে বলে বসলো, মা সেদিন গল্পকরছিলো, কে যেন গেছলো সেখানে, তার কাছে শুনেচে। বলছিলো, আমাদের তো আর দেবতা দর্শন ভাগ্যে নেই।···তা হ্যাঁ খুড়ি, তোমরা তো যেতে পারো। আর কতদূরেই বা পথ।

তখন বাসনাময়ীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলো, হুঃ খুড়ো তোমার তেমনি মানুষ কিনা।

তবে ক'দিন পরে বাসনময়ীই খবর পাঠালো মানময়ীকে। মানময়ী আসতেই বাসনাময়ী বললো, ওরে, রাজি করিয়েচি তোর খুড়োকে। কিন্তু মুশকিল হয়েচে, বাড়ি ঘরদোর কার উপর রেখে যাবো, তাই ভাবচি। শুধু ঝি-চাকর সরকারের উপর সব ছেড়ে যেতে মন চাইচে না যে।

শুনে মানময়ী হাঁ-হাঁ করে উঠলো: আহা, সেজন্যে ভাবচো কেন? ওরা তো রইলোই—সব পুরোনো লোক। তাছাড়া আমি আর মা একবার করে সময়মত এসে খবরাখবর নিয়ে যাবো'খন। তোমরা দুগগা বলে বেরিয়ে পড়ো, আর ভেবো না খুড়ি। বাবা যখন টেনেচেন, তখন পেছনোর কথা ভাবাও যে পাপ।

—যা বলেচিস!—বাসনাময়ী হাসলো।

মানময়ী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, এই অভাগীর কপালে তো আর পুণ্যি করা নেই! তুমি ঘুরে এসো খুড়ি, তোমার পায়ের ধুলো নিলেই আমার পুণ্যি হবে।

মানুষের নিজের কোনো ইচ্ছা চরিতার্থ না হলে, সেটা তার পুত্র বা কন্যাকে দিয়েই সে বাসনা পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মানময়ীর তেমন

কোনো অভিপ্রায় ছিলো না এবং থাকবারও কথা নয়, তবে একটা মতলব ছিলো। উমাচরণের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগের কথা যদিও লোক-জানাজানি হয়নি, তবু হতে কতক্ষণ। আর হলে বাসনাময়ীকে এখন থেকে তোয়াজ করলে তাকে হাতে রাখা হয়তো শক্ত হবে না। আর বাসনাময়ীকে হাত করতে পারলে গ্রামের ধনী আর মানী বেণীমাধবও থাকবেন তারই স্বপক্ষে। একটা কেলেংকারির ব্যাপারে আগে থেকে কূলকিনারা করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আর বাসনাময়ী? তারও তো মনের মধ্যে কী একটা যেন খচখচ করে প্রায়ই। ঐ যে মাগী সন্নর মা নীরোদা গলায় দাঁড় দিয়ে মলো, সে কি তারই দোষে? তারই গঞ্জনা আর অপমানের জন্যেই কি? একটা রুপোর ঝিনুকের জন্যে অতটা বোধহয় বাড়াবাড়ি না করলেই হতো!

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন বাবা জগন্নাথের কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় জল ঢেলে একটু বলে আসা দরকার বোধহয়ঃ বাবা, দোষ নিয়ো না। ক্ষমা-ঘেন্না করে ভুলে যেয়ো বাবা!

অতএব বেণীমাধবকে কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হলো, যে ক'দিন থাকবেন না, সে সময় কোথায় কি করতে হবে, সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন সে সব। বাড়ির সরকার আর চাকরবাকরদের বাড়ি ঘরদোরের দিকে নজর রাখতে তো বললেনই, আরো বললেন পাড়ার দুচারজন মাতব্বরকে। এবং এইভাবে গাঁ-ময় প্রচার হয়ে গেলো বেণীমাধব সপরিবারে যাচ্ছেন মাহেশে।

শুনে কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কেউ ঠোঁট উলটে বললো, টাকার গরম! কেউ হেসে বললো, এতদিনে বেণীভায়ার ধম্মে মতি হলো নাকি? আর কেউ-কেউ এই তীর্থযাত্রার আসল কারণটাও বার করলো হাতড়েঃ বোধহয় গিন্নীর বায়না!

শেষে গিন্নীদের বায়না শুরু হলো মানিকপুরের আরো দু'একটি বাড়িতে। কোথাও অভিমানঃ ওবাড়ির গিন্নী যেতে পারে, আর আমি যেতে পারিনে বুঝি? বলি, বেণী বাঁড়ুজ্জের চাইতে তুমি কমটা কিসে?…আর এক বাড়ির গিন্নী বিশেষ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর কপালটা একান্তই দগ্ধ!… আর একজন গিন্নী নিজেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তিনি নামেই গিন্নী, আসলে সংসারের দাসী-বাঁদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু কর্তাদের টলানো গেলো না। যশোমতী আর হরিমতীর মা কৃপাসুন্দরী স্বামীকে রাজি

কায়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেই পেঁাছয়ে গেলেন ঃ ঘরে দু'দুটো আইবুড়ো মেয়ে গলায় আটকে আছে, তাদের ফেলে বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক ভালো দেখায় না। আর ওদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মানে তো একগাদা খরচ। কাজেই হাত দুখানা জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, বাবা জগন্নাথ মাথায় থাক!

তবে বাবা জগন্নাথ টানলেন দীনু কোবরেজের স্ত্রী, মানে উমাচরণের মা মনোমোহিনীকে। ছেলের কাছে আগেই তিনি শুনেছিলেন মাহেশের ঐ স্নানযাত্রার গল্প, এবার হাতের কাছে যাওয়ার লোক পেয়ে সে সুযোগ তিনি ছাড়লেন না। দীনু কোবরেজ হ্যাঁ-না করতে করতে শেষপর্যন্ত রাজিও হয়ে গেলেন।

মায়ের ছাড়পত্র পাবার কথা উমাচরণই রাত্রে এসে জানালো মানময়ীকে এবং পরদিন মানময়ীর কাছে তার মা মোক্ষদাসুন্দরী শোনামাত্রই তিনিও বেশ চঞ্চল হয়েই উঠলেন ঃ মানু, তুই আমার একটু ব্যবস্থা করে দে, বাবাকে একবার দেখে আসি।

একথার অর্থ মানময়ী বুঝলো এবং মনেমনেই হাসলো। তবে মুখে বললো, আমি কি করে ব্যবস্থা করবো বলো? হাতে তো এখন কানাকড়িও নেই!

—সে তো জানি। তবে মনে হচ্ছে তুইই পারবি যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে। তুই আমার ছেলের মতো। আর ছেলে তো পর হয়েই গেলো। তার উপর কোনো ভরসাই নেই!—মোক্ষদাসুন্দরীর গলার স্বর ভারি হয়ে এলো ঃ আর ক'দিনই বা বাঁচবো বল! এতে তোর পুণ্যিই হবে। তীর্থ করা আর তীর্থ করানো একই কথা!

কাজেই সেরাত্রে মানময়ীকে কথাটা পাড়তে হলো উমাচরণের কাছে। এবং বিছানায় শুয়ে উমাচরণ যখন মানময়ীকে নিজের বুকের মধ্যে আগের মতোই টানতে গেলো, তখন তার মনে হলো মানময়ীর দেহলতাটি যেন একটু ভারি, অন্য রাতের মতো আপনা থেকেই যেন সরে এলো না।

—কীগো, কি হলো আজ?

—কিছু না।

—আহা, বলোই না!

মানময়ী চুপ। কিন্তু উমাচরণ অধৈর্য হয়ে উঠলো ঃ কী, কথা বলচো না যে?

তবু মানময়ীর মুখে কথা নেই। উমাচরণ বুঝলো, ব্যাপার কিছু গোলমেলে। তাই শুরু করলো মানভঞ্জনের পালা : সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার—কি হয়েচে বলবে না আমাকে ?

এতক্ষণে কথা ফুটলো মানময়ীর : কি আবার হবে ?

—হয়েচে নিশ্চয়ই কিছু।

—হবে আবার কি ?—মানময়ী বললো, ভাবচি, তুমি তো ফুলের মধু খেতে এসেচো, মধু ফুরিয়ে গেলেই উড়ে যাবে। তখন ?

—যাক, তবু একটা খেই পাওয়া গেলো !—উমাচরণ মুখর হয়ে উঠলো : ও, তুমি বুঝি আমাকে তেমনি বেইমান ভেবেচো ? ভেবেচো আমি তোমাকে ভালোবাসিনে ? অথচ খেতে শুতে সব সময়েই তো তোমার মুখখানাই মনে ভাসে ! হায়রে, বুক চিরে যদি দেখাতে পারতাম—

—থাক, আর কষ্ট করতে হবে না !

কিন্তু উমাচরণ থামলো না : মানময়ী রাধে, এ আর কি কষ্ট ! আমি তোমার জন্যে যে প্রাণ দিতে পারি !

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো মানময়ী।

—হাসচো যে ?

—বলি, আমার জন্যে প্রাণ দিয়ে আমাকে নিমিত্তের ভাগী করতে চাও নাকি ? বরং মা'র একটা ব্যবস্থা করতে পারো তো বলো।

—কি ব্যবস্থা ?

—তোমার মা ওবাড়ির খুড়ির সঙ্গে মাহেশে যাচ্চে শুনে মা-ও বায়না ধরেচে, যাবে। তা আমিও বলে দিয়েচি, গরীব মানুষের অমন ঘোড়া-রোগ সাজে না। তাছাড়া আমাদের আপনার বলতে কে আছে বলো ? শুনে মাগীর কি কান্না !

—আহা, সে কথা বললেই তো হয় !—উমাচরণ এবার মানময়ীকে নিজের দিকে টানতেই মনে হলো দেহটা তার অনেকটা যেন হালকা : ছিঃ, এর জন্যে এতো ! বুড়োমানুষ তীর্থ করতে যাবেন, আর সেটুকু করতে পারবো না ?—তারপর উমাচরণ দু'একটা পূর্বপ্রমাণ দিতেও ভুললো না : কেন ? তুমি যখন যা চেয়েচো, দিইনি ? আংটি চিরুনি নথ মাকড়ি যা চেয়েচো দিইনি গড়িয়ে ? এই তো সেদিন হাটে শান্তিপুরী শাড়ি একখানা চোখে ভালো লাগতেই নিয়ে এলাম তোমার জন্যে। আর এ তো সামান্য ক'টা টাকার মামলা।...কাল দুপুরেই পাবে।...এসো, এখন কাছে এসো।

এবার-উমাচরণ একটু টানতেই মানময়ী যেন সেঁটে গেলো তার দেহের সঙ্গে।

রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে মোক্ষদাসুন্দরী এতক্ষণ মানময়ীর ঘরের বেড়ার গায়ে কান পেতে সব শুনছিলেন, এবার আর দাঁড়ালেন না তিনি। শুধু হাত দুখানা জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে উপরের দিক চেয়ে বললেন, বাবা, যেন দর্শন পাই!

সত্যিই, উমাচরণ পরদিন দুপুরে মানময়ীদের বাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে একটা ঝোপের আড়ালে এসে একটা ভাঁড়ে কিছু টাকা রেখে দিয়ে চলে গেলো এবং দেখা গেলো মানময়ী একসময় এসে ভাঁড়টা সেখান থেকে তুলে নিয়ে ফের ঢুকে গেলো বাড়ির মধ্যে। গত রাত্রের কথামতই এই ব্যবস্থা হয়েছিলো এবং উমাচরণ মনে-মনে ভেবেছিলো, মানময়ীর মা-মাগীর কদিন বাড়ি না থাকলে সন্ধ্যা থেকেই হাজিরা দিয়ে সারা রাতটাই মানময়ীর কাছে কাটাতে পারবে। কাজেই কিছু টাকা দিয়ে মাগীকে ক'দিনের জন্যে বাড়ি থেকে বিদেয় করা মন্দ নয়।

মোক্ষদাসুন্দরী তখন রান্নাঘর ধুচ্ছিলেন, মানময়ী এসে চৌকাঠের কাছে টাকাগুলো রেখে বললো, নাও গো, গিরিবালার কাছ থেকে ক'টা টাকা ধার করে নিয়ে এলাম, পরে সুতো কেটে শোধ দেবো'খন। ওতেই তোমার গাড়িভাড়া খাওয়াদাওয়া কেনাকাটা সব কিছু হয়ে যাবে মনে হয়।

মানময়ীর কথায় মোক্ষদাসুন্দরী যেন হাতে চাঁদ পেলেন, একগাল হেসে বললেন, বেঁচে থাকো মা, তোর ভালো হোক।

—থাক, আর ভালোতে দরকার নেই।—মানময়ী বললো, এখন বিকেলে চলো যাই খুড়ির ওখানে।

বিকেলে মোক্ষদাসুন্দরী টাকা ক'টা আঁচলের খুঁটে বেঁধে মানময়ীর সঙ্গে গেলেন বাসনামমীর কাছে। গিয়ে মনের বাসনা জানিয়ে বললেন, ভাই, তোমার কত্তাকে বলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো, এতে তোমাদের পুণ্যিই হবে। এই ন্যাও খুঁদ-কুড়ো যা ছিলো এনে দিলাম—টাকা ক'টা বাসনাময়ীর হাতে গুঁজে দিলেন মোক্ষদাসুন্দরী।

মানময়ী বললো, তা মা গেলে ভালোই হবে, বুঝেচো খুড়ি! রাস্তায় তোমাকে দেখাশুনো করা, তাছাড়া খোকনমণি যাচ্চে, তার দেখাশোনাও করতে পারবে মা!

বিনা খরচায় এমন একটি সহচরী পাবার কথা বাসনাময়ী ভাবতেও

পারেনি। কাজেই একগাল হেসে ফেললো; ও মা; এ তো আনন্দের কথা। কত্তাকে বললে নিশ্চয় রাজী হবে। দীনু কোবরেজের বৌও এসেছিলো গো সকালে, আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। সঙ্গে উমাচরণ এসেছিলো, সে নাকি কত্তাকে বলেচে, দরকার হলে সে এসে ক'টা দিন বাড়িটা পাহারা দেবে, আর কীভাবে যেতে হবে, কোথায় কি করতে হবে সব নাকি বুঝিয়ে দিয়েচে কত্তাকে।...তা ভালোই হলো। বিদেশে বিভূঁইয়ে একলা যেতে আমারও মন চাচ্ছিলো না।...তা হ্যাঁরে?—হঠাৎ বাসনাময়ীর মনে হলো: অ তুই একলা বাড়ি থাকবি কি করে?

শুনে মানময়ী খিলখিল করে হেসে উঠলো: একলা কি গো খুড়ি! বাড়িতে মুড়ো ঝ্যাঁটা, আঁশ-বটি, রামদা সব আছে না! তাছাড়া মুখের বাক্যি তো আছেই। বলি, এই বুড়ো মা কি আমাকে পাহারা দেয়? না; আমাকেই দিতে হয় পাহারা। ও তুমি ভেবো না খুড়ি।

তারপর তিন বাড়িতেই পুণ্যকামীরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন দরকারমতো। চাল ডাল তেল নুন চিঁড়ে মুড়ি, থালা বাটি গেলাস এবং কাপড় গামছা বিছানাপত্তর ইত্যাদি দিয়ে বেশ করেকটি বোঁচকাবুঁচকি বাঁধা হলো। তাছাড়া পান দোক্তা, চুন সুপুরি খয়ের, এবং বেণীমাধবের হুঁকো কলকে টিকে তামাক ইত্যাদি দিয়েও হলো তিন চারটে ছোট-ছোট পুঁটলি। তারপর ঘরদোরের ব্যবস্থা করা, একে-ওকে নানারকম বোঝানো, সবাইকে সাবধানে থাকতে বলা। অনেক কাজ।

২৮

পরদিন খুব ভোরে দুখানা গরুর গাড়িতে সদলবলে 'জয় বাবা জগন্নাথ' বলে রওনা হলেন বেণীমাধব মাহেশের দিকে। সঙ্গে খানিকটা পথ চললো উমাচরণ এবং বেণীমাধবের সরকার চাকর আর পাড়ার কয়েকজন। মনোমোহিনীকে তুলে নেবার জন্যে গরুর গাড়ি খানিকদূরে দীনু কোবরেজের বাড়ি পেঁছুলে তিনিও বেণীমাধবের হাতে একটা কবিরাজী ওষুধের পুঁটলি দিয়ে বললেন, এটা রেখে দাও ভায়া। এতে অজীর্ণ পেটব্যথা জ্বরজারি বাহ্যেবমির ওষুধ আছে। মোড়কে সব লেখা আছে। পথে কাজে লাগবে।

বেণীমাধব হেসে বললেন, যাক ভালোই হলো। তবে এগুলো কাজে না

লাগলে আরো ভালো দাদা। শুধু দাদা, আশীর্বাদ করো যাতে ভালোয়-ভালোয় সব ফিরে আসতে পারি। আচ্ছা তবে আসি এখন।

ছইওলা দুটো গরুর গাড়িতে মোটা করে খড় পাতা, তার উপর শতরঞ্জি বিছোনো। একখানায় উঠেছে বাসনাময়ী আর খোকন, আর পেছনের খানায় প্রৌঢ়া মোক্ষদাসুন্দরী ও বৃদ্ধা মনোমোহিনী। বেণীমাধব গাঁয়ের মধ্যে হেঁটেই চললেন। গাড়ি দুখানা গ্রামেরই চাষী প্রাণকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণ—খুড়ো ভাইপোয়ের। বেণীমাধবের ধানী জমির বর্গাদার রহিম মিঞার দুখানা গরুর গাড়িও পাওয়া যেতো, কিন্তু বাসনাময়ী আপত্তি করলো। যাচ্ছি তীর্থ করতে, মুছলমানের গাড়িতে চড়লে লোকে বলবে কি? তাছাড়া দুজন বুড়ি যাচ্ছে, তাদেরও কি জাত মারতে চাও?…কাজেই প্রাণকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণর গাড়িই ঠিক হলো। তারাই চালাচ্ছে। গরু চারটেও হাড়জিরজিরে নয়, চলে ভালো। গলায় তাদের ঘণ্টি বাজতে লাগলো—টুং টাং টুং টাং।

মানিকপুরের গোপীনাথবাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ পীর সাহেবের ভিটে পার হয়ে একটু পরেই মাঠে পড়লো গাড়ি দুখানা। বেণীমাধব এবার সবায়ের কাছে বিদায় নিয়ে হরেকৃষ্ণর গাড়িতে উঠে বসলেন, বাসনাময়ী সরে জায়গা করে দিলো। গাড়ি দুখানা ক্রমে বেনেহাটি শিববাড়ি হৃদয়পুর গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে এসে পড়লো বড় রাস্তায়।

বেণীমাধব বললেন বাসনাময়ীকে, জানো, এই রাস্তাই পশ্চিমমুখো সো-ও-জা গিয়েচে দিল্লী। শেরশা নামে এক বাদশা ছিলো, সেই বানিয়েছিলো রাস্তাটা।

বাসনাময়ী খানিকটা দোক্তা-পান মুখে দিয়ে নথ নাড়িয়ে বললো, মিন্সের বুঝি কোনো কাজ ছিলো না? তাই কোদাল নিয়ে রাস্তা বানাতে গেলো।

শুনে বেণীমাধব হো-হো করে হেসে উঠলেন: একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। সে হচ্চে রাজা, তার কতো লোক। হুকুম করলেই কাজ হয়ে যায়। সে কোদাল চালাবে কোন দুঃখে?

—তা রাস্তা না বানিয়ে আরো কতকগুলো বাড়িঘর বানালেও তো পারতো। পুকুর কাটাতে পারতো।—বাসনাময়ী যুক্তি দেখালো।

—রাস্তা করেছিলো, তাইতো আমরা রাস্তা দিয়ে চলতে পারচি গো।

শুনে খোকনমণির বুঝি হঠাৎ উৎসাহ বেড়ে গেলো। বেণীমাধবের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা বাবা, আমি রাততা বানাবো।

—হ্যাঁ, তাই বানাস ঐ লোকটার মতো—বাসনাময়ী নথনাড়া দিলো ঃ নইলে আর বংশের মুখ হাসাবি কি করে ?

কিন্তু বেণীমাধব বললেন, বানাবে বৈকি বাবা। রাস্তা বানাবে, ঘাট বানাবে, মন্দির বানাবে। লোকে কতো গুণ গাইবে তোমার।

কথাটা এবার হয়তো মন্দ লাগলো না বাসনাময়ীর। বললো, আমি বাপু অত আশা করিনে। শিবরাত্রের সলতেটুকু টিকে থাকলেই বাঁচি।—বলে যাঁর উদ্দেশ্যে দুহাত জোড় করে প্রণাম করলো বাসনাময়ী, বোধকরি তিনি জগন্নাথ।

রাস্তাটা লম্বা চলে গেছে। দুধারে বড়ো বড়ো গাছ। সকালের সূর্য তখনো হেলে আছে পুবআকাশে, তাই গাছের ফাঁকে-ফাঁকে পাওয়া যাচ্ছে তার নরমসরম পরশ। আকাশটা পরিষ্কারই যেন—বেণীমাধব দেখলেন। যাক, বৃষ্টি হয়তো হবে না। তবে আষাঢ়ের আকাশকে বিশ্বাস করা যায় না। কদিন আগেও বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে।

তাই কাঁচা রাস্তাটায় এখানে-সেখানে জল জমে আছে, কাদা হয়ে আছে কোথাও। তবে ধুলোর দৌরাত্ম্য নেই, সেটাও কম কথা নয়।

পথে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই দল বেঁধে হেঁটেই চলেছে দক্ষিণমুখো, বুঝি মাহেশেই। অনেকেই হনহন করে এগিয়ে চললো তাদের গরুর গাড়ি পেছনে ফেলে। বাঁশবেড়ের কাছে এসে দেখা গেলো পথে বেশ লোক। পালকিও চলেছে ভাগ্যবতী ধনী গৃহিণীদের বয়ে নিয়ে। বেহারাদের মুখে শব্দ ঃ হুম হুম হুম। উড়ে বেয়ারাদের গায়ে শক্তি আছে বেশ।—বেণীমাধব ভাবলেন, বাঙালীরা এসব কাজ করবে কেমন করে ? ম্যালোয়ারি জ্বরে ভুগে ভুগে একদিন খড়িরতলায় গিয়ে শেষ হয়।

পথ বেশি দূর নয়। বোধহয় ক্রোশ পাঁচ-ছয় হবে। হেঁটেই মেরে দেওয়া যায়। তবে মেয়েছেলে নিয়ে চলা, কাজেই ঢিকোতে-ঢিকোতেই যেতে হবে। গরুর গাড়ির চাকা গড়ায় কিনা বোঝাই দায়। শুধু ঝাঁকুনি আর ঝাঁকুনি।

ঝাঁকুনিই বটে। ধ্যেৎ। বেণীমাধব গরুর গাড়ির পেছনেই বসেছিলেন, একসময় তড়াং করে লাফিয়ে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

বাসনাময়ী বললো, নামলে যে ?

সামনে ঝাঁকুনি খেয়ে হরেকৃষ্ণ জিগ্যেস করলো, কি হলো কত্তা ?

—হবে আবার কি ?—বেণীমাধব বললেন, তোমাদের এই রথে চাপা কি আমাদের পোষায় ? আমাদের পা-গাড়িই ভালো।

বাসনাময়ী বললো, দেখো, বাতের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে না ওঠে।

বেণীমাধব হেসে বললেন, তার আগে গায়ের ব্যাথার হাত থেকে তো বাঁচি।

বাবাকে নামতে দেখে খোকনমণিও বায়না ধরলো : আমি হাতবো বাব্বার মতন।

—থাম! অত বীরত্বে দরকার নেই—ধমক দিলো বাসনাময়ী।

বেণীমাধব একবার পেছন ফিরে দেখলেন, পেছনে প্রাণকৃষ্ণর গরুর গাড়িটা ঠিক পেছনে-পেছনেই আসছে। আর লক্ষ্য করলেন ছইয়ের মধ্যে মোক্ষদাসুন্দরী আর মনোমোহিনী গল্পে মশগুল।

বেণীমাধব দুই গাড়ির মাঝে হাঁটতে লাগলেন আর খোকনমণি ধমক খেয়ে চুপ করে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো তার বাবার চলা।

বেণীমাধব দেখে হেসে বললেন, আয়, আসবি?

—হ্যাঁ, দাবো।

—আয়, কোলে আয় বেণীমাধব দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন। খোকন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো বাবার কোলে।

—তুমিই ছেলেটার মাথাটা খাবে।—বাসনাময়ীর হুকুম থাকলো না দেখে বুঝি রাগই হলো তার।

বেণীমাধব বললেন, ছেলেমানুষ, চুপচাপ আটকা বসে থাকতে ভালো লাগে নাকি?

এমন সময় গাড়ির সামনে থেকে হরেকৃষ্ণ হাঁকলো : কাছেই হংসেশ্বরী মন্দির কত্তা। দেখে যাবেন নাকি?

তাড়াতাড়ি বেণীমাধব বললেন, এখন যেখানে যাবো বলে বেরিয়েচি সেখানে আগে চলো তো!

—তা গেলে হতো না? —বাসনাময়ী বললো।

—ফেরবার সময় দেখা যাবে'খন।—বেণীমাধব থামিয়ে দিলেন বাসনাময়ীকে : এখন অনেকদূর যেতে হবে।

—কতদূর? কখন পৌঁছুবো?

বেণীমাধব হেসে বললেন, সবই হরেকেষ্ট আর প্রাণকেষ্টর ইচ্ছের উপর—

শুনে বাসনাময়ী বললো, ছিঃ, অমন বলতে নেই। বরং বলো সবই বাবার দয়া।—আবার জোড়হাত করলো বাসনাময়ী।

হরেকৃষ্ণও গাড়ির সামনে থেকে বললো, মাঠাকরণ ঠিকই কয়েচেন কত্তা।

বেণীমাধব বললেন, তা তো বুঝলাম। এখন কোথায় গাড়ি থামিয়ে খাওয়াদাওয়া করবে ঠিক করেচো? তোমাদের গরুগুলোকেও তো ঘাস-জল দিতে হবে।

উত্তর দিলো হরেকৃষ্ণ: চুঁচড়ো কিংবা চন্দননগরে থামা যাবে। ততক্ষণে দুপোর বেলা হবেনে। তারপ চাট্টে খেয়েদেয়ে বিকেল বা সঞ্জে নাগাদ পেঁাছবনে-আনকুণ্ডু ভদ্দেশ্যর বদ্দিবাটি শেওড়াফুলি ছিরামপুর পার হয়ে মাহেশে।

অতগুলো নাম শুনে বাসনাময়ী চমকে উঠলো: বাবা, এতো পথ! এখন সবই বাবার ইচ্ছে। —আবার জোড়হাত কপালে ঠেকালো।

২৯

তা মাহেশে পেঁছুতে প্রায় সন্ধ্যেই হয়ে গেলো।

দিনের সূর্য পশ্চিম আকাশ রাঙা করে তার গায়ে একখানা বিরাট সোনার থালার রূপ ধরে জ্বলজ্বল করছে। দূরে দৃষ্টির শেষসীমায় কালো-কালো তাল আর নারকেল গাছগুলো তাদের ঝাঁকড়া-মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইন বেঁধে। পাটে বসা সূর্য-সম্রাটের কাফ্রী প্রহরী সব।

গরুর গাড়ি দুখানা এসে এক গাছতলায় থামলো।

হরেকৃষ্ণ বললো, এখেনটায়ই সুবিধে। হেই কাছে মা গঙ্গা। আর দু'পা গেলেই বাবাব ওখানে পেঁাছে যাবেন কত্তা।

বেণীমাধব বললেন, তাই হোক।

গরু খুলে দেওয়া হলো গাড়ি থেকে। আস্তে আস্তে নামলো বাসনাময়ী আর খোকনমণি। বেণীমাধব চন্দননগরে খাওয়াদাওয়ার পর গাড়িতে উঠেছিলেন আর নেমেছিলেন শ্রীরামপুরে, শহর দেখে দেখে যাবার জন্যে। প্রাণকৃষ্ণের গাড়ি থেকে নামলেন মনোমোহিনী মোক্ষদাসুন্দরী। আজ এখানেই খাওয়াদাওয়া-থাকা।

পরদিন স্নানযাত্রা।

তবে মাহেশে ইতিমধ্যেই যাত্রীদের ভিড় হয়ে গেছে। বুড়ো-বুড়িদের সংখ্যা যেমন, অল্পবয়েসী মেয়ে-পুরুষদের সংখ্যাও তেমনিই। একহাত ঘোমটা দেওয়া অনেক বৌ শাশুড়ীর আঁচলে আঁচল-বাঁধা হয়ে তার পেছন-পেছন চলেছে। সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে হয় তার স্বামী, নয়তো ভাসুর কিংবা

পাড়ার কোনো মুরুব্বি—পরনে চওড়াপাড় ধুতি, গায়ে উড়ুনি বা ফতুয়া, কাঁধে ছাতা আর খালি পা। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি আর পালকির ভিড়ে পথ চলা দুষ্কর। ঘোড়ার গাড়ির মাথায় ছেলে-ছোকরাদের বোঝা।

মনোমোহিনী একটু এগিয়ে বাসনাময়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, বল না লো তোর কত্তাকে একটু মা-গঙ্গা পশ্য করে আসি।

মোক্ষদাসুন্দরী বললেন, হ্যাঁ দিদি, আমারও তাই ইচ্ছে। তবে বাবাকে আগে দর্শন করে আসবো না?

বাসনাময়ী বেণীমাধবকে কথাটা বলতেই হরেকৃষ্ণ বলে উঠলো: এখন বেদিমন্ডপে খুব ভিড়। তাছাড়া যেতে এসতে সঙ্গে হয়ে যাবে। বরং মাঠাকরণরা কাছেই গঙ্গা পশ্য করেই আসুনগে।

অতএব জিনিসপত্র হরেকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণের হেপাজতে রেখে বাবাকে দূর থেকে প্রণাম করে সবাই চললেন গঙ্গার ধারে।

চারদিক লোকারণ্য। জগন্নাথদেবের বেদিমন্ডপ থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত শুধু লোক আর লোক। দোকানপাটও বসে গেছে অনেক। কাপড় জামা খেলনা তেলেভাজা পাঁপড়ভাজা ঝুরিভাজা উড়েঠাকুরের ভাতের হোটেল মিষ্টির দোকান, ডাব তরমুজও বাদ যায়নি। চিঁড়ে দই মুড়ি মুড়কি আর কলার দোকানও অনেক। তাছাড়া ধামা কুলো চালনি বঁটি কাটারি ইত্যাদির দোকান বসেছে এখানে-ওখানে। আর খাঁচায় ভরা বুলবুলি, ময়না দাঁড়ে বসা কাকাতুয়া চন্দনা লালমোহন আরো হরেকরকমের পাখি এনেছে পাখিওলারা। ভিখিরীরাও সুযোগ ছাড়েনি। কাপড় পেতে বসে গেছে ভিক্ষা করতে। কোথাও একতারা বাজিয়ে বোষ্টম গান ধরেছে:

'ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদমতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচকে হেসে নয়ন ঠেরে কুলের বউ ভুলায়॥'

বেণীমাধব সদলবলে গঙ্গার ধারে এসে দেখেন, সেখানেও বেশ ভিড়। বোট বজরা পানসি ডিঙি আর জেলে নৌকোয় গঙ্গার কিনারায় জল আর দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে বোট বজরা আর পানসির ভিড়ই যেন বেশি। পয়সাওলা বাবুরা এসেছেন ওপারে সুতোনুটি গোবিন্দপুর কলকেতা থেকে। তাছাড়া বহু যাত্রী এসেছে গঙ্গা পার হয়ে খড়দ পেনেটি কামারহাটি আরো বহু গ্রাম থেকে।

বেণীমাধব খোকনমণিকে কাঁধে করে নিলেন। তাঁর চাদরের এক কোণ ধরে পেছন-পেছন চললো বাসনাময়ী। তাঁর হাত ধরেছেন মনোমোহিনী এবং মোক্ষদাসুন্দরী ধরেছেন মনোমোহিনীর শাড়ির আঁচল! কোনরকমে ভিড় ঠেলে ঠেলে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা গঙ্গার কিনারায়! নেমে গিয়ে গঙ্গার জল স্পর্শ করা খুব সহজ কাজ বলে মনে হলো না কারোরই।

বেণীমাধব বললেন বাসনাময়ীকে, খোকাকে নিয়ে দাঁড়াও এখানে, আমি বরং চাদর ভিজিয়ে এনে তোমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিই গঙ্গাজল।

তাই হোক।

মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এক জায়গায়। বেণীমাধব আস্তে আস্তে নেমে গেলেন গঙ্গার কিনারায়।

তবে গঙ্গায় দ্রষ্টব্যের অভাব নেই। বিশেষ করে বজরা আর পানসিগুলো সবই প্রায় সরগরম। অন্য সব নৌকোর যাত্রীরা নেমে যাওয়ায় নৌকাগুলো খালি, নদীর মৃদু ঢেউয়ে তারা হেলছে-দুলছে। মাঝিরা কেউ উঠেছে ডাঙ্গায় মেলা দেখতে, কেউবা সটান হয়ে শুয়ে আছে পাটাতনে। কিন্তু বজরা পানসির যাত্রীদের অনেকেরই ডাঙ্গায় উঠবার নামই নেই। তাদের পোশাক-আষাক আচার-আচরণ কথাবার্তা সবই যেন একটু ভিন্ন রকমের। এরা নাকি সুতোনুটি গোবিন্দপুর কলকেতার বাবুরা! সেখানকার সব পয়সাওলা বাবুরা। তীর্থ করতে নয়, মেলা দেখতে আর মজা করতে এসেছেন। বজরার ছাতে বাবু সেজেগুজে বসে আছেন আর ঘনঘন মদ গিলছেন। আর তাঁকে ঘিরে চলেছে ইয়ার বন্ধুদের হৈ-হল্লা! বাঈজী নাচও হচ্ছে ঝুমুর ঝুমুর। কোনো কোনো বজরা থেকে ভেসে আসছে সুরেলা গলায় বেসুরো গান ঃ

'যাবি যাবি যমুনা পারে ওলো রঙ্গিণী—
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শ্যামা বামা দোকানী!
কিনে দেবো মাথাঘষা, বারুইপুরে ঘুন্সি খাসা
উভয়ের পুরাবি আশা, ওলো সোনামণি।'

অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বজরা আর পানসির মজা দেখছিলো। দেখছিলেন মনোমোহিনী মোক্ষদাসুন্দরীও। বাসনাময়ীও খোকনমণিকে কোলে নিয়ে ঘোমটাটা সামান্য টেনে দিয়ে দেখছিলো সব কান্ডকারখানা। পাড়াগাঁয়ের মেঠো চোখে এসব তো দেখবারই জিনিস। আর তীর্থ করতে এলেও নতুন কিছু দেখবার জন্যেই তো এতো পয়সা খরচ করে আর কষ্ট করে আসা।

তবে মোক্ষদাসুন্দরীই প্রথমে মুখঝামটা দিলেন: মরণ আর কি! মুখপোড়া মিন্সেরা এখেনে তীথ করতে এয়েচে না খানকি নাচাতে এয়েচে।

মনোমোহিনী বললেন, ঘরের মাগ ছেলেপুলে আনেনি সঙ্গে?

মোক্ষদাসুন্দরী জবাব দিলেন, বোধহয় না। ফুর্তি তাতে জমে না, তাই।

কিন্তু বাবুদের ঐসব বেলেল্লাপনা দেখে বাসনাময়ী যেন শংকিতই হলো। বললো, কই, খোকনের বাবা এখনও ফিরচে না কেন?—ঘাটের কিনারায় লক্ষ্য করে বললো, ভিড়ে দেখতেও তো পাচ্চিনে।

বাসনাময়ী একটু উদ্বিগ্ন হয়েই এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখে তার বাঁদিকে অদূরে এক গাছতলায় খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ফরসা করে এক বাবু, হাতে ছড়ি বুকপকেটে কোঁচা গোঁজা—তারই দিকে চেয়ে আছে। আর তার সঙ্গের দু'তিনজন লোক বাবুটাকে যেন কী বলছে। বাবুর চোখে চোখ পড়তেই বাসনাময়ী তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে ঘোমটা টেনে দিলো: আ মর মিন্সে! হাড়গিলের মতো চেয়ে আছে দেখো। যেন গিলে খাবে।

বাসনাময়ী আস্তে-আস্তে সরে গিয়ে মোক্ষদাসুন্দরীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। গা-টা যেন ছমছম করছে। আর, খোকনের বাবাই বা গেলো কোথায়?

যাক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়লেন বেণীমাধব। হাতে ভেজানো চাদর: এই নাও সব গঙ্গাজল, মাথায় নাও, বসো।

তিনজনই পা ঢাকা দিয়ে বসলেন। খোকনকে কোলে নিয়ে বাসনাময়ী তার আঁচলে দিয়ে ঢেকে দিলো পা দুটো। বেণীমাধব চাদর নিংড়ে সবার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন গঙ্গাজল।

এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো বাসনাময়ী: নাও, চলো যাই গাড়ির ওখানে, খোকনের খিদে পেয়েচে।

সবাই ফিরে চললেন গাড়ির দিকে।

কিন্তু তাঁদের প্রায় পেছনে-পেছনেই একটি লোকও যে চলছিলো ঐ গাড়ির দিকেই তা কেউ জানতেই পারলো না। এবং গাড়ি পর্যন্ত গিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আবার ফিরে গেলো সে গঙ্গার ধারে গাছতলায় সেই বাবুটির কাছে।

সন্ধ্যা হতেই অন্ধকার। শুধু মেলায় দোকানগুলোতে আলো টিমটিম করছে। তাছাড়া বেণীমাধব বা তাঁর দলের সবাই ক্লান্ত। কাজেই সেরাত্রে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা না করে দোকান থেকে চিঁড়ে গুড় দই কলা দিয়ে

ফলার করলেন সবাই। তারপর চাদর-কাপড় দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে এবং গাড়ির খড় মাটিতে বিছিয়ে তার উপর কাপড় বিছিয়ে শোবার জায়গা করা হলো। মেয়েরা খোকনমণিকে মাঝে রেখে ঘেঁষাঘেঁষি করে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটু দূরে শুলেন বেণীমাধব। হরেকৃষ্ণ আর প্রাণকৃষ্ণ গরুর গাড়িতেই লম্বা হলো। আর গলায় দড়ি বাঁধা গরু চারটে কাছেই শুয়ে ঝিমুতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দেওয়ায় তাদের গলার ঘণ্টি বাজতে লাগলো—টুং টাং টুং টাং।

মেলার যাত্রীদের সকলেরই শয়নব্যবস্থা প্রায় এই রকমই। তবে কেউ কেউ ওরই মধ্যে একটু ভালো জায়গা কোথাও বেছে নিতে পেরেছে। নৌকোয় যারা এসেছে তারা করেছে নৌকোর মধ্যেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা।

অনেক রাত্রে মেলা একটু নিঝুম হলেও সারারাত্রি লোক চলাচলের বিরাম রইলো না। হৈচৈ-এর মাত্রা একটু কম হলো, এই যা।

এবং ভোররাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো।

হুড়মুড় করে উঠে পড়লো লোকজন। আবার হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। যে যার জিনিসপত্র সামলাতে ব্যস্ত। চারদিকে দেখা দিলো জল আর কাদা। দুর্দশার একশেষ। তা তীর্থ মানেই তো কষ্ট। আর কষ্ট করলে তবেই তো ইষ্টলাভ হয়।

আর সেরাত্রে মাণিকপুরে মনোমোহিনীর ছেলে উমাচরণ মোক্ষদাসুন্দরীর মেয়ে মানময়ীর ঘরে সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত কাটিয়ে হাই তুলতে তুলতে বেরুলো বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে।

দীনু ঘোষাল জানলেন, ছেলে গেছে ওপাড়ায় বেণীমাধবের বাড়ি পাহারা দিতে। ছেলেটা পরোপকারী হয়েছে যেন।

পরদিন ভোর হতেই জগন্নাথের বেদীমণ্ডপে ভিড় জমতে লাগলো। গঙ্গায় স্নান সেরে অনেকেই পুজো নিয়ে জমা হয়েছে সেখানে। বেণীমাধব আর মেয়ের দলও গঙ্গায় গেলো স্নান করতে। বাসনাময়ী গত সন্ধ্যার সেই গাছটার দিকে একবার দেখলো। না, সেই বাবুটি আজ আর নেই।

পুজো দিতে হবে। তাই সকলেরই উপোষ। শুধু খোকনমণিকে কিছু খাওয়াতে হলো স্নান সেরে এসে। আর হরেকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণকে খাওয়ার জন্যে পয়সা দিয়ে যেতে হলো। নিজেরা ওবেলা পুজো সেরে এসে যাহোক কিছু সেদ্ধ করে খেলেই হবে।

বেদীমন্ডপের কাছে সদলবলে প্রায় এক প্রহর বেলায় এসে বেণীমাধব দেখলেন ভিড় যেন জমাট বেধে আছে। ব্যাপার কি?

বেণীমাধবের পাশেই দাঁড়িয়েছিলো একটা লোক। দোহারা চেহারা বয়েস তিরিশের উপরে, গায়ে ফতুয়া, বললো, আর বলেন কেন? বোধহয় দশআনীর জমিদারবাবুরা এখনও পৌঁছোয়নি! তা মশায়ের নিবাস?

বেণীমাধব বললেন, হুগলী জেলায় মানিকপুর গাঁয়ে।

—মশায়ের নাম?—আবার প্রশ্ন।

—শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।—এবার বেণীমাধব জিগ্যেস করলেন, আপনার নিবাস জানতে পারি কি?

—বিলক্ষণ। এই ওতোরপাড়ার কাছেই। নাম শ্রীরামহরি চক্কোত্তি।

—ও, আপনিও ব্রাহ্মণ?—বেণীমাধব বললেন, যাক ভালোই হলো। বিদেশ-বিভূঁয়ে পরিচয় থাকা ভালো।

—অবশ্যই!—রামহরি কৃতার্থের হাসি হাসলো: বিশেষ করে এতোগুলি স্ত্রীলোক সঙ্গে এনেচেন যখন!

বেণীমাধবের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দলীয় স্ত্রীলোকেরা সবই শুনছিলেন ঘোমটার মধ্যে দিয়েই। যেন একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালেন তাঁরা।

—তা আপনি কি একলাই এসেচেন?—বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন।

শুনে রামহরি হো-হো করে হেসে উঠলো: আজ্ঞে না মশায়! স্ত্রীলোক ছাড়া কি পুরুষদের তীর্থ করা হয়ে ওঠে, না তাঁরা স্বামীকে অনুমতি দিয়ে থাকেন? গৃহিণীর প্ররোচনায় আমাকে প্রতিবছরেই এই স্নানযাত্রায় আসতে হয়, এবারও গৃহিণীসহ এসেচি। তবে তিনি কিছুদিন আগে শক্ত ব্যায়রাম থেকে ওঠায় কেবরেজমশায় তাঁকে ভিড়ের মধ্যে আসতে নিষেধ করে দিয়েচেন। তাই তিনি নৌকোতেই বসে বাবাকে প্রণাম জানাচ্চেন এবং জানান দিচ্চেন, তিনি এসেচেন। আর আমাকে পুজো দিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েচেন।

বেণীমাধব বুঝলেন লোকটি রসিক। হেসে বললেন, মশায়ের ঘরণী খুবই ধর্মভীরু মনে হচ্চে এবং আপনাকেও সৎ গৃহস্থ বলেই মনে হচ্চে।

—আজ্ঞে, হতে হয়েচে।—রামহরি আবার হাসলো হো-হো করে।

বেণীমাধবের পেছনের ঘোমটা-ঢাকা মূর্তিগুলিও আবার ঈষৎ হেলে দুলে দাঁড়ালো।

বেণীমাধব বললেন, যাক, ভালোই হলো। মশায়ের যখন এখানে প্রতি—

বছরেই আসা-যাওয়া আছে তখন আপনার সহায়তা পেলে খুবই উপকৃত হই।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!—রামহরি গদগদ হয়ে উঠলো: এ তো অতি সামান্য কথা! মানুষের কর্তব্যই তো উপকার করা।

বেণীমাধব এবার জিগ্যেস করলেন, তা বাবার এই স্নান কখন নাগাদ হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—ঐ যে বললাম!—রামহরি বললো, দশআনীর জমিদারবাবুরা আসবেন, তাঁরা আগে বাবার মাথায় জল ঢালবেন, তবে তো। তারপর কলসী-কলসী জল ঢালা হবে। চিঁড়ে দই মুড়ি মুড়কি চাটিম কলা পড়বে পাহাড়প্রমাণ। ফুলে ফলে বাবা একেবারে ঢেকে যাবেন। সে এক দেখবার জিনিস!

বেণীমাধব একটা অধৈর্যের ভাব চেপে বললেন, সেইজন্যেই তো আসা!

—ভালোই করেচেন!—রামহরি বললো, এসব ক'জনের ভাগ্যে হয় বলুন? তবে একটু কষ্ট করতে হবে, এই যা। এসব হতে বেলা দুপহরও হতে পারে, আবার বেলা গড়িয়েও যেতে পারে। তারপর পেসাদ পাওয়া, গান-বাজনা নাচ-তামাশা কত কি আছে। বিকেলে গঙ্গায় বাচ-খেলাও দেখবার জিনিস।

এমন সময় একটা হৈ হৈ শোনা গেলো। জমাট ভিড়ের কালো-কালো মাথার উপর দিয়ে যেন কয়েকটা ঢেউ বয়ে গেলো।

—কী ব্যাপার? কী হলো?

—বোধহয় বাবুরা এলেন!—রামহরি বললো।

বেণীমাধব শুনে মনে-মনে বললেন, বাবা দেখা দিয়ো।

—চলুন, চলুন, এগিয়ে চলুন।—রামহরি ঠেলা দিলো বেণীমাধবকে। বেণীমাধবও পেছন ফিরে বললেন, এগোও।

কিন্তু তার আগেই চাঞ্চল্য যেন কমে গেলো। থেমে গেলো কলরব।

আবার সকলের প্রশ্ন: কী হলো? কী ব্যাপার?

এবং একান-ওকান হয়ে খবর জানা গেলো, ব্যাপার কিছুই নয়। একটা ষাঁড় নাকি তরমুজের খোলা খাবার জন্যে সামনের একটা লোককে গুঁতো দিয়ে ফেলে দিয়েছে, তাই এই হৈচৈ।

রামহরি বিজ্ঞের মতো বললো, হুঁ! এই ব্যাপার! এ তো প্রতিবছরেই ঘটে। বাবার দেখা পেতে হলে অমন একটু গুঁতোগাঁতা তো খেতেই হবে।

বেণীমাধব শুধু বললেন, হুঁ।

আর মনে-মনে ভাবলেন, ভাগ্য ভালো, বুদ্ধি করে খোকনমণিকে হরে-কৃষ্ণদের কাছে রেখে এসেছেন। নইলে এই ভিড়ে—

হঠাৎ শুরু হলো বৃষ্টি।

প্রথমে ছিটেফোটা হতে হতেই একেবারে ঝমঝম করে শুরু হলো। আশেপাশের কিছু লোক ছুটে গিয়ে কাছাকাছি গাছতলায় আশ্রয় নিলেও বেশির ভাগ লোকই ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো। উপায় কি? যেটুকু এগিয়ে থাকা গেছে সরে গেলে আর ঐ জায়গাটুকুও পাওয়া যাবে না।

রামহরি বললো, দেখচেন মশায়, বাবার পরীক্ষা?

—হুঁ, দেখচি তো তাই।—বেণীমাধব বেশ চিন্তিত।

অবশ্য বৃষ্টি থামলো একটু পরেই। চারিদিকে কাদা প্যাচপেচে হয়ে গেলো।

রামহরি বললো, বাবা ধৈর্যের পরীক্ষাও নিচ্চেন।

—হুঁ।

—আরো কত পরীক্ষা নেবেন কে জানে।

—তাই তো দেখচি।

সত্যিই বুঝি পরীক্ষাই চললো। একটু পরেই আকাশের মেঘ গেলো সরে। দেখা গেলো প্রায় মাথার উপরে সূর্য। ভিজে সূর্য ক্রমেই যেন শুকনো হলো, ক্রমে গরম হয়ে উঠলো। দেখা দিলো চারদিকে খটখটে রোদ্দুর।

সকলের ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেলো দিব্যি।

শেষে চড়চড়ে রোদ্দুর। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ঘামে সকলের গা জবজবে হয়ে গেছে। মাথার উপরে উড়নি চাদর গামছা যে যেমন পেরেছে চাপিয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকাও যেন যায় না। পা ভারি হয়ে আসছে, ব্যথা করছে। কোমর টনটন করছে যেন। অনেকেই বসে পড়লো। মওকা দেখা দিলো ডাব-তরমুজওলাদের। তারা ভিড়ের মধ্যে ডাব আর তরমুজ এনে ডবল দামে হাঁকতে লাগলো। তাই সই, তেষ্টায় ছাতি ফাটে ফাটে।

কিন্তু অনেকেই ডাব তরমুজের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো, কেউবা দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলো। নির্জলা উপবাস করে বাবার পুজো দিতে এসে জলগ্রহণ করাও পাপ। কাজেই কষ্ট করা ছাড়া উপায় কি? আর এই একটা দিন বই তো নয়।

শেষপর্যন্ত বেশ বেলা করেই দশআনীর জমিদারবাবুরা এলেন। চারদিকে

চাঞ্চল্য দেখা দিলো। হ্যাঁ, এবার সত্যিই এসেছেন তাঁরা। আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তাঁরা আগে বাবার মাথায় জল দিলেই—

একটু পরেই শুরু হয়ে গেলো ঠেলাঠেলি।

রামহরি বললো, এবার এগোনো যাক।

—চলুন।

বেণীমাধব এবং পেছনে তাঁর দল এগোতে লাগলো। পেছনের মেয়ে পুরুষের ভিড়ের চাপেই তাঁরা যেন এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ঠেলা খেতে খেতে ক্রমেই তাঁরা বেদীমণ্ডপের কাছে এসে পড়লেন। বেণীমাধব ধরেছেন রামহরির কোমরের কসি। বাসনাময়ী বেণীমাধবের চাদর। মোক্ষদাসুন্দরী আর মনোমোহিনী বাসনাময়ীর আঁচল।

- আসুন, ভয় নেই, এগিয়ে আসুন।—রামহরি অভয় দিলো।

বেদীমণ্ডপের ধারে তাঁরা এসে পড়লেন একসময়ে।

—এইবার দিয়ে দিন পুজো এখানে পাণ্ডার হাতে।—নির্দেশ দিলো রামহরি।

সবাই তাই করলেন। রামহরিও।

—দাঁড়ান, প্রসাদ নিন।

পাণ্ডা নৈবেদ্য নিয়ে কিছুটা ফেরত দিলো। কিন্তু বাবা? বাবা জগন্নাথ যে ফলে ফুলে নৈবেদ্যতে প্রায় ঢাকা।

—ঐ দেখুন, বাবার কালোরূপ আলো করে আছে। ঐ যে মাঝে সুভদ্রা, ওপাশে বলরাম। প্রণাম করুন।—সব রামহরির নির্দেশ।

সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছিলেন। এমন সময় পেছন থেকে এলো একটা দমকা ধাক্কা। হাত-জোড় করতে গিয়ে বাঁধনছাড়া হয়েছিলেন, হঠাৎ-ধাক্কায় সবাই ছিটকে গেলেন এদিক-ওদিক। আলাদা হয়ে মিশে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। বেণীমাধব কোথায়? বাসনাময়ী কোথায়? কোথায় মনোমোহিনী? মোক্ষদাসুন্দরী? আর রামহরি?

সকলেই এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন, খুঁজতে লাগলেন, আর ভিড়ের ঠেলায় ক্রমেই এদিক-ওদিক সরে যেতে লাগলেন। শেষে মনোমোহিনী দেখেন কাছেই দাঁড়িয়ে মোক্ষদাসুন্দরী। ওরে মোক্ষদা।—বলে হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। মোক্ষদাসুন্দরীও।

কিন্তু বেণীমাধব? বাসনাময়ী?

বাসনাময়ীকেও পাওয়া গেলো। তার বাঁ হাতখানা রামহরির শক্ত মুঠোর

মধ্যে ধরা। কে'দে ফেললো বাসনাময়ী। লজ্জাশরম ত্যাগ করে পাগলের মতো রামহরিকে বললো, আমার স্বামী কোথায়? ডেকে দিন।

—আসচেন তিনি।—রামহরি বাসনাময়ীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, আপনাদের আর দুজন মেয়েছেলেকে খংজে আনতে গেলেন উনি। আমাকে বললেন, আপনাকে নিয়ে ওখানে দাঁড়াতে।

রামহরি প্রায় টানতে টানতে বাসনাময়ীকে নিয়ে এলো ভিড়ের বাইরে একটা দোকানের পেছনে। বললো, ভয় পাবেন না। এখুনি আসবেন আপনার স্বামী।

কিন্তু বেণীমাধবের দেখা নেই।

—কই, কোথায়? কই, এলো না তো।—বাসনাময়ী ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠলো।

রামহরি বললো, তাই তো দেখচি।—মুখখানায় চিন্তার রেখা: অথচ আপনাকে ফেলে তো যেতেও পারচিনে।—বলেই বললো, বরং এক কাজ করা যাক। আপনি আসুন, নৌকায় আমার স্ত্রীর কাছে বসুন। আমি চট করে তাঁদের নিয়ে আসি। দেরি করলে ভিড়ে শেষে খংজে পাওয়া যাবে না।

—তাই করুন। যা হয় করুন।—বাসনাময়ী বললো।

—আসুন তবে।—রামহরি আর দাঁড়ালো না। বাসনাময়ীকে নিয়ে কাছেই গঙ্গার ধারে জলের কিনারায় নামলো।

একটু দূরেই একটা বজরা বাঁধা। ঢেউয়ের তালে তালে হেলছে দুলছে নাচছে। মাঝিরা বসে আছে হালের কাছে। ঝিমুচ্ছে। বজরায় হয়তো বা ঘুমুচ্ছে রামহরির অসুস্থ স্ত্রী। জানলাগুলো বন্ধ। বুঝি বৃষ্টির জন্যে।

—আসুন, সাবধানে আসুন।—রামহরি বাসনাময়ীকে সাবধান করেই চেঁচালো: ওরে মাঝি, নৌকোটা চেপে ধর না বাবা।

একজন মাঝি মাটিতে নেমে এসে বজরার মুখটা চেপে ধরলো। বাসনাময়ী রামহরির নির্দেশমতো পাটাতনে উঠলো। রামহরিও উঠলো: চলুন, ভেতরে চলুন।—আবার হাঁক দিলো: ওগো বেরিয়ে এসো, দেখো—চলুন, ভেতরে চলুন—

বাসনাময়ী কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বজরার মধ্যে সাবধানে দু'এক পা নামলো। ব্যস।···রামহরি হঠাৎ পেছন থেকে কোঁচার কাপড় দিয়ে বাসনাময়ীর মুখ চেপে ধরে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে এনে পর্দা সরিয়ে শুইয়ে ফেললো গাদিপাতা ফরাশের উপর।

বাসনাময়ী থরথর করে কেঁপে উঠলো। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো তার। আর সজলচোখে দেখলো মদের গেলাস হাতে এক বাবু তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

সেই বাবু! বাসনাময়ী চিনতে পারলো, কাল সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে যে বাবুটা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলো।

আর একটা লোক এসে কাপড়ের মোটা ফেটি দিয়ে বেঁধে ফেললো বাসনাময়ীর মুখ। আর রামহরি পিছমোড়া করে বাঁধলো তার দুহাত তারই শাড়ির খানিকটা খুলে নিয়ে। বাসনাময়ী ছটফট করতে লাগলো।

বাবু মদের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে হেসে বললো, এসো, আমার চাঁদবদনি এসো! —বলেই গুরুগম্ভীর গলায় বললো, সাবাস বাহাদুর! এই লেও—

রামহরির দিকে এগিয়ে দিলো অর্ধেক-খালি-করা মদের বোতলটা।

একটু পরেই একবার দুলে উঠলো বজরাটা। তারপর ঘুরলো যেন একটু। আর আওয়াজ হতে লাগলো দাঁড় বাইবার ঃ ছপ ছপ ছপ ছপ।

মাথাটা ঘুরে উঠলো বাসনাময়ীর। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়লো বাবুর পায়ের কাছে ফরাশের উপরে। নরপিশাচের সামনে পড়ে রইলো নারীদেহের নৈবেদ্য।

আর মাহেশে বেদীমণ্ডপে পাহাড়প্রমাণ নৈবেদ্যর আড়াল থেকে বাবা জগন্নাথ কাণ্ডটা দেখতে পেলেন কি না কে জানে। আর দেখলেও, ঠুঁটো ঠাকুরটির পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর ছিলোও না হয়তো। তাই বুঝি এই সংসারের নৈতিক দাঁড়িপাল্লায় সব সময়েই পাপ পেজোমি অন্যায় অবিচারের ওজনটাই হয় বেশি।

৩০

ঐদিন সকালে মানিকপুরের চণ্ডী মিত্তিরের ছেলে গোবিন্দ মিত্তির ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো বাড়িতে।

বহুদিন পরে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ঢুকতেই অনেকেরই অনেকরকম প্রশ্ন শুরু হলো ঃ কি রে, কি খবর? কেমন আছিস? কেমন আছো বাবা? এখন আছিস তো? তুই তো এখন বড়লোকের জামাই! তোর সঙ্গে কার কথা? ইত্যাদি—

গোবিন্দও ঘোড়ায় চেপে উত্তর দিতে লাগলো আর এবাড়ির ওবাড়ির

খবর নিতে নিতে এগিয়ে চললো ঃ কি রে, কেমন আছিস ? যাক, বেঁচে আছিস এখনো ! খুড়ো ভালো তো ? খুড়ীমা কেমন আছেন ? এই এলাম, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ··ইত্যাদি ইত্যাদি—

গোবিন্দের ঘোড়া এগিয়ে চললো বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে, পুকুরের কাঁচা পাড় দিয়ে, পুকুরঘাটের ধার দিয়ে কিংবা কারোর গোয়ালের পাশ দিয়ে। আর তার ঘোড়ার পেছন পেছন চললো গাঁয়ের কতকগুলো ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে। তাদের চোখে এমন জলজ্যান্ত ঘোড়া একটা নতুন জিনিস, ঘোড়সওয়ার মানুষটাও।

আর গোবিন্দের পেছনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো নানারকমের মন্তব্য ঃ ছোঁড়াটা কোনো মতলবে এসেচে নিশ্চয়ই। বেশ আছে চণ্ডী মিস্তিরের ছেলে! অথচ মিস্তিরের মাগ মেয়ে খেতে পায় না। ভাগ্যিস কুলীনের ঘরে জন্মেছিলো তাই কপাল ফিরে গেলো। মাইরি, গোবিন্দদার চেহারাটা ফিরে গেচে কিন্তু! হবে না ? বড়লোকের ঘরজামাই এখন !···আরো অনেকরকম আলোচনা ও সমালোচনা।

তা গোবিন্দ মিত্রের চেহারাটি বদলে গেছে সত্যিই। মোটা হয়েছে বেশ। গায়ের রংটাও যেন হয়েছে মাজা-মাজা। তেড়ির বাহারও খুব। গোঁফজোড়া যেন প্রজাপতি। গায়ে সিল্কের বেনিয়ান। পরনে চওড়া কালো পাড় কাঁচি ধুতি। গলায় সোনার হার।

অথচ গরীবের ঘরের ছেলেই গোবিন্দ।

শুধু কপালজোরে, ঠিক কথায়, জন্মের জোরে গোবিন্দ কঠিন মর্ত থেকে প্রায় এক লাফে স্বর্গে গিয়ে হাজির হলো। আর যোগাযোগটাও ঘটলো এক অদ্ভুত উপায়ে।

ফুলপুরের জমিদার সর্বময় চৌধুরী ফিরছিলেন পালকি করে মহাল থেকে। পথে মাঠের মাঝখানে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। কাছেই ছিলো একটা বিরাট বটগাছ। সর্বময় চৌধুরীর নির্দেশে পালকি বেহারারা তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় নিলো আশ্রয়। মুহুরী চণ্ডী মিস্তির কাছারী থেকে ফেরবার পথে বৃষ্টি নামার আগে থেকেই সেই গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন একটা ছেঁড়া ছাতো মাথায় দিয়ে।

এমন সময় সর্বময় চৌধুরীর পালকি এসে থামলো সেখানে। চণ্ডী মিস্তির একটু চঞ্চল হলেন একজন বড়লোকের হঠাৎ আগমনে। বেহারাদের কাছে নীচু গলায় পরিচয় নিলেন ঃ কে রে ?

শুনে একজন বেহারা নীচু গলায় বললো, ফুলপুরের সব্বময় চৌধুরী মশায়।

হুঁ। নামটা কানে এসেছে চণ্ডী মিত্তিরের, তবে সাক্ষাৎ ঘটেনি কখনো। তবে সাক্ষাৎ ঘটতে দেরি হলো না।

বৃষ্টিটা একটু কমতেই সর্বময় চৌধুরী নিজেই বেরিয়ে এলেন পালকি থেকে। কোমরটা একটু সোজা করে নিতে বোধহয়। এবং সামনেই একজন অপরিচিত লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনিও প্রশ্ন করলেন, মশায়ের নিবাস?

এবং নিবাস নাম ইত্যাদি বিবরণ জানবার সময় যখন জানলেন কুলীন চণ্ডী মিত্তিরের দুটি পুত্র বিদ্যমান তখন তিনি যেন একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে উৎসুক হলেন। এমন কি, তাঁর সঙ্গে পালকিতে ফুলপুরে গিয়ে আহারাদি করবার আমন্ত্রণও করে বসলেন।

ফুলপুর কাছেই। তার উপর এক ধনী ভদ্রলোকের ঐকান্তিক ইচ্ছা, অতএব চণ্ডী মিত্তির রাজি হলেন ; এবং সেই দিনই সর্বময় চৌধুরী তাঁর ধন-ঐশ্বর্যের সঙ্গে কন্যাটিকে দেখিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করায় তাতেও রাজি হতে হলো তাঁকে। তবে প্রথমটা আমতা-আমতা করেছিলেন বৈকি :

—দেখুন চৌধুরী মশায়, আপনি ধনী, আমি—

—আপনি কুলীন!—চৌধুরী মশায় যেন থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলেন চণ্ডী মিত্তিরকে : জানেনই তো, কৌলীন্যের সঙ্গে অর্থের কোনো তুলনাই হয় না। আপনি ওসব মনেও স্থান দেবেন না।···মিত্তির মশায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—আজ্ঞা করুন।

—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এযাবৎ ক'টি কুলীনকন্যার কুলরক্ষা করেচেন?

চণ্ডী মিত্তির একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তা বেশি নয়। কারণ আমার পুত্রটির বয়েসও খুব বেশি নয়। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে কুল করতে হয়, তাই নসীবপুরের কুলীন ভবানীচরণ ঘোষ মশায়ের কন্যার সঙ্গে তার প্রথম বিবাহ হয়েচে। আরো দুটি মাত্র কুলীনকন্যা, আর যতটা মনে পড়ে, মাত্র তিন ঘর মৌলিকের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটেচে। আর আমার কনিষ্ঠপুত্রটি—

সর্বময় চৌধুরী তাড়াতাড়ি বললেন, থাক, আপনার কনিষ্ঠপুত্রটির বিষয়ে আমি উৎসুক নই। কারণ আমাদের এই চৌধুরীবংশকে বহুদিন থেকেই লোকে আদ্যরসের ঘর বলে জানে, তাই আমি সে সুনামটুকু—

—সে তো বটেই !—চণ্ডী মিত্তির বললেন, বিশেষ করে আপনি ধনী, আর নিজের বংশে কলংক লেপন করা নিতান্তই পাপ। তাছাড়া আমার কনিষ্ঠপুত্রের দিয়ে আপনার বংশের সে সুনাম রক্ষা করা সম্ভবপরও নয়।

সর্বময় চৌধুরী এবার জিগ্যেস করলেন, আসল প্রশ্নটাই কিন্তু করা হয়নি। আশাকরি আপনি বুঝেচেন —

—বিলক্ষণ।—চণ্ডী মিত্তির বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আমার এখনও পৌত্রের মুখ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া আপনাকে আমার বৈবাহিকদের নাম নিবাস সবই জানাবো, লোক মারফত সঠিক খবরাখবর নিতে পারেন।

সর্বময় চৌধুরী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, সে তো যথাবিহিত ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে আমার আর একটি বিশেষ অনুরোধ আশাকরি আপনি ফেলবেন না।

চণ্ডী মিত্তিরও যেন একটু চিন্তিত ঃ আমি সে বিষয়েও চিন্তা করচি।

সর্বময় চৌধুরী এবার চণ্ডী মিত্তিরের হাত দুখানি ধরে বললেন, আপনি বুঝচেন সবই। আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের ইতিমধ্যেই কয়েকটি সংসার হয়েচে। সেক্ষেত্রে বিবাহের পর আপনার পুত্রের প্রথম পুত্রসন্তানটি যদি আমার কন্যার গর্ভেই না জন্মায় —

—সে তো বুঝচি।—চণ্ডী মিত্তির বেশ চিন্তিত ঃ নইলে আদ্যরসের কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু—

সর্বময় চৌধুরী তাড়াতাড়ি বললেন, আর আপনার কনিষ্ঠপুত্রটি তো আপনার কাছেই থাকলো। তাছাড়া আমার কন্যার একটি পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্তই যে ক'টা দিন আমার কাছে রাখার দরকার তাই রাখবো মিত্তির মশায়। তারপর যদি মনে করেন, আপনার পুত্র আপনার কাছেই থাকবে।

চণ্ডী মিত্তির ম্লান হেসে বললেন, তখন কি আর ছেলে এখানের এই সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে গরীব বাপের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকতে চাইবে? এরকম ঘটনা যে অনেক ঘটে, তা তো আপনিও জানেন চৌধুরী মশায়।

—জানি বৈকি!—চৌধুরী মশায় বললেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? আর, কুণ্ঠাবোধ করলেও বলতেই হচ্চে, আপনার দাবি আমি যথাসাধ্য —

শুনে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন চণ্ডী মিত্তির ঃ দাবি নয়, দাবি নয়, বিবাহের বরপণ বলুন।

—আচ্ছা, তাই-ই হলো।—সর্বময় চৌধুরী হাসলেন।

অর্থাৎ চন্ডী মিত্তির বেশ একটা মোটা টাকাই পেলেন এবং বড় ছেলে গোবিন্দকে একদিন বর সাজিয়ে সদলবলে দিয়ে এলেন ফুলপুরের সর্বময় চৌধুরীর বাড়িতে। এবং সেই থেকে গোবিন্দ শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে, ঠিক কথায়, ধর্মের ষাঁড় হয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করতে লাগলো ফুলপুরে। তবে চৌধুরী মশায়ের দুজন বিশ্বাসী কর্মচারী সব সময়েই জামাই-বাবুর গতিবিধির উপর বেশ গোপন অথচ তীক্ষ্ম নজর রাখলো। আর যাই করুন, তিনি যেন তাঁর পুরোন কোনো কুলীন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রাত না কাটিয়ে আসেন।

আর এদিকে মানিকপুরে মোক্ষদাসুন্দরী ক'দিন কেঁদেকেটে ভাসালেন। হাজার হোক মা তো! ছেলে-বেচা টাকা এলো ঘরে বটে তবে ঘরখানা তো ফাঁকা হয়ে গেলো। এতদিন টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের মুখে খুব ভালো-মন্দ কিছুই তুলে দিতে পারেননি। আজ ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় সংসারের টানাটানিটা কমলো বটে তবে আর কি ছেলের টান থাকবে এই বাবা মা ভাই বোন বাড়ি ঘরদোরের উপর? আর সেটাকাই বা ক'দিন!

কিন্তু গোবিন্দ মিত্তির এলো। এলো বড়লোকের জামাই হয়ে ঘোড়ায় চড়ে। এলো বাড়ির টানে নয়, গেছলো শ্বশুর সর্বময় চৌধুরীর একটা মহালে খাজনার ব্যাপারে তদারক করতে, তাই ফেরবার পথে একবার···! অবশ্য সঙ্গে আছে তার দুজন পেয়াদা আর সরকার মশায়। তারা গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই নবীন কুন্ডুর মুদীর দোকানে বসে জিরুচ্ছে। আর জামাইবাবু যখন এখুনি চলে আসবেন তখন দোকানে বসে একটু ধূমপান আর 'মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার' করাটা মন্দ কি? আর গোবিন্দরও ইচ্ছে ছিলো না বাপের ভাঙা ঘরবাড়িগুলো তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে দেখায়।

চন্ডী মিত্তিরের ছোট ছেলে নিতাই যখন মারা গেলো তখন গোবিন্দ শ্বশুরবাড়িতে সে খবর পেলেও আসেনি। শ্বশুর-শাশুড়ী অবশ্য বলেছিলেন, বাবাজী, এসময়ে একবার বাড়িতে ঘুরে আসবে তো এসো। কিন্তু গোবিন্দ বলেছিলো, না, কান্নকাটি আমার বড়ো সহ্য হয় না। তবে চন্ডী মিত্তির যখন মারা গেলেন তখন গোবিন্দকে যেতেই হলো বাপের বাড়িতে বাপের মুখাগ্নি করতে। তবে পালকিতে চড়ে, সঙ্গে লোক নিয়ে। আর এক মাস ধরে হবিষ্যিও করতে হয়েছিলো স্ত্রী স্নেহলতার সঙ্গে, তবে সেটা ফুলপুরে শ্বশুরবাড়িতেই। আর শ্রাদ্ধ করতে আবার এসেছিলো গোবিন্দ মানিকপুরে, আর তখন তার সঙ্গে এসেছিলো শ্রাদ্ধের উপকরণ ভারে-ভারে। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই: বাপ মারা যাওয়াতে গোবিন্দ যেন খুশিই হয়েছে

এই জন্যে যে, তাতে সে গাঁয়ের লোকদের কাছে নিজের মানসম্মান এবং শ্বাশুরিক ঐশ্বর্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছে। গোবিন্দ নেড়ামাথায় বেশ বুক ফুলিয়েই ঘুরতে লাগলো।

সেই গোবিন্দ সেদিন ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

—মা, মা! মানু, কোথায় রে সব?

মানময়ী রান্নাঘরে ছিলো। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো সে: ওমা দাদা যে! কী ভাগ্যি! ঘোড়ায় চেপে রইলে যে! নামো।

—না রে। এখুনি যেতে হবে—গোবিন্দ বললো, কেমন আছিস? মা কোথায়?

—মা গেচে মাহেশে চানযাত্রায়।

—ও, তীর্থ করতে!—গোবিন্দ হাসলো। আর তার ঘোড়াটা পায়ের খুর দিয়ে নিকোনো উঠোনটা লাগলো আঁচড়াতে।

মানময়ী উঠোন আঁচড়ানো দেখে বললো, তা নামো ঘোড়ার থেকে! ঘোড়াটা বাইরে বেঁধে মুখ হাত ধোও, কিছু খাও।

—না রে, সময় নেই।—গোবিন্দ হেসে বললো, সঙ্গে লোক আছে। এসেছিলাম এদিকে একটু কাজে, তাই ঘুরে গেলাম।—তারপর গোবিন্দের বোধহয় খেয়াল হতেই বললো, তা তুই একলা বাড়িতে আছিস? মা কবে আসবে?

—হয়তো দুএকদিনের মধ্যেই।

—যাক, সাবধানে থাকিস। আমি চলি।—বলে গোবিন্দ ঘোড়ার মুখ ঘোরাতেই দেখলো পেছনের খিড়কি দরজার পাশে এক ছোকরা। তাকে দেখেই ছোকরা ভয় পেয়ে সরে যেতেই গোবিন্দ ঘোড়াটাকে এক কদম ছুটিয়ে দাঁড় করিয়ে হাঁক দিলো: এই, কে তুই?

ভয়ে ছোকরা দাঁড়িয়ে গেলো পুতুলের মতোই।

মানময়ী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, দাদা, ও উমাচরণ, দীনু কোবরেজের ছেলে।

উমাচরণও ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বললো, দাদা, আমি।

গোবিন্দ হেসে বললো, তা বেশ বড়োসড়ো হয়েচিস দেখচি!—পরে বোন মানময়ীকে হেসে বললো, এ বুঝি তোর খবরাখবর করচে? তা বেশ, তা বেশ!

গোবিন্দ এবার হো-হো করে হাসলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াটাও চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠলো। সেও হাসলো হয়তো। তারপর লাগামের টান খেয়ে জামাইবাবুকে পিঠে নিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

উমাচরণ হেসে সুড়ুৎ করে মানময়ীর ঘরে ঢুকলো। একটু পরে মানময়ীও।

৩১

গোবিন্দের তাজা তেজী ঘোড়াটা অনেক আগেই জামাইবাবুকে ফুলপুরে পেঁাছে দিলো। আধমরা শুঁটকো ঘোড়ায় চড়ে অনেক পরে পেঁাছলো সরকার আর পেয়াদা দুজন।

তবু ঘরে ঢুকতেই গোবিন্দের স্ত্রী স্নেহলতা জিগ্যেস করলো, এতো দেরি হলো যে? আর কোথাও গেছলে?

গোবিন্দ বললো, হ্যাঁ।

এমন সময় চাকর এলো জামাইবাবুর জুতো-জামা খুলতে। কাজেই স্নেহলতাকে চুপ করে থাকতে হলো। জুতো-জামা খুলিয়ে, বাড়িতে পরবার কাপড়-জামা দিয়ে চাকরটা চলে যেতেই স্নেহলতা আবার জিগ্যেস করলো, কোথায়?

—কোথায় মনে হয়?—পালটা প্রশ্ন করলো গোবিন্দ।

—আমি তা কী করে বলবো? তোমার কি আর যাওয়ার জায়গার অভাব আছে?—স্নেহলতা ঠোঁট ওলটালো।

গোবিন্দও মুখ বেঁকিয়ে বললো, দুপাশে সর্বক্ষণ পাহারা তো আছেই। তবুও ভয়?

এমন সময় ঝি ঢুকলো ঘরে। হাতে রুপোর রেকাবির উপরে রুপোর গেলাসে ঘোল নিয়ে।

অগত্যা স্নেহলতাকে আবার চুপ করতে হলো। গেলাস ভর্তি সুগন্ধী ঘন ঘোল ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে গোবিন্দ গেলাসটা রেকাবির উপর রেখে দিলে ঝি চলে গেলো।

স্নেহলতা হাত ঘুরিয়ে বললো, ভয় না হাতি। বলি, দড়ি ছিঁড়ে যাওনি বুঝি কোথাও?

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আহা, বোঝো না কেন তুমি ? একঘেয়ে কোনো কিছু ভালো লাগে নাকি ? মণ্ডামিঠাইও ভালো লাগে না। তাই, তাই একটু এদিক-ওদিক···

—এদিক-ওদিক মানে ?—স্নেহলতা বললো, বাড়ির মধ্যেও কেলেংকারি করতে ছাড়োনি। চাঁপা-ঝির কথা মনে নেই ? মা তাড়াতাড়ি সামলে নিলো তাই। নইলে বাবার কানে গেলে—

শুনে বিরক্ত হলো গোবিন্দ : আঃ! তুমি এখন যতো পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতে শুরু করলে! দাও দাও, আলমারি থেকে বোতলটা বার করে দাও। আজ বড্ড পরিশ্রম হয়েচে।

স্নেহলতা আলমারি থেকে বোতল গেলাস বার করে দিয়ে বললো, কিন্তু তুমি বললে না তো, কোথায় গেছলে ?

—জেনে রাখো, আমার কোনো কুলীন শ্বশুরবাড়িতে যাইনি—গোবিন্দ বললো, আর তোমাদের লোক তো সঙ্গেই ছিলো। তাছাড়া—গোবিন্দ বোতল থেকে গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে খেয়ে বললো, তাছাড়া আর দুদিন পরেই তো ছেলের মা হচ্চো, তোমার বাবার নাতি হবে কুলীনের ছেলে, আবার কি ?

মাথা নীচু করে স্নেহলতা বললো, মেয়েও তো হতে পারে!

গোবিন্দ মুখবিকৃতি করে বললো, সেক্ষেত্রে আবার কতদিন এই সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে রাজভোগ খেতে হবে জানিনে।

—কেন ?—এবার চোখ তুলেই বললো স্নেহলতা, তোমার এখেনে থাকতে কষ্ট হয় ?

—কষ্ট!—গোবিন্দ হাসলো : এমন তোফা আরামে ধম্মের ষাঁড়টি হয়ে আছি রাজার হালে, কষ্টটা কোথায় ? চারদিকে দাস দাসী সব সময় হুজুর-হুজুর করচে, হাঁ করতেই হাতের কাছে পাচ্চি সব, বলি কষ্টটা কোথায় ?

—তবে ?—আশ্চর্য হলো স্নেহলতা।

—সে তুমি বুঝবে না। - গোবিন্দ বললো, কুকুর যে পোষে সে কুকুরের মনের কথা বোঝেও না, জানেও না। সে তাকে মাংস-ভাত খাইয়েই খুশি!

স্নেহলতা এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেলো : এমন বোলো না গো বোলো না! তোমার কুলীন শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটাতেই যা বাধা। নইলে তুমি কী না করচো, কোথায় না যাচ্চো! ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হল্লা করচো,

সদরে গিয়ে ফুর্তি করে আসচো, গাঁয়ের বৌ-ঝিরা পর্যন্ত তোমার ভয়ে কাঁটা, তবু কেউ কিছু বলতে পারে না শুধু বাবার ভয়ে।

গোবিন্দ আর এক ঢোক মদ গলায় ঢেলে বললো, তা আমাকে কী করতে হবে বলো? আমার মতন কুলীন পুত্তুররা বিশ-পঁচিশটা বিয়ে করে দিব্যি বহাল তবিয়তে পাখির মতো স্বাধীন হয়ে উড়ে বেড়াচ্চে—আর আমি? —গোবিন্দ একটু থেমে বললো, এক কাজ করো বরং। তোমার বাবা তো আমাকে কোমরে দড়ি বেঁধে রেখেচেন, তুমি পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখো, বেশ হবে।

এবার ভেঙে পড়লো স্নেহলতা বিছানার 'পরে। ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, তার চাইতে আমি বরং গলায় দড়ি দেবো। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেয়ো, যা ইচ্ছে করো—কেউ, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।

গোবিন্দ দেখলো, ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বললো, শোনো তবে। মহাল থেকে ফেরবার পথে ফুলপুরে গেছলাম একবার বাড়ির খবর নিতে। বুঝলে?

কথাটা কানে আসায় স্নেহলতার ফোঁপানিটা একটু বুঝি কমলো। কিন্তু গোবিন্দের রঙীন নেশাটা কেমন যেন ফিকে হয়ে এসেছিলো। একটু বিরক্ত হয়েই বললো, নাঃ, সব মাটি করে দিলে!

শুনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্নেহলতা। নীলাম্বরী শাড়ীখানা গুছিয়ে নিয়ে ডাগর চোখ দুটো স্বামীর দিকে রেখে ফিক করে হেসে ফেললো সে। মেঘলা ঘরখানার যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে গেলো। নিজেই বোতল থেকে গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে স্বামীর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বললো, এই নাও!

৩২

পরদিনই সন্ধ্যা নাগাদ বেণীমাধব গরুর গাড়িতে সদলে মানিকপুরে পেঁছিুলেন। সঙ্গে শুধু একজন নেই। স্ত্রী বাসনাময়ী।

মোক্ষদাসুন্দরী আর মনোমোহিনী, দুই বৃদ্ধা আর খোকনকে গাড়োয়ান প্রাণকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণের জিম্মায় রেখে মাহেশে তিনি তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন বাসনাময়ীকে। পাগলের মতো ঘুরেছেন এখানে ওখানে সেখানে। কাছাকাছি সবাইকে জিগ্যেস করেছেন বাসনাময়ীর কথা। তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিগ্যেস করেছেন—হ্যাঁ মশায়, দেখেচেন নাকি স্ত্রীলোকটিকে?

শুনে কেউ বলেছে, না।

কেউ বলেছে, মনে হচ্চে যেন দেখেচি।

—কোথায়? কোন দিকে?—বলে বেণীমাধব ছুটে গেছেন তার নির্দেশমতো সেইদিকেই।

তবু কোথাও বাসনাময়ীর দেখা পেলেন না বেণীমাধব।

আর কোথায় সেই লোকটা—রামহরি? তাকেও তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি? তবে কি?

সন্দেহ হতেই বেণীমাধব তখনই ছুটে গেলেন গঙ্গার ধারে। লোকটা বলেছিলো, তার অসুস্থ স্ত্রী নাকি নৌকোয় আছে। যদি সেখানে লোকটার খবর পাওয়া যায়। হয়তো তাদের দেখতে না পেয়ে রামহরি বাসনাময়ীকে নিয়ে নৌকোয় তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে রেখেছে। আর সেও খুঁজছে তাদের।

গঙ্গার ধারে এসে বেণীমাধব দেখলেন, অনেক নৌকোই ঘাটে বাঁধা। কিন্তু কোন নৌকোটা? কোথায় সেই রামহরি? কোথায় তার বাসনাময়ী? চারদিকে এতো লোক, এতো স্ত্রীলোক, অথচ ঐ দুজনেরই দেখা নেই—কোথাও না, কোনখানেই না।

—রামহরিবাবু! রামহরিবাবু!—তীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন বেণীমাধব।

বেণীমাধবের ডাকাডাকিতে তাঁর চারপাশে কয়েকজন লোক জড়ো হয়ে গেলো।

একজন জিগ্যেস করলো, মশায় কি সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলেচেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর, আর একটি স্ত্রীলোককেও।

—তিনি আপনার?

—আজ্ঞে, স্ত্রী।

—সব্বোনাশ!

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের প্রশ্ন: বয়েস?

—তা পঁচিশ ছাব্বিশ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ফোড়ন কাটলো: বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

আর একজনের প্রশ্ন: তা রামহরিটি কে?

—আজ্ঞে, এইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়।

—ও, আর দেখতে হবে না।—লোকটি যেন হাত গুণে বলে দিলো: পাখি পালিয়েচে।

বেণীমাধব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

এবার এক প্রবীণ ভদ্রলোক তাঁর একমুখ দাড়ি নেড়ে তত্ত্বকথা শুরু করলেন : মশায় আজকাল দিনকাল বড়োই খারাপ। স্ত্রীলোকেরা বড়োই চপলস্বভাবা হয়ে পড়েচেন। ধর্মে আর তেমন মতিগতি নেই। সর্বদা বেশ-ভূষাতেই ব্যস্ত। সেইজন্যেই তো মনু বলেচেন, স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিলেই সমূহ বিপদ। তা মহাশয়ের জাতি?

—আজ্ঞে, বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলীন ব্রাহ্মণ।

—ব্যস, ব্যস।—একজন যুবক বলে উঠলো : তবে আর ভাবনা কি?—কবিতা করে বললো, যায় পাখি যাক না উড়ে, আবার পাখি আসবে উড়ে! বলেন তো ঘটকালি করি।

বেণীমাধব দেখলেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। অযথা দুটো কথা শোনা। কাজেই আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেলেন তিনি।

একবার মনে মনে বললেন, হে জগন্নাথ, শেষে এই করলে বাবা।

হঠাৎ একবার তাঁর মনে পড়ে গেলো ভগ্নী নীরোদাসুন্দরীর কথা। তার মুখখানা ভেসে উঠলো বেণীমাধবের চোখের সামনে। সেদিনের সেই করুণ মিনতি। দাদার কাছে প্রতিকারের আশা। কিছুই করতে পারেননি তিনি। পারেননি বাসনাময়ীর ভয়ে। আজ সেই বাসনাময়ীই নিরুদ্দেশ।

নীরোদাসুন্দরীর মুখখানায় কি ব্যঙ্গের হাসি?

বেণীমাধব বুঝি অস্ফুটস্বরেই বললেন, বাবা জগন্নাথ, তুমি কি হিসেব মেলালে?

ভারি পায়ে বেণীমাধব এসে দাঁড়ালেন গাছতলায় তাঁর দলের কাছে। এসেই ধপ করে বসে পড়লেন তিনি।

প্রাণকৃষ্ণ বললো, কত্তা, মাঠাকরণকে পালেন না?

বেণীমাধব ঘাড় নাড়লেন শুধু।

হরেকৃষ্ণ বললো, আমরা একবার দেখে আসবো কত্তা?

বেণীমাধব মাথা নীচু করেই বললেন, দ্যাখো।

খোকন এতক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। এবার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, মা কোথায় বাবা? মা কোথায় গেলো?

কী উত্তর দেবেন বেণীমাধব! চুপ করেই রইলেন।

খোকন এবার কান্না শুরু করলো : মা, মা! মা কোথায়? মাকে এনে দাও! আর দুই বৃন্ধা ঘোমটায় মুখ ঢেকে যেন পাথর হয়ে বসে রইলেন। হয়তো

বললেন মনে মনে ঃ বাবা, এ কী করলে বাবা ! দুধের বাছা পড়ে রইলো, মাকে কোথায় টেনে নিলে ? ফিরিয়ে এনে দাও বাবা !

খোকন কাঁদতে কাঁদতে বাপের কোলেই ঘুমিয়ে পড়লো।

আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে লাগলো মাহেশের স্নানযাত্রার মেলা। যাত্রীরা একে একে ফিরে যেতে লাগলো বাড়ির দিকে। কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ পালকিতে, আর আনকেই হেঁটে। মনে তাদের জগন্নাথ দর্শনের আনন্দ, মুখে তাদের সাফল্যের হাসি !

খানিক পরে প্রাণকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণ দুজনেই ফিরে এলো ঃ না কত্তা, মাঠাকরণের দেখা পালাম না।

বেণীমাধব চুপ করে রইলেন। তিনি বুঝেছেন হয়তো, যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না।

—এখন কী করা যায় কত্তা ?—প্রাণকৃষ্ণ জিগ্যেস করলো।

এবার কথা বললেন বেণীমাধব ঃ এ রাতটা এখানেই থাকা যাক। দেখা যাক, যদি ফেরে। হয়তো হারিয়ে গেচে কোথাও।

তাই ঠিক হলো। সে রাত্রিটা গাছতলাতেই কাটালেন সবাই। তবে সবাই উপোষ করেই। অবশ্য বেণীমাধব প্রাণকৃষ্ণদের বললেন, যা তোরা কিছু খেয়ে আয়। কিন্তু তারা বললো, না কত্তা, তা কখনো হয় ?

সারারাত্রিটা চোখ চেয়েই কাটালেন সবাই। খোকন মাঝে উঠে কান্না শুরু করেছিলো। একটু মুড়কি আর কলা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ভোররাত্রে বেণীমাধব আস্তে আস্তে বললেন, দেখো বাবা পানকেষ্ট, হরেকেষ্ট,—দুই বন্ধোকেও বললেন, আপনাদেরও বলি, আমার যা হবার তা তো হলো। এখন একথা গাঁয়ের লোক জানলে আমার মানসম্মান তো চুলোয় যাবেই, গাঁয়ে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। কাজেই এ ব্যাপারটা যদি চাপা থাকে, তবেই মঙ্গল।

প্রাণকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণ দুজনেই প্রায় একসঙ্গে জিভ কেটে বললো, নিচ্চই, নিচ্চই ! এ কি গেয়ে বেড়াবার কথা কত্তা !

বৃন্ধা দুজনের ঘোমটাও নড়ে উঠলো। অর্থাৎ তাঁরাও একথা ঘুণাক্ষরে জানাবেন না কাউকে।

বেণীমাধব একটু ভেবে বললেন, বরং বলা ভালো, খোকনের মা গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ডুবে মারা গেচে।

—তাই বলবো কত্তা।—গাড়োয়ান দুজন বললো। ঘোমটা দুটোও নড়ে উঠলো: হ্যাঁ, তাই বলবেন তাঁরাও।

—যাক। আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হলাম।—বেণীমাধব সত্যিই হয়তো একটু আশ্বস্ত হলেন।

তারপর বেণীমাধব একসময় উঠে দাঁড়ালেন। বললেন প্রাণকৃষ্ণদের, নে, তোরা এবার বলদ জোড় গাড়িতে। রওনা হওয়া যাক—তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ, আর সে আসবে না।

অগত্যা রওনা হলেন সকলেই।

এবার হরেকৃষ্ণর গরুর গাড়িতে বসলেন শুধু বেণীমাধব আর খোকন। মোক্ষদাসুন্দরী আর মনোমোহিনী আগের মতোই প্রাণকৃষ্ণের গাড়িতেই উঠে বসলেন।

পথে খোকনের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সারা পথটা সে কাঁদতে কাঁদতে চললো: মা কোথায়, মাকে এনে দাও, আমাকে মা'র কাছে নিয়ে চলো।

আর প্রাণকৃষ্ণর গাড়িতে দুই বৃদ্ধায় চললো সারাটা পথ গুজুর-গুজুর আর ফুসুর-ফুসুর:

—কী ঘেন্না ভাই, মাগী বোধহয় ঐ মিনসেটার সঙ্গেই পালালো!

—ও মাগীর বরাবরই কেমন যেন একটু ছোঁক-ছোঁক করা অভ্যেস ছিলো।

—যেমন বুড়োর ছুঁড়ী বিয়ে করার শখ! বয়েসের ধম্মো ভাই যাবে কোথায়?

—সে কথা বলো না দিদি। আমাদেরও তো এককালে বয়েস ছিলো। তা বলে বাপু এমন বেহায়াপনা করিনি।

—তা যা বলেচো ভাই। আজকালকার মাগীগুলোর রকমসকম দেখলে গাপিত্তি জ্বলে যায়।

—আহা, এখন ছেলেটার কথা ভাবচি।

—তা বটে। বুড়ো তো আবার গিয়েই কচি দেখে কোনো কুলীনকন্যে ঘরে আনবে।

—তা তো হলো ভাই। কিন্তু এই পেটের কথা পেটে রাখাই যে দায়!

—তাই তো। এ এক যন্তণা হলো দেখচি।

তা এমন একটা ঘটনা চেপে রাখা অসম্ভবই। বিশেষ করে এমন একটা মুখরোচক ঘটনা! অবশ্য বাড়িতে ফিরে এলে পাড়ার মেয়েরা মোক্ষদাসুন্দরী

আর মনোমোহিনীকে বাসনাময়ীর কথা জিগ্যেস করলে প্রথমে তাঁরা ঘাড় নেড়েছিলেন, ওর খবর বাপু জানিনে। যদি অতো জানবার ইচ্ছে তো ও বাড়ির কত্তার কাছে যা, শুনে আয়গে।

কিন্তু অতো সহজে 'জানিনে' বললে কি চলে, না পার পাওয়া যায়?

—আহা, বলোই না ব্যাপারটা কি?—নাছোড়বান্দা সবাই।

—মরে গেচে সে। গঙ্গায় ডুবে।

—উঁহুঃ।

—তাহলে ভেদবমি হয়ে।

—উঁহু। তাও না।

—তবে উবে গেচে।

—আহা, মাগী কপ্পুর বুঝি?

—তবে কী শুনতে চাস?

—যা সত্যি।

—বল বলবি না কাউকে?

—না।

তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন তাঁদের মনগড়া কথা, অবশ্য নীচু গলায়ঃ মাগী এক মিনসের সঙ্গে পালিয়েচে!

এতক্ষণে মনের মতো জবাবটা পেয়ে মেয়েদের মুখ-চোখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলোঃ তাই বলো!

তারপর একটা রসালো বিষয়বস্তু পাওয়ায় বাড়ি-বাড়ি বসে গেলো জমাটি আসর।

এ নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বারোয়ারিতলায় বা কারোর বৈঠকখানায় বসলো জমাট আসর। পুরুষদেরও।

তারপর কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ শুভানুধ্যায়ী সেজে বেণীমাধবের কুশল-সংবাদে আগ্রহী হয়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্তও গেলেন।

কিন্তু বেণীমাধবের সাক্ষাৎ তাঁরা পেলেন না।

অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরে বারান্দাটায়। আলুথালু বেশ, দৃষ্টি উদাস।

তাঁরা বিনয়াভিনয় করে বললেন, তুমি তীর্থ করে এলে, তাই তোমার খবর নিতে এলাম। সব ভালো তো?

—না—ছোট্ট জবাব দিলেন বেণীমাধব। তাও আকাশের দিকে চেয়ে।

—কেন, কী হলো ?—প্রশ্ন।

—স্ত্রী মারা গেচে।—উত্তর।

—তবে যে শুনলাম···।—জেরা।

—কি ?—একটু যেন আগ্রহ।

—তোমার স্ত্রী নাকি, মানে, পলাতকা।—মুখে তাঁদের স্মিত হাসি।

—না, না।—বেণীমাধবের চোখ দুটোয় আগুন।

—তবে ?—এবার ব্যঙ্গের সুর।

—বেণীমাধবের চোখ দুটো এবার যেন সজল হলো ঃ হারিয়ে গেচে।

—কোথায় ?—আবার প্রশ্ন।

—তা যদি জানতাম—।—থেমে গেলেন বেণীমাধব। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ যেন আপনমনেই জোরে বলে উঠলেন ঃ জানিনে, জানিনে আমি। কেউ যদি জানে, কেউ যদি এনে দেয়, তাকে আমি আমার সব, সব দেবো, যথাসর্বস্ব দেবো, হ্যাঁ দেবো···

বলতে বলতে ঘরে ঢুকেই বেণীমাধব দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শুভানুধ্যায়ীরা দেখলেন পালাটা ঠিক জমতে জমতেও জমলো না। শেষ অংকে নায়কের পতন এবং মূর্ছা না হতেই যেন যবনিকা পতন হয়ে গেলো।

—চলো হে, যাওয়া যাক।—তাঁরা অগত্যা স্থান ত্যাগ করলেন।

বাড়ির কালিদাসী ঝি এতক্ষণ ঘুমন্ত খোকনকে কোলে নিয়ে গোয়াল-ঘরের পাশে বিচুলির গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে সব শুনছিলো।

এবার বেরিয়ে এসে নিজের মনেই বললো, নাঃ, আজও বাবুর পেটে কিছু পড়বে না দেখচি।···আর, মিনসেগলো এসেছিলো মজা দেখতি। ঝাঁটা মারো মুয়ে।

৩৩

দুঃসংবাদ যেন কাক-চিলের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়।

বাসনাময়ীর খবরটা রঙীন হয়ে উড়ে এসে পড়লো বল্লভপুরে লোহারাম বাঁড়ুজ্জের বাড়ির উঠোনে। শুনে স্বর্ণমঞ্জরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো ঃ ওমা অমার কী হলো ? মামীর মনে এই ছিলো ?

বিরাজমণির বুকে মুখ রেখে খুব খানিকটা কেঁদে পরে বললো, দিদিমা,

বুড়োকে বলে তুমি আমাকে একবার মানিকপুরে পাঠিয়ে দাও, মামাকে দেখে আসি, খোকনসোনাকে দেখে আসি।

শুনে ইন্দু আর বিন্দু বললো, কিন্তু ছোটঠাকরুণ, কী হবে সেখানে গিয়ে? তোমাকে তো সেখেন থেকে সেই যে বিদেয় করেচে আর একদিনও তো কেউ দেখতেই এলো না।

—না আসুকগে।—স্বর্ণ বললো, দজ্জাল মামীর ভয়ে কেউ আসতে পারেনি। মামা আমার তেমন নয়। আর ভাইটিকে একবার দেখবো না?—বলেই বড় সতীন বিরাজমণির বুকে মুখ রেখে আবার আবদার শুরু করলো স্বর্ণ: দিদিমা গো, আমাকে একবার পাঠিয়ে দাও গো।…নইলে কিন্তু আরো জোরে-জোরে কেঁদে পাড়ার লোক জড়ো করবো।

শুনে বিন্দু হেসে বললো, ইস, এতে আমাদের মুখ হাসবে, না, তোমার মুখ হাসবে? তোমার মামী মাগীই তো বেরিয়ে গেচে।

তাইতো। স্বর্ণ যেন বুঝতে পারলো ভয়-লজ্জাটা তারই। কাজেই এবার নরম সুরেই বললো, হ্যাঁ দিদিমা, তা'লে মামাকে খোকনকে দেখতে পাবো না?

বিরাজমণি হেসে বললেন, দাঁড়া দেখি কত্তাকে বলে, কী করতে পারি।

শুনে স্বর্ণ লাফিয়ে উঠলো: তুমি বলবে দিদিমা? আমার লক্ষ্মী দিদিমা!—বলেই দুহাতে বিরাজমণির গলাটা জড়িয়ে ধরলো: এই জন্যেই তো তোমাকে এতো ভালোবাসি গো দিদিমা।

বিরাজমণি শুধু হেসে বললেন, পাগল মেয়ে।

ফাঁকমতো বিরাজমণি কথাটা কর্তাকে বলতেই লোহারাম বললেন, এই বর্ষাবাদলার দিনে অতোটা পথ যাওয়া কি সোজা কথা। আর গিয়েই বা কী হবে? তুমি বরং বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওকে ঠান্ডা করোগে।

বিরাজমণি বললেন, আহা, মেয়েটা বড়ো উতলা হয়েচে। হাজার হোক নিজের মামা তো।

লোহারাম হাসলেন: আরে গিন্নী। মামা তো আবার একটি কুলীন-কন্যের কুল রক্ষে করে তাকে ঘরে আনবে। জানোই তো, ভাগ্যমানের বৌ মরে, হতভাগ্যের ঘোড়া মরে।

—তা হোক।—বিরাজমণি বললেন, ভাইটাকেও দেখবার জন্যে সন্ন পাগল হয়েচে। পালকিতে যাবে আসবে—কী আর এমন কষ্ট হবে? একবার ঘুরে এসো গে।

অগত্যা লোহারামকে যেতে হলো দুটো পালকির ব্যবস্থা করে। সঙ্গে চললো হাতকাটা সরকার গোপীচরণ বাড়ির বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে। বাড়ির নেত্য ঝি উঠলো স্বর্ণমঞ্জরীর পালকিতেই। আর স্বর্ণর সঙ্গে বিরাজমণি দিয়ে দিলেন তার ভাইটির জন্যে জামা-কাপড়, মামার জন্যে ধুতি-চাদর, আর ক্ষীর নাড়ু চন্দ্রপুলি, সব বাড়ির তৈরি মিষ্টি।

জল-কাদা ভেঙে পালকি দুটো মানিকপুর গ্রামে ঢুকতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়লো : বেণীমাধবের ভাগ্নী সন্ন আসছে বরের সঙ্গে। গাঁয়ের কাঁচা পথ মুখর হয়ে উঠলো দুই পালকি বেহারাদের 'হুঁম-হুঁম' শব্দে, গোপীচরণের ঘোড়ার খুরের আওয়াজে। পাড়ার উলঙ্গ ছেলেগুলো পালকির পেছনে-পেছনে ছুটতে লাগলো। গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুরগুলো শব্দ শুনে শুরু করলো ঘেউঘেউ। আর মেয়েরা কেউবা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে, কেউবা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো স্বর্ণর পালকিতে আগমন।

লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন দীনু কোবরেজ। গাঁয়ে দু-দুটো পালকি আর ঘোড়া ঢুকতে দেখে হাঁক দিলেন : কে যায় ?

ঘোড়া থেকে গোপীচরণ উত্তর দিলো : বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জে মশায়। যাবেন বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জে মশায়ের বাড়ি।

বৃদ্ধ লোহারাম বাঁড়ুজ্জে পালকিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, মাথাটা উঁচু করে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে দীনু কোবরেজকে নমস্কার জানালেন।

এতক্ষণ স্বর্ণদের পালকির দরজা দুটো বন্ধই ছিলো, এবার গাঁয়ে ঢুকেই স্বর্ণ দরজা দুটো টেনে একটু ফাঁক করলো : সেই মানিকপুর! সেই গোপীনাথবাড়ি চন্ডীমন্ডপ, ঐ তো পীরসাহেবের ভিটে···

পালকির আগে-আগে খবর ছুটছিলো। তাই গাঙ্গুলীবাড়ির দুই বয়স্কা বোন যশোমতী আর হরিমতী ছুটে এলো তাদের আমবাগানের ধারে। স্বর্ণর বাসরে তারা কতো আনন্দই করেছিলো। সেই স্বর্ণ। আর ঐ, ঐ যে তার সেই বুড়ো বর! তা ভালোই আছে সন্ন!

স্বর্ণ তাদের দেখে হাসলো। তারাও।

স্বর্ণর ইচ্ছে হলো পালকি থেকে নেমে গিয়ে ছুটে তাদের জড়িয়ে ধরে। কিন্তু উপায় নেই। সঙ্গে বর, শ্বশুরবাড়ির লোক।

যশোমতীদের মা কৃপাময়ীও দেখলেন আড়াল থেকে উঠোনে দাঁড়িয়ে :

আহা যেন হর-গৌরী।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেললেন : আমার যশো আর মতীর যদি অমন একটা বুড়ো বরও জুটতো তবে অন্তত আইবুড়ো নামটাও ঘুচতো মেয়ে দুটোর। সবই কপাল! অথচ ওর মা মাগী দেখে যেতেও পারলো না।

উমাচরণ হাটের কাছে একটা দোকানে বসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমিয়েছিলো। সামনে দিয়ে দুটো সোয়ারী সমেত পালকি আর ঘোড়ায় গোপীচরণকে দেখে উমাচরণই জিগ্যেস করলো, আপনারা কে বটেন? কোথা থেকে আসা হচ্চে?

গোপীচরণ বললো, আজ্ঞে বল্লভপুর থেকে লোহারাম বাঁড়ুজ্জে মশায় যাচ্চেন বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জে মশায়ের বাড়িতে।

ততক্ষণে উমাচরণের সন্ধিৎসু চোখ স্বর্ণর পালকির ফাঁক-দরজায় গিয়ে হোঁচট খেয়েছে : হুঃ। সন্ন। মামাকে দেখতে? তা বেশ!

দলটা চলে যেতেই হেসে বললো, তা শাঁসে জলে সন্ন হয়েচে মন্দ না!

একজন বন্ধু টিপ্পনী কাটলো : তবে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

খবরটা আসতেই বাইরে ছুটে এলো মানময়ী। পেছনে মোক্ষদাসুন্দরীও।

পালকির কাছে একটু এগিয়ে গিয়েই মানময়ী বললো, সন্ন এলি?

স্বর্ণ ঘাড় নেড়ে হেসে বললো, হুঃ।

মোক্ষদাসুন্দরী বললেন, বোধহয় খবর পেয়ে এলো।

কোথায় যেন আলতা পরাতে যাচ্ছিলো মুক্তো নাপতিনী। স্বর্ণকে পালকিতে দেখতে পেয়ে গালে হাত দিয়ে বললো, ওমা দিদিমণি যে!

স্বর্ণ হাসলো। ইশারায় বললো, আসিস একবার।

স্বর্ণ বাড়িতে ঢুকতেই সামনে পড়লো সেই ঘরখানা, নীরোদাসুন্দরী যে ঘরখানায় গলায় দাড়ি দিয়েছিলো। মা'র মুখখানা মনে পড়লো স্বর্ণর। সেই বীভৎস মুখ! দড়িতে ঝুলছে মা। জিবটা বেরিয়ে গেছে।

বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো স্বর্ণর।

চোখ বুজলো সে।

এমন সময় কালিদাসী এসে পড়লো খোকনকে কোলে নিয়ে : ওমা, দিদিমণি যে!

মেঘলা আকাশের মতোই ততক্ষণে স্বর্ণর মুখে-চোখে থমথমে মেঘ নেমে এসেছে। বললো, হ্যাঁ রে, এলাম।—হাত বাড়ালো : দে, খোকনকে দে।

কিন্তু খোকন আসতে চাইলো না স্বর্ণর কোলে। এ তো মা নয়। এক-গা গয়না পরা, রঙীন শাড়ি পরনে। দেখতে ছোটখাটো। না, এ তো মা নয়।

—এসো, খোকনসোনা এসো!—আবার হাত বাড়ালো স্বর্ণ: তোমার জন্যে কততো জিনিস এনিচি!—নেত্য ঝি পেছনেই ছিলো, তাকে বললো, যা তো, পালকি থেকে সব নিয়ে আয়।—কালিদাসীকে বললো, কত্তা এয়েচেন, আর সরকার মশায়। আর মামা কোথায় রে?

—ঘরে। তুমি এয়েচো ভালোই হলো। বাবু আজ কদিন কুটোটি পর্যন্ত মুখে দেননি। দেখো যদি কিছু খাওয়াতে পারো।—কালিদাসী খোকনকে স্বর্ণর কোলে দিয়ে বললো, দেখি আমি যাই ওঁদের ডেকে আনিগে।

খোকনও কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায় আর বিশেষ আপত্তি করলো না। খোকনকে নিয়ে স্বর্ণ সোজা ঢুকলো মামার ঘরে।

বেণীমাধব ঘরের আড়-এর দিকে দুচোখ মেলে চেয়ে কপালে হাত রেখে চুপ করে শুয়েছিলেন বিছানায়। হঠাৎ স্বর্ণকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন: সন্ন, তুই?

—হ্যাঁ মামা।—বলেই খোকনকে খাটের পাশে বসিয়েই ধুপ করে বেণীমাধবের পায়ের উপর পড়লো।

বেণীমাধব চুপ করে রইলেন। স্বর্ণ যে আসবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। আশাও করেননি তিনি। নীরোদার অপমান, আত্মহত্যা স্বর্ণকে অবহেলা, তারপর কোনোরকমে একটা বুড়োর কাছে বিয়ের নামে বিদায় করা —সব যেন হুড়মুড় করে ভেসে উঠলো তাঁর মনের পটে। সেই স্বর্ণ এসেছে তাঁকে দেখতে, তাঁর বিপদে ছুটে এসেছে। আর, মনে হলো তাঁর, পা দুটো যেন ভিজছে।

বেণীমাধব উঠে বসলেন। স্বর্ণর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, সন্ন, ওঠ মা। কার সঙ্গে এলি?

স্বর্ণ তেমনই পায়ে মাথা রেখে বললো, তোমার জামাই—

—তাই নাকি? লোহারাম বাড়ুজ্জে এয়েচেন। দেখি ওঠ, আমি যাই।

স্বর্ণ মাথা তুলে বললো, তুমি আজ কদিন কিছু মুখে দাওনি।

ম্লান হেসে বেণীমাধব বললেন, সে খবরও পেয়েচিস?

স্বর্ণ বললো, তুমি কথা দাও, আমার হাতে তুমি আজ খাবে?

বেণীমাধব বললেন, কিছু আর গলা দিয়ে নামতে চাচ্চে না রে। এর চাইতে তোর মামী যদি মরতো তাও বোধহয় ছিলো ভালো।

স্বর্ণ এর কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না। তবে বললো, তা বলে তুমি আর ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করো না। যা হবার তা তো হয়েচে। এখন এই খোকনের মুখের দিকে চেয়েও তোমাকে শান্ত হতে হবে।

—হুঃ। বুঝি তো সবই—বেণীমাধব যেন নিজের মনেই কথাটা বললেন। পরে বললেন, আমি যাই, জামাইকে ভেতরে নিয়ে আসিগে।

স্বর্ণ উঠে দাঁড়ালো: এচো খোকনসোনা, আমরা যাই।

স্বর্ণ খোকনের হাতে দুটো নাড়ু দিয়ে বসিয়ে রেখে কালিদাসীর সঙ্গে রেকাবিতে খাবার সাজাতে বসলো।

এদিকে গুটিগুটি আসতে লাগলো পাড়ার মেয়েরা! যশোমতী হরিমতী মানময়ী গিরিবালা। এলেন কৃপাময়ী মোক্ষদাসুন্দরী মনোমোহিনীও। এলো আরো অনেকেই।

এমনি করেই একদিন ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো এরা এ উঠোনে, যেদিন বাসনাময়ী স্বর্ণর মাকে করেছিলো অপমান। একটা উচ্চবাচ্যও করেনি এরা। আবার এরা এসেছিলো নীরোদাসুন্দরী গলায় দড়ি দেবার পর। দেখতে। একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললে কেমন দেখা যায়, তাই দেখতে। তারপর এরা এসেছিলো স্বর্ণর বিয়েতে। সাজ দেখাতে আর মজা দেখতে। টোপরপরা একটা বুড়োর পাশে চেলিপরা একটা কচি মেয়েকে কেমন মানায়, তাই দেখতে। এরা লোকের সুখ-দুঃখে আসে। না এলে এদের চলেও না, আর গৃহস্থের বাড়িও কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকাই ঠেকে।

আজ এতোদিন বাদে স্বর্ণর সাড়ম্বর আগমনে তাই এরা উপস্থিত। মুখে সরব আগ্রহ:

তবে স্বর্ণর কথায় তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কারণ, এদের চেনে সে। তাছাড়া আজ যেজন্যে সে ছুটে এসেছে সে কর্তব্যই আগে। আর সময়ও কম। কাজেই হাতের কাজ সারতে সারতেই স্বর্ণ তাদের কথার জবাব সংক্ষেপেই সারতে লাগলো।

—কেমন আছিস স্বর্ণ—(ভালো)

—শ্বশুরবাড়ি কেমন?—(ভালো)

—বর পছন্দ হয়েচে?—(হুঁ)

—বেশ তো ডাগরডোগর হয়েচিস?—(বয়েস বাড়চে তো।)

—বর তোকে খুব ভালোবাসে?—(নইলে কখনো সঙ্গে আসে?)

—শ্বশুরবাড়িতে আর কে আছে ?—(শাশুড়ীর বয়সী সতীন আর বড় ননদের বয়সী দুই মেয়ে।)

—তারা লোক কেমন রে ?—(খুব ভালো)

—আদরযত্ন করে ?—(মাটিতে পা ফেলতে দেয় না।)

একজন টিপ্পনী কাটলো মুচকি হেসে ঃ সে তো দেখতেই পাচ্চি।

আবার শুরু ঃ

—তোর এসব গয়না কে দিয়েচে ?—(বর টাকা দিয়েচে, সতীন স্যাকরা ডেকে গড়িয়ে দিয়েচে।)

—সতীনের সঙ্গে ঝগড়া হয় না ?—(হুঁ-উ-উ-উ)

পরম উৎসাহে ঃ কী রকম ? কী রকম ?—(এই যেমন, না-খেয়ে থাকলে, কোনো কাজ করতে গেলে, সেজেগুজে না থাকলে, বরের কাছে না গেলে—)

বলেই হঠাৎ স্বর্ণ উঠে দাঁড়ালো সাজানো দুখানা রেকাবি দুহাতে নিয়ে। বললো, তোমরা বসে গল্প করো, আপনারাও বসুন, আমি যাই মামাকে আর ওঁকে ঘরে খাবারটা দিয়ে আসি। মামা নাকি কদিন কিছু খানইনি।

হঠাৎ খেয়াল হলো সকলের ঃ ঠিকই তো। স্বর্ণ এখানে তাদের জেরার উত্তর দিতে আসেনি। আর এসেছে যে কাজে, সে কাজটা ভোলেনি মেয়েটা।

স্বর্ণ বললো কালিদাসীকে, তুই খোকনকে নিয়ে ঐ ঘরে দুটো জায়গা করে জল গড়িয়ে দে। আর আমার সঙ্গে নেত্য এসেচে, সরকার মশায় এসেচেন, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে।

স্বর্ণ ঘরের বাইরে এলো। পেছনে খোকনকে নিয়ে কালিদাসী। ঘরে আর দরজার কাছে দলবাঁধা মেয়েরা স্বর্ণর এই হঠাৎ-প্রস্থানে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লো। কোনো কিছু আঁকড়ে ধরেও সেটা হাত থেকে হঠাৎ ফসকে গেলে যেমন হয় অনেকটা তেমনি।

তবে সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হলো গুঞ্জন ঃ

—ছুঁড়ীর ভারি দেমাক বেড়েচে।

—ঠেকারে আর মাটিতে পা পড়চে না যেন।

—ধরাকে একেবারে সরাজ্ঞান।

—তবু তো বুড়ো বর।

—জোয়ান বর পেলে ছুঁড়ী হাওয়ায় উড়ে বেড়াতো।

—তবে যাই বলো সুখেই আছে কিন্তু।

—এখেনে তো কম অবহেলা পায়নি।

—হেনস্তাই করেচে সবাই।

—আমরাও তো কোনোদিন ওকে ভালো মুখে কথা বলিনি!

—তাইতো ছুঁড়ীর অতো রাগ!

এমন সময় দু-একজনের খেয়াল হলো, আর একজনও তো রয়েছে, যার কাছে স্বর্ণর খবরাখবর নেওয়া যায়। ওদের নেত্য ঝি। সে বাইরে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিলো একমুখ পান-দোক্তা গুঁজে। আর শুনছিলো তার ছোটঠাকরুণের সঙ্গে পাড়ার মেয়েদের কথাবার্তা। তাদের টিপ্পনীও কানে এসেছিলো তার।

যশোমতীই নেত্যর সামনে এসে দাঁড়ালো: তুমি বুঝি আমাদের সন্নর সঙ্গে এয়েচো?

পান মুখে নেত্য মাথা নেড়ে জানালো: হ্যাঁ।

—সন্নর বুঝি শ্বশুরবাড়িতে খুব আদরযত্ন?

নেত্য আবার ঘাড় নাড়লো: হ্যাঁ।

—সন্নর সতীন সন্নকে দেখতে পারে?

এবার আর ঘাড় নাড়ায় হলো না। নেত্য উঠে একটু দূরে গিয়ে পানের পিকটা ফেলে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো: তা আপনারা তো সবই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছোটঠাকরুণের কাছে শোনলেন, তা বিশ্বেস হলো না বুঝি?

হঠাৎ এমন উত্তরে যশোমতী থতমত খেয়ে গেলো। বললো, এই এমনি, মানে—

পান-দোক্তা তরিবত করে মুখে পুরে একটু পরেই তার প্রথম পিকটা ফেলে দিতে হলো বলে নেত্যর মেজাজটা খিঁচড়ে গেছলো, তার উপর তার কানেও আসছিলো ওদের গা-জ্বালানো সব কথা। তাই এবার শুধু বললো, আপনারা জেনে রাখুনগে—আমাদের ছোটঠাকরুণ লক্ষ্মীঠাকরুণ।

বলেই জোরে জোরে পান চিবোতে লাগলো সে।

সবাই বুঝলো, ওটি কঠিন ঠাঁই।

কাজেই একে-একে সরে পড়লো সবাই।

বেণীমাধব লোহারামকে ঘরে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কালিদাসী ঘরের মেঝেতে দুজনের জায়গা করে দিলে স্বর্ণ একগলা ঘোমটা

দিয়ে খাবারের রেকাবি দুটো রাখলো। পরে বেণীমাধবের কাছে গিয়ে মুখে কোনো কথা না বলে তাঁর হাত ধরে টানলো। ভাবটা—এসো, খেতে বসো।

বেণীমাধব ম্লান হাসলেন, তুই আমাকে খাওয়াবিই ?

উত্তরে আবার হাত ধরে টানলো স্বর্ণ।

—নাঃ, তোর হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া যাবে না দেখচি।—বেণীমাধব উঠলেন ঃ কিন্তু গলা দিয়ে কিছু যে আর নামতে চাইচে না রে।

উত্তরে আবার তাঁর হাতে টান।

বেণীমাধব লোহারামকে বললেন, আসুন বাবাজী, বসুন। আমার এ মেয়ের হাত থেকে কারোরই ছাড়ান নেই।

লোহারাম একটু হেসে আসনে গিয়ে বসলেন। পাশের আসনে বেণীমাধবও বসলেন। তবে বললেন, তুই বলচিস, আমি খাবো। তবে অতো খেতে পারবো না।

উত্তরে স্বর্ণ'র ঘোমটাটা নড়ে উঠলো। অর্থাৎ, না, তা হবে না।

লোহারাম বললেন, মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই বাঁড়ুজ্জে মশায়। অন্তত ছেলেটার মুখ চেয়েও আপনাকে বুক বাঁধতে হবে।

—সে তো বুঝি সবই।—বেণীমাধব গেলাসের জলে হাত ধুয়ে একখানা চন্দ্রপুলিতে কামড় দিয়ে বললেন, কিন্তু মনটাকে যে ঠিক করতে পারচিনে। এর চাইতে তার মৃত্যু হলেও যেন ছিলো ভালো—কই, কিছুই খাচ্চেন না যে ?

—এই তো খাচ্চি।—লোহারাম নাড়ু একটা মুখে তুলে চুষতে চুষতে বললেন, এ বয়েসে আর খাওয়া-টাওয়া চলে না। তবে খেতে হয় তাই—

স্বর্ণ এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁদের খাওয়া দেখছিলো, এবার খোকনকে কোলে নিয়ে বাইরে এলো নেত্য আর সরকার মশায়ের জলখাবারের ব্যবস্থা কালিদাসী করলো কি না দেখবার জন্যে।

দেখলো, পাড়ার মেয়েরা সবাই চলে গেছে।

স্বর্ণ মনে মনে হাসলো একবার। এমন সময় মুক্তো নাপতিনী আলতার চুবড়ি নিয়ে উঠোনে দাঁড়াতেই স্বর্ণ বললো, মুক্তো, আমাকে আলতা পরিয়ে দে।

ঘরে আর কেউ নেই দেখে লোহারাম বললেন, বাঁড়ুজ্জে মশায়, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি—

—বলুন।—খাওয়া থামিয়ে বেণীমাধব তাকালেন লোহারামের দিকে।

—বলছিলাম কি -লোহারাম বললেন, এভাবে তো চলতে পারে না।

তাছাড়া আপনার ছেলেটিকেও দেখাশুনো করা দরকার। তাই বলছিলাম কি, একটি ভালো কুলীনকন্যা দেখে—

—না, না। আর নয়।—বেণীমাধব তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন ঃ এর পরও ? লোকে একবারই ঠেকে শেখে। তাছাড়া আমার মনের এমনই অবস্থা হয়েচে যে লজ্জায় আর বাড়ির বাইরে পর্যন্ত যেতে পারিনে। মনে হয়, ঐ বুঝি সবাই আমাকে দেখে হাসচে।

লোহারাম শুধু বললেন, হু।—একটু থেমে বললেন, মানে আমি ছেলেটির কথা ভেবেই বলেছিলাম।

বেণীমাধব যেন অন্যমনস্ক হয়েই বললেন, দেখি, ওকে ওর মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দেবো ভাবচি।

সে রাত্রিটা মানিকপুরে কাটিয়ে পরদিন ভোরে লোহারাম বল্লভপুরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

স্বর্ণ রাত্রে নিজের হাতে রান্না করে মামাকে খাওয়ালো, তাঁর কাছে কথা আদায় করে নিলো, যা হোক দুটো মুখে দেবেন বেণীমাধব। কালিদাসীকে ডেকে সব বুঝিয়ে গেলো, বিশেষ করে বলে গেলো, দেখিস, মামার আর খোকনমণির যেন কোনো কষ্ট না হয়। আর, যদি কিছু দরকার হয়, কাউকে দিয়ে খবর দিবি বল্লভপুরে।

আর বেণীমাধবকে প্রণাম করে বললো, মামা, খোকনমণিকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যেতাম। কিন্তু তোমার কাছ থেকে এসময়ে ওকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে দেখলাম। তবে অসুবিধে বুঝলে খবর দিয়ো, আমি ওকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করবো।

তবে নতুন করে সংসার পাতার কথা বললো না সে বেণীমাধবকে। কারণ রাত্রেই লোহারামের কাছে শুনেছিলো মামার তাতে মত নেই।

৩৪

বাসনাময়ীর খবরটা হওয়ায় উড়ে উড়ে এসে পড়েছিলো ফুলপুরে শ্রীধর চাটুজ্জের বাড়িতেও। তবে সে বাড়িতে তেমন কোনো আলোড়ন বা চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। বরং শ্রীধর চাটুজ্জের কাছে খবরটা পেয়ে তাঁর দুই স্ত্রী মানদাসুন্দরী ও লাবণ্যপ্রভার মধ্যে বেশ একটু সরস আলোচনারই সূত্রপাত হলো।

তাদেরই আর এক সতীন, কোনোদিন তাকে তারা দেখেওনি, তার দাদার স্ত্রী। সে কুলত্যাগী কী করলো, কার সঙ্গে পালালো তা নিয়ে তাদের মাথা-ব্যথার কিছু নেই। গায়ে কিছু ছোঁয়া লাগবার ভয়ও নেই। কাজেই নির্ভয়ে প্রাণ খুলে ব্যাপারটা নিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যেতে পারে।

বিশেষ করে শ্রীধর চাটুজ্জেও, দেখা গেলো, নির্বিকার। যে স্ত্রীর সঙ্গে কোনোদিন যোগাযোগই ছিলো না, তার বাপের বাড়ির ব্যাপারে কোনো ঔৎসুক্য না থাকারই কথা।

তবে ঐ রসালো খবরটার সুযোগ নেবার চেষ্টা করলো বড়বৌ মানদা-সুন্দরী। গল্পের একটি সরস বিষয়বস্তু হাতের নাগালে পাওয়ায় সেটির মাধ্যমে সে ছোটবৌ লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলো। খবরটা পেয়েই মানদাসুন্দরী লাবণ্যপ্রভার ঘরে ছুটে গিয়ে গালে হাত দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, হ্যাঁলো ছোটবৌ, শুনেচিস ব্যাপারটা ?

—কি ?—লাবণ্যপ্রভা একটা চটের আসনে রঙীন সুতো দিয়ে ফুল তুলছিলো, সতীনের মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলো, কি খবর ?

মানদা বুঝলো, লাবণ্যপ্রভা তবে খবরটা পায়নি। তাহলে গতরাত্রে কর্তাই তাকে খবরটা দিয়েছেন আগে, লাবণ্যপ্রভার কানে এখনো পৌঁছোয়নি। অথচ কর্তার কাছ থেকে আগে সে-ই জানতে পেরেছে জানালে লাবণ্যপ্রভা এখুনি রেগে হুলুস্থুল বাধাবে। তাই তাড়াতাড়ি বললো, একটা লোক কত্তাকে এসে বলছিলো, শুনে আমি ছুটে এলাম তোর কাছে।

এবং তারপরেই গালে হাত দিয়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে শুরু করলো : কী ঘেন্না, কী লজ্জা ভাই ! মনে মনে মাগীর এই ছিলো ! ছি ছি !—বলেই আরো ঘন হয়ে বসে লাবণ্যপ্রভাকে শোনাতে লাগলো বাসনাময়ীর কেলেংকারি-কথা যথাসম্ভব সরস করেই।

অথচ এক বর নিয়ে দুসতীনের ঝগড়াঝাটি, চুলোচুলি তো কম হয়নি ! পাড়ার লোক পর্যন্ত জড়ো হয়েছে কতবার। যায়-যায়-যৌবনা মানদাসুন্দরীর বাপের বাড়ির টাকার অহংকার আর ভরযৌবনা লাবণ্যপ্রভার রূপের গরব—দুইয়ের সংঘর্ষে বাড়ি যখন সরগরম হয়ে ওঠে তখন বুঝি বাড়িটায় কাক চিল পর্যন্ত বসতে পারে না।

শ্রীধর চাটুজ্জের অবস্থাও হয় শ্যাম রাখি না কুল রাখি। এদিকে বারো মাস তেরো পার্বণে মানদাসুন্দরীর বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব হিসেবে কাপড়-জামা বাসনপত্র মাছ মিষ্টি, কত কি এসে থাকে। সে সবের আকর্ষণও কম

নয়। আর ওদিকে যুবতী লাবণ্যময়ী লাবণ্যপ্রভা। তার কটাক্ষও হেলা-ফেলার নয়। অর্থাৎ এক প্রায়-প্রৌঢ়ার রূপোর টানে আর এক ভরাযৌবনার রূপের টানে পড়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রায়-বৃদ্ধ শ্রীধরের অবস্থাটাও ত্রিশংকুর মতোই। তিনি বড়োর ঘরে রাত কাটালে ছোট তার দেহ এলিয়ে, চুল মেলিয়ে উপোষ করে পড়ে থাকেন। আর ছোটর ঘরে রাত কাটালে বড়োর মুখে তুবড়ি ছুটতে থাকে সারাটা দিন। কাজেই পরদিন শ্রীধর চাটুজ্জের অনেকটা সময়ই যায়— কোনোদিন ছোটবৌয়ের মানভঞ্জন করতে, আর কোনোদিন বড়বৌয়ের পায়ে ধরে সাধতে। ডাইনে-বাঁয়ে নৈবেদ্য থাকলেও জ্বালা, আবার না থাকলেও শ্রীধরের দেহ মন দুইই যেন কেমন খাঁ খাঁ করে। হয়তো অভ্যাসের দোষ।

এহেন দুই সতীনের মধ্যে গালগল্প যতটা না হোক গালাগালি আর শাপশাপান্তই চলে বেশি। আর বাড়ির ঝি-চাকররাও সুবিধা বুঝে দুভাগ হয়ে দুই বৌয়ের দলে ভিড়ে যায়। তাতে প্রাপ্তিযোগটা ভালোই হয়। তাদের বাড়তি কাজ হচ্ছে যার-যার গিন্নীমা'র মন রেখে চলা, কথায় কথায় পোঁ ধরা আর গোপনে এর খবর ওকে দেওয়া।

কিন্তু সতীনাথ গৌরহাটিতে থেকে আবার এবাড়িতে আসার পর থেকেই মানদাসুন্দরী যেন নিজের মুখের লাগাম টেনে ধরেছে। এমন কি কর্তা ছোট-বৌয়ের ঘরে পরপর কয়েক রাত কাটালেও পরদিন বড়বৌয়ের মুখের তুবড়ি মোটেই জ্বলেনি। বরং পরদিন ছোটবৌকে হাতের কাছে পেয়ে হেসেই বলেছে: দেখিস ভাই ছোটবৌ, বেশি রাতটাত জাগিসনে, তাতে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, চেহারাও খারাপ হয়ে যাবে।

শুনে লাবণ্যপ্রভা হাসলেও অবাকও হয়েছে। যে সতীন, পাছে বর তার ঘরে যায়, তাড়াতাড়ি তাই কর্তার কাছা ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেছে, তার মুখে অমন কথা। যেন ভূতের মুখে রামনাম। অবশ্য সে-ও কম নয়। বড়ো সতীনের হাত কামড়ে দিয়ে বরকে উদ্ধার করে ঘরে ঢুকিয়ে খিল দিয়েছে কতবার।

বড় সতীনের কথায় তাই লাবণ্যও হেসে বলেছে: ভয় নেই দিদি, তোমার জন্যে রেখেই খাচ্ছি।

বড়বৌ মানদাসুন্দরীর এই ভাবান্তর বা রূপান্তর সতীনাথকে লক্ষ্য করেই। ছোটবৌয়ের বোনপো সতীনাথকে গৌরহাটি থেকে আবার ফিরে আসতে

দেখে মানদাসুন্দরী একটু আনমনাই হলো : আহা বেশ ছেলেটি। আমার চণ্ডুর সঙ্গে মানায় কিন্তু বেশ। তাছাড়া পালটি ঘরও। আর ছেলেটি যখন আবার ঘুরে এসেচে তখন হয়তো ভগমানের ইচ্ছেটাও ঐরকমই।

অবশ্য, সতীনাথ আবার কদিন বাদে মেসোর সঙ্গে যে ফুলপুরে ফিরে এলো সেটা শ্রীধরের ইচ্ছেতেই। নইলে সতীনাথ প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। কিন্তু শ্রীধর দেখলেন, ছেলেটা মনমরা হয়ে আছে, কথাবার্তা বেশি বলে না। তাই শ্রীধর বললেন, তুমি বাবাজী আমার সঙ্গে ফুলপুরে তোমার মাসীর কাছে কাটিয়ে আসবে চলো। তাতে মনটাও ভালো হবে। আর বাড়িঘর দেখবার জন্যে সতীনাথদেরই বিশ্বাসী এক চাষী প্রজাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে এলেন।

সতীনাথ বিশেষ আর আপত্তি করলো না, মেসোর সঙ্গে ফিরে এলো ফুলপুরে।

মানদাসুন্দরী একরাত্রে তার মনের কথাটা কর্তার কাছে পাড়লো। কিন্তু শ্রীধর প্রথমে কানে তুললেন না। বরং বললেন, বলচো বটে, তবে ছেলেটি ঘাড় পাতবে কিনা সন্দেহ। শহর-ঘোরা ছেলে, ওর মনমেজাজই আলাদা। বাবাজীর সঙ্গে কথা বলে দেখেচি, ওর মতে গাঁয়ের রীতি নীতিগুলো কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। গাঁয়ে গাঁয়ে স্কুল হওয়া দরকার, এসব পাঠশালা নয়। চেয়ার বেঞ্চি এনে স্কুল বসানো দরকার। ইংরিজিও পড়ানো দরকার। তাছাড়া কুলীনদের এই বহুবিবাহপ্রথাও আর চলা উচিত নয়।

—এটা বাপু ঠিকই বলেচে। —মানদাসুন্দরী বললো হেসে।

—হুঃ। আর কুলীনের আইবুড়ো সব মেয়েগুলো ভেসে বেড়াবে বুঝি? শ্রীধর যুক্তি দেখালেন।

তা মানদাসুন্দরীও বললো, আহা, ভারি তোমরা তাদের সগ্‌গে রেখেচো কিনা!—আরো বললো, তুমিই তো বলেচো, এটা নাকি ইঞ্জিরি কম্প না কী, তাদের রাজত্ব। ওদের নাকি রাজা নেই, রানীই রাজ্য চালায়—

—হ্যাঁ, মহারানী ভিক্টোরিয়া।

-তা সে মাগী কি চোখের মাতা খেয়ে বসে আচে।—মানদা যেন উত্তেজিতই : এসে একবার দেখতেও তো পারে এখেনে মেয়েমানুষদের কষ্টটা। কেমন সব সধবা হয়েও বিধবা হয়ে আছে।

শ্রীধর বললেন, হুঃ, সতীনাথও ঐ সবই বলছিলো। ঐ ইংরেজদের যেমন একজনের একটা করে বৌ থাকে, এখেনেও তেমনি হওয়া দরকার।—বলেই হাসলেন : আরো বলে কি জানো?

—কি ?

—বলে, বিধবাদেরও নাকি আবার বিয়ে হওয়া উচিত ।

শুনে চমকে উঠলো মানদা ঃ ধ্যেৎ !

—হ্যাঁ গো গিন্নী !—শ্রীধর বললেন, সাহেবদের নাকি অমন হয় !

—ধ্যেৎ !—বিশ্বাস করলো না মানদা ঃ বিধবার আবার বিয়ে হয় নাকি ? সে তো স্বামীর সঙ্গে চিতেয় ওঠে । তবে যার ইচ্ছে নেই তাকে জোরজার করে চিতেয় ওঠানোও যেন কেমন কেমন !

—তা তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি ?—শ্রীধর হাসলেন ।

—আমার ইচ্ছেটা ?

—হুঁ ।

মানদা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার কোলে মাথা রেখে ড্যাংডেঙিয়ে আগে চলে যাওয়া !—বলেই কথাটা ঘুরিয়ে দিলো মানদা ঃ তা হ্যাঁগো, সতীনাথ অতো সব জানলো কী করে ?

—ও নাকি কলকাতার এক সাহেবের বাড়িতে বাংলা পড়াতো ।

শুনে মানদা আঁতকে উঠলো ঃ শুনিচি, তারা তো গরু শুয়োর খায় ! তাদের ওখানে খেতো নাকি ?

—বললে তো, না—শ্রীধর বললেন, ও নাকি আলাদা রান্না করে খেতো । সাহেব আর তার বোন নাকি একদিন গাড়িসুদ্ধু নর্দমায় পড়ে গেছলো । তাদের নর্দমা থেকে তুলে আনায় সাহেব নাকি খুব খুশি হয়েছিলো সতীনাথের উপর ।

—তা সে মেম মাগীকেও হাত ধরে টেনে তুলেছিলো নাকি ?—মানদার মনটা খচখচ করতে লাগলো ।

—তা তুলেচে নিশ্চয়ই ।

—ছি ছি !—মানদা বললো, একে মেলেচ্ছো ছোঁয়াছুঁয়ি, নর্দমা ঘাঁটাঘাঁটি তার উপর মেমের হাত ধরা ! না বাপু, বামুনের ছেলে, এসব ভালো কথা নয় তো !

শ্রীধর বললেন, আর দেশে ফেরবার দিন সতীনাথ নাকি বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জের ছোটজামাইকেও নর্দমা থেকে তুলে বাড়ি পেঁছে দিয়েছিলো । সে নাকি মদ খেয়ে পড়েছিলো ।

—ওমা আমার কী হবে !—মানদা বললো, তোমার ঐ সময় বর, লোহারাম বাঁড়ুজ্জে ? তার জামাই ? কী কান্ড !—হঠাৎ মনে পড়লো ঃ

তা হ্যাঁগা, সন্ন তো তোমার মেয়ে। তার বিয়েতে তো গেলে না, একবার মেয়ে-জামাইকে আনাও না।

—হুঃ।—শ্রীধর বললেন, আমার মেয়ে কিনা তারই ঠিক নেই, মেয়ে-জামাই আনবো। তুমিও যেমন।·· নাও, এখন ঘুমোও।

কিন্তু এতগুলো নতুন নতুন খবরের পর সহজে কী আর চোখে ঘুম আসে।

মানদা বললো, তা লোহারাম বাঁড়ুজ্জে তার জামাইয়ের খবরটা পেয়েচে?

—না বোধহয়। তবে সতীনাথ বলছিলো খবরটা নাকি তাঁকে দেওয়া দরকার। তার কলকাতায় যাবার সময় নাকি লোহারাম বাঁড়ুজ্জে তাকে জামাইয়ের খবর পেলে দিতে বলেছিলেন।

মানদা মুখ বেঁকিয়ে বললো, আহা, কী খবরই পাবে বুড়ো।—বলেই সতীনাথের কথায় এলো মানদা: তা ছেলেটা যে নর্দমা ঘাটলো, মেলেচ্ছো ছুঁলো, তাছাড়া কী অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েচে তাও জানিনে বাপু, একটা কিন্তু পায়শ্চিত্ত করা দরকার।

—কে করাবে?—শ্রীধর বললেন, এসে তো শুনলো, মা মারা গেচে। আমিই সঙ্গে গিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি করালাম। তবে বলেচে, এখানে আসবার সময় গঙ্গায় স্নান করে তবে সে নৌকোয় উঠেছিলো।

তবুও মানদার মনে দ্বিধা: মানে ছোটবৌ তো করাতে পারে।

শ্রীধর হেসে বললেন, তুমি একবার বলে দেখো না?

—বটে।—মানদা বললো, আবার ফোঁস করে উঠবে না মাগী? অনেক কষ্টে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বশ করেচি। কেবল ঐ চণ্ডুর মুখ চেয়ে। —বলেই সাবধান করলো স্বামীকে: দ্যাখো, তুমি কিন্তু সতীনাথের কথা নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় গপপো করে বেড়িয়ো না যেন। পুরুষমানুষের ওসব কিছু ধরতে নেই।

শ্রীধর হেসে বললেন, আমার বলতে বয়ে গেচে। সে-ই তার বাহাদুরীর গল্প পাড়ায়-পাড়ায় করে বেড়ায়। বলে, আমি কাউকে ভয় করিনে। আর ভয় করলে ভালো কাজ করা যায় না।—একটু থেমে বললেন, গাঁয়ে ঢুকতেই তো হাটে অভয়চরণের দোকানের সামনে মারামারি করে ঢুকলো। আবার না মারধোর খায়।

—সত্যিই, ভাববার কথা—মানদা ভাবিতই হলো।

—তবে মনে হয়, ভাববার কিছু নেই—শ্রীধর বললেন, দেখলাম, গাঁয়ের

বেশ কয়েকটা ছেলেকে হাত করে দিব্যি মোড়লি করচে। তারাও সব সময়ে সতীনাথের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে দেখি।

মানদা এবার চুপ করলো। হয়তো মনে মনে কিছু ভাবতে লাগলো সে।

এই শ্রীধরই পরদিন রাত্রে ছোটবৌ লাবণ্যপ্রভার ঘরে শুয়ে সতীনাথের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

সতীনাথের প্রসঙ্গ ওঠালো লাবণ্যপ্রভাই। বললো, সতুকে দেখে পর্যন্ত বড়গিন্নীর হাবভাব লক্ষ্য করেচো ?

—কী রকম ?—শ্রীধর ভালোমানুষটি সাজলেন।

—কেন, দেখো না, গিন্নীর গলা যেন বুজে গেচে একেবারে। মুখ দিয়ে খেজুরের রস গড়াচ্চে সব্বক্ষণ। আর ছোটবৌ ছোটবৌ করে তো হেদিয়ে গেলো একেবারে। এখন আমার ঘরে রোজ রাত্তিরে তুমি শুতে এলেও আর তোমার কাছা ধরে টানবে না, বলে দিচ্চি।

শ্রীধরের আবার বোকা-বোকা কথা : তাই নাকি ? কারণ ?

—চণ্ডু গো, চণ্ডু !—লাবণ্যপ্রভা বললো, সতুর সঙ্গে চণ্ডুর বিয়ে দেবার ইচ্ছে !

—তাই নাকি ?

—হুঁ, সেদিন বলছিলো কথায়-কথায়। বলছিলো, জানিস ছোটবৌ, তোর বোনপোটি কিন্তু ভারি ভালো ছেলে। দেখতে-শুনতেও বেশ। জামাই করবার উপযুক্ত।

—তা কথাটা বড়বৌ ঠিকই বলেচে।—শ্রীধর বললেন, অমন ছেলে বড়ো-একটা দেখা যায় না। যাকে বলে পুরুষের বাচ্চা। যেমনি তেজ তেমনি চেহারা। শহর-ঘোরা ছেলে, পাঁচরকম দেখে এসেচে, ইংরিজি শিখেচে, সাহেবদের সঙ্গে মিশেচে···হবে না ? ওদের হাবভাবই আলাদা। বলে, দেশকে গড়ে তুলতে হবে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে হবে। সাহেবদের ভালো জিনিসটা নিতে হবে। তাদের কাছে অনেক কিছুই শিখতে হবে। দ্যাখো না, গাঁয়ের ছেলেদের কেমন হাত করে ফেলেচে। সবাই তো দেখি সতুদা বলতে অজ্ঞান।···তা অমন ছেলেকে কে না জামাই করতে চায় বলো ?

লাবণ্যপ্রভার বুকখানা বোনপোর গর্বে ফুলে উঠলো যেন।

বললো, চণ্ডু তো তোমারও মেয়ে। তোমার কি ইচ্ছেটা বলো শুনি ?

শ্রীধর বললেন, ইচ্ছে তো আমারও। তবে কিনা—

—কি, তবে?

—তোমার মত থাকা চাই।—শ্রীধর ছোটবৌয়ের মনরাখা কথা বললেন: তাছাড়া সতীনাথের তো মনটাও বোঝা দরকার। বাইরে সব দেখেশুনে এসেচে, অতটুকু মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ।

লাবণ্যপ্রভা একটু ভেবে বললো, আমার অবশ্য অমত নেই। বরং এ বিয়ে হলে বড়গিন্নী আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকবে। তাছাড়া দিদিও চলে গেলো,...এখন একটা বে-থা দিয়ে ওকে সংসারী করতে পারলেই আমার ভাবনা চোকে। বাড়িতেও মন বসে ওর।

শ্রীধর বললেন, তা যা বলেচো! এমন একলা থাকাও ভালো নয়। আজকালকার ছেলে তো। মতিগতি কখন কোনদিকে যায় তা বলা যায় না।

লাবণ্যপ্রভা চিন্তিত হয়েই বললো, হুঃ।

৩৫

তা সতীনাথের মতিগতি সত্যিই ফুলপুরের গাঁয়ের লোকেরা বুঝতে পারে না। গাঁয়ের লোকেরা দেখে শ্রীধর চাটুজ্জের ছোটবৌয়ের বোনপো আবার এসে জুটেছে। আর, গাঁয়ের কতকগুলো ছেলে জুটিয়ে নিয়ে হৈ-হৈ করছে—গাঁয়ের মঙ্গল করা হচ্ছে নাকি? গুষ্ঠির মাথা হচ্ছে!

কিন্তু গোষ্ঠিপতি হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে সতীনাথ। কী খেয়াল হয়েছে তার, এই ফুলপুরেই সে তার কাজ শুরু করবে। কলকাতা থেকে ফিরে এই ফুলপুরে ঢোকবার সময়ই সে বাধা পেয়েছিলো, এই গাঁয়ের মাটিতেই সে উলটে পড়েছিলো, এই গাঁয়ের ধুলো-মাটিই লেগেছিলো তার সর্বাঙ্গে। হাটে অভয়চরণের দোকানের সামনে গাঁয়ের হরিহর চাটুজ্জে তাকে বলেছিলো, বেরিয়ে যাও গাঁ থেকে!

তাই সতীনাথ এই গাঁয়েই যেন গোঁ ধরে গ্যাঁট হয়ে বসলো। হরিহর চাটুজ্জে তার বুকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলো, তাই সে তার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়েই চলতে চায়।

একদিন দুপুরে শ্রীধর চাটুজ্জের আমবাগানে সতীনাথ জড়ো করলো সবাইকে। এলো কার্তিক গণেশ মহেশ কালিচরণ গোবর্ধন জগন্নাথ

পতিতপাবন গৌর এবং আরো অনেকেই। গাঁয়ের অনেক কুচোরাও জুটে গেলো দাদাদের আশেপাশে।

সতীনাথ বললো, আজকাল গুরুমশায়দের পাঠশালাতে কিছু হয় না। গুরুমশায় ঘুমোয় আর পড়ুয়াগুলো গল্প করে। পরে ঘুম থেকে উঠে যাকে-তাকে বেধড়ক পেটানোই হচ্চে গুরুমশায়ের কাজ। পড়ানোর বেলায় কিছু নেই, কেবল শাস্তির বহর আছে খুব। দেখলে গা শিউরে ওঠে! পড়ুয়াদের মারলে পড়ুয়ারা কখনো পাঠশালায় যেতে চায়? তাদের পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার, তাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলা দরকার, তাদের সঙ্গে গল্প করা দরকার।

ছেলেরা বুঝলো, সতীনাথের কথাগুলো যেন ভালোই। ঘাড় নেড়ে সায় দিলো তারা।

—তাছাড়া—সতীনাথ বললো, এখন আমাদের একটু ইংরিজি শেখাও দরকার। ইংরেজের রাজত্ব এটা। ইংরিজি শিখলে সাহেবদের কাছে ভালো চাকরি পাওয়া যায়। সবাইকে যে গাঁয়ে কুপমণ্ডুক হয়ে বসে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে? বাইরে বেরুতে হবে, জগৎটাকে দেখতে হবে, বড়ো হতে হবে, তবে তো!

ছেলেরা এমন সব কথা কোনোদিনই শোনেনি। বরং শুনেছে ঘোঁট পাকানো, দল পাকানো, পরনিন্দা, আর বহু রকমের নোংরা আলোচনা।

তারা সতীনাথের কথায় যেন নতুন আলো দেখতে পায়।

তবু মনে দ্বিধা। জিগ্যেস করে, কে পড়াবে ইংরিজি?

—আমি পড়াবো। তোদের শেখাবো। তোরা আবার ছোটদের শেখাবি।

—কোথায় পাঠশালা বসবে?

—কেন, এখেনে, এই আমবাগানে।

—বেশ হবে, ভালোই হবে।

—তবে কাল থেকেই হোক।—সতীনাথ আর দেরি করতে চায় না।

কুচোরা ধরলো, আমরাও পড়বো। গুরুমশায় বড্ড মারে, ও পাঠশালায় আর যাবো না!

—বেশ তো আসিস তোরা।—সতীনাথ হাসলো।

এবং পরদিন থেকে পাঠশালা বসে গেলো শ্রীধর চাটুজ্জের আমবাগানে।

পড়ুয়ার দলও জুটে গেলো সহজেই। পড়তে গিয়ে মার খেতে হবে না, একি কম কথা।

আর একদিন সতীনাথ বললো সবাইকে, এই কার্ত্তিক গণেশ গোবর্ধন, শোন তোরা, কাল আমরা চান করবার সময় হালদারদের পুকুরটা পরিষ্কার করবো, বুঝলি? ঝাঁঝি আর শ্যাওলায় পুকুরটায় চান করা যায় না। জলেও গন্ধ।

—ওরা যদি বারণ করে?—গোবর্ধন বললো।

—আমরা তো ভালো কাজ করচি রে। ওদের উপকার করে দিচ্ছি।

—হালদার খুড়ো কিন্তু ভারি রগচটা মানুষ।—পতিতপাবন জানালো।

—আচ্ছা, দেখাই যাক না।—বললো সতীনাথ।

পরদিন স্নানের সময় ছেলের দল পুকুরে নেমে ঝাঁঝি শ্যাওলা তুলতে লাগলো। খবর পেয়ে ছুটে এলেন হালদার মশায়ঃ বলি, এসব কি হচ্চে?

সতীনাথ হেসে বললো, আপনার উপকার করা হচ্চে। অবশ্য আমাদেরও। আপনার পুকুরে অনেকে চান করে, জল নিয়ে খায়, তাই পরিষ্কার করচি।

হালদার মশায় চেঁচিয়ে বললেন, চাইনে অমন উপকার। যাও সব এখান থেকে।

—কিন্তু আপনার ক্ষতিটা কি হয়েচে?—জিগ্যেস করলো সতীনাথ।

—আমার মাছগুলো রোদ্দুরে মরে যাবে না।—বললেন হালদার মশায়।

—বেশ তো, ঘাটের কাছে খানিকটা না হয় পরিষ্কার করে দিই?

—না।

এমন সময় খিড়কি দরজা দিয়ে দেখা দিলেন একটি ঘোমটা-ঘেরা স্ত্রীলোক। তিনি হালদার মশায়ের পেছনে এসেই হাত বাড়িয়ে পিঠে কাটলেন এক চিমটি। হালদার মশায় চমকে পেছন ফিরে দেখেন, তাঁর গিন্নী। ঘোমটা থেকেই হালদার-গিন্নী বললেন, ভেতরে এসো।

হালদার মশায় ভিতরে যেতেই গিন্নী ঘোমটা উঠিয়ে নথ নেড়ে বললেন, কেন, ছেলেগুলো তো উপকারই করচে। ওদের পেছনে লাগতে গেচো কেন? নিজের তো মুরোদ নেই। ছেলেগুলো পরিষ্কার করচে, ভালোই তো। হুঃ। বুড়োর বিটকেলমি যতো।

নথনাড়া খেয়ে হালদার মশায় চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সতীনাথ বাধা পেলো দীনু বিশ্বাস বা দীনু খুড়োর কাছে। দীনু খুড়োর বাড়ির আমগাছের একটা ডাল বেড়ার বাইরে লোক চলাচলের কাঁচা পথটার উপর এমন ভাবে ঝুলে পড়েছে যে মাথা নীচু করে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না কারোর। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বা রাতের অন্ধকারে ঐ পথটা দিয়ে চলতে গেলে মাথায় ঠোক্কর খেতে হয়, অনেকে খেয়েছেও। সেদিন দত্তদের ছোট ছেলে গৌরই অন্ধকারে ঐ পথ দিয়ে আসবার সময় আচমকা মাথায় ঠোক্কর খেলো, মাথার খানিকটা কেটেও গেলো। অথচ মোটা ডালটার কথা জানে সে, তবুও। হয়তো অন্যমনস্কই ছিলো।

হাত দিয়ে মাথার কাটা জায়গাটা চেপে ধরে গৌরটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে সতীনাথকে বললো, দেখচো সতুদা, আসতে গিয়ে দীনু খুড়োর ঐ আমগাছের ডালটায় কেমন করে মাথাটা ঠুকে গেলো।

সতীনাথ দেখলো, সত্যিই গৌরের মাথায় খানিকটা রক্ত। একটু জল ন্যাকড়া দিয়ে রক্তটা মুছিয়ে দিয়ে মাথায় একটা ফেটি বেঁধে সতীনাথ বললো, বেশি কাটেনি। তবে ডালটাকে কাটা দরকার।

—ও বাবা!—শুনে গৌর আঁতকে উঠলো: তাহলে কিন্তু দীনু খুড়োই আমাদের কেটে ফেলবে। অথচ কতজনের যে মাথা কেটেছে ঐ ডালে তার ঠিক নেই।

—বেশ তো!—সতীনাথ বললো, কাল সকালে কুড়ুল-কাটারি নিয়ে ছেলের দল তো চল ওখানে, তারপর দেখা যাবে।

তাই ঠিক হলো।

পরদিন দুটো কুড়ুল আর একটা কাটারি আর একগাছা দড়ি নিয়ে ছেলের দল জড়ো হলো ঐ আমগাছের ডালের তলায়।

কার্তিক আর মহেশকে সতীনাথ বললো, তোরা দুজন ঐ ডালের আগা দিয়ে লাফিয়ে উঠে গোড়ায় গিয়ে ঐ বেড়া সোজাসুজি কোপ লাগা—হেসে বললো, দেখিস, যে ডালে বসবি সেই ডালই কাটতে হবে কিন্তু, তবে কালিদাসের মতো আগার দিকে বসিসনে যেন! তারপর আর ছেলেরা দড়ি বাধিয়ে টানবে'খন।

কার্তিক আর মহেশ সেইমতো দুটো কুড়ুল নিয়ে আগডালে উঠে গোড়ার দিকে গেলো। সতীনাথ বললো, তোরা কেউ কাটারিটা নিয়ে ছোট-ছোট ডালগুলোকে কেটে ফ্যাল আগে, তাতে দড়ি বেঁধে ডালটাকে সরিয়ে দেওয়ার সুবিধে হবে।

কিন্তু ডালে দু'চারটে কুড়ুলের কোপ পড়তেই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন দীনু খুড়ো। খুড়ো গেছলেন অভয়চরণের দোকানে কী যেন কিনতে, এমন সময় খবরটা দিলো সেই হরিহর চাটুজ্জে। বললো, খুড়ো, শীগগির যাও। ঐ ছিধর চাটুজ্জের পুষ্যিপুত্তুর দল পাকিয়ে তোমার অমন ফজলি আমের গাছটা কেটে একেবারে সাবাড় করে দিচ্চে। আমি দূরে থেকে দেখেই ছুটে এলাম খবরটা দিতে।

দীনু খুড়ো খবর পেয়েই ছুটে এলেন। তাঁর পেছনে ছুটে এলো আরো দু'তিনজন। পাড়ার বাচ্চাগুলোও জড়ো হয়ে গেলো। আর একটু গা-ঢাকা দি'য় থাকলো হরিহর।

—এই! তোরা আমার গাছ কাটচিস যে?—হুংকার দিলেন দীনু খুড়ো।

সতীনাথ হেসে বললো, গাছ নয় খুড়ো, ডালটা শুধু।

—কেন, ডালটাই বা কাটবে কেন?

—লোকের মাথায় ঠোক্কর লাগে যে!

—তা লোকে অন্ধ হয়ে চলে কেন?

—কিন্তু চেয়ে চললেও অন্ধকারে লাগে যে!—সতীনাথ গোরকে দেখিয়ে বললো, ঐ দেখুন, কাল রাত্তিরে ঐ ডালে লেগে মাথাটা কেটে গেচে এর।

দীনু খুড়ো দেখলেন, গোরের মাথায় ফেটি বাঁধা।

গোবর্ধন বললো, জানো সতুদা, আরো অনেকের মাথা ঐ ডালে লেগে কেটে গেচে।

শুনে ধমকে উঠলেন খুড়োঃ চুপ কর! সব গুণ্ডামি করতে আসা হয়েচে।—কার্তিক আর মহেশকে বললেন, নাম শীগগির ডাল থেকে। আমার ফজলি গাছের ডাল, কাটলেই হলো! সব ফাজিল কোথাকার!

—কিন্তু···।—সতীনাথ দীনু খুড়োর দিকে তাকালো।

দীনু খুড়ো বললেন, দেখো বাবাজী, তুমি কলকেতার শহর থেকে এয়েচো, তাই হয়তো তোমার রক্ত গরম। তাবলে গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা গরম করিয়ো না। গাঁয়ের ভালো করতে চাও, নিজের গাঁয়ে করোগে যাও। এখেনে দু'দিনের জন্যে এয়েচো মেসোর বাড়িতে, মাসীর আদর খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও বাবাজী, ভালো কথাই বলচি।

সতীনাথ বললো, আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। তবে ডালটা কেটে দিলে আপনার গাছের কোনো ক্ষতি হতো না, অথচ লোকেরা এ পথে নির্ভয়ে যেতে পারতো।—তারপর থেমে বললো, তবে

ঐ যে বললেন এ গাঁ ছেড়ে যেতে, সে যাওয়া না-যাওয়াটা মেসো আর মাসীর উপর নির্ভর করচে, আপনার উপর নয়।

দীনু খুড়ো বললেন, বেশ, না হয় আমার কথায় গাঁ ছাড়বে না। তবে আপাতত আমার গাছের ডালটা ছাড়ো দিকিন।

সতীনাথ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলো: এই কার্তিক মহেশ, নেমে আয়।

সতীনাথ দলবল নিয়ে আর দাঁড়ালো না সেখানে।

দীনু খুড়ো বিজয়গর্বে মুচকে হাসলেন একটু।

৩৬

এইসব ব্যাপারের পর গাঁয়ে একটু জটলা না হলে যেন মানায় না। দীনু বিশ্বাসই যাকে সামনে পেলেন ডেকে সবাইকে বটতলায় চণ্ডীমণ্ডপে জড়ো করলেন। অবশ্য এর মধ্যে নিজের বাহাদুরি দেখানোটাও একটা উদ্দেশ্য ছিলো।

—হুঃ! ছোঁড়াগুলো এসেছিলো কেউটের ল্যাজে পা দিতে।—দীনু খুড়ো বললেন, তা বাছাধনরা বুঝে গেচে, এ বড় শক্ত মাটি!

হরিহর চাটুজ্জের রাগ ছিলো সতীনাথের উপর। বললো, ঐ শহুরে ছোঁড়াটাই তো পাজীর পা-ঝাড়া! গাঁয়ে এসে ছেলেগুলোকে খেপাচ্চে! নইলে এতদিন তো এমন সব জুলুমবাজি হয়নি। বলেই হাত মুখ ঘুরিয়ে বললো, বুঝেচো খুড়ো! সেদিন তো দূর থেকে যেই দেখা তোমার আমগাছ কাটবার মতলব করেচে ওরা, আমি অমনি হন্তদন্ত হয়ে তোমাকে খবর দিতে ছুটলাম।

—ভালোই করেচিস। বেঁচে থাক বাবা। নইলে আমার অমন সাধের গাছটা যেতো আর কি!—দীনু খুড়ো হাসলেন।

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, তা তো হলো, কিন্তু এর তো একটা বিহিত করা দরকার।

—নিশ্চয়ই দরকার।—দীনু খুড়ো জোর পেলেন।

আরো জোর দিয়ে বললো হরিহর, আলবৎ!

দীনু খুড়ো বললেন, ঐ, ঐ ছিধর ঠাকুরের পুষ্যিপুত্তুরটিই তো যতো নষ্টের গোড়া!

হরিহর বললো, পরান তো বলে গেলো, সে বাড়ি থেকে শ্রীধর ঠাকুরকে

ডেকে নিয়ে আসবে এখেনে। এলে তখন বলো, এসব তো ভালো কথা নয়।

—সে তো বটেই।—ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, ক্রমেই আশকারা পেয়ে ছোঁড়াগুলো বেড়েই যাবে। কাল তোমার গাছের ডাল কাটতে গেছলো, আজ অমুকের টিকি কাটতে যাবে, কাল তমুকের পৈতে ছিঁড়তে যাবে!

হরিহর হয়তো দেখলো, বড়ো নিরামিষ আলোচনা হচ্ছে। বললো, তারপর হয়তো কারোর বৌ-ঝির হাত ধরে টানবে! ওদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। শুনেচি, সুতোনুটি কোলকেতার সাহেবরা নাকি মেমসাহেবদের হাত ধরে চলে, মেমসাহেবদের এক-একজনের নাকি চার-পাঁচটা করে পীরিতের লোক থাকে। ঐ ছোঁড়া এই গাঁয়ে ঐসব চালাতে চায়!

হালদার মশায় এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। বললেন, তা তো চালাতেই চায়! ছিধরের আমবাগানে তো ইংরিজি পাঠশালাই বসিয়ে দিয়েচে! তাছাড়া আমার উপরেও কি সেদিন কম অত্যাচার হয়ে গেলো!

—হুঁ। তা-ও তো শুনলাম!—ঈশান গাঙ্গুলী বললেন।

হালদার মশায় বললেন, আরে বাবা, আমার পুকুরে শেওলা পানা আছে তাতে কার বাবার কি? তা সেদিন লাঠির ঘায়ে বাছাধনদের মাথা দুফাঁক করেই দিতাম, নেহাত গিন্নী এসে হাতটা চেপে ধরলো, তাই—।

হরিহর হেসে বললো, দাদা, তাতে আপনার লাঠিই ভাঙতো, সাপ আর মরতো না।—তারপর একটু ঢোক গিলে বললো, তবে আমি শুনলাম, ব্যাপারটা নাকি অন্যরকম—

—কী রকম?—ঝাঁঝিয়ে উঠলেন হালদার মশায়।

—নাও, তোমরা এখন ঝগড়া শুরু করলে। থামো তো!—দীনু খুড়ো ধমক দিলেন: এখন কথাটা হচ্চে, ঐ ছোঁড়াটাকে এখন সরানো যায় কেমন করে?

হরিহর মুচকে হেসে বললো, কোত্থেকে? এই গাঁ থেকে, না ইহজগৎ থেকে?

দীনু খুড়ো মুখ ভেংচে বললেন, থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। নিজেই তো দেখেচিস ছোঁড়াটার গায়ে কেমন অসুরের মতো জোর!

—হুঃ!—হরিহর বললো, তাকে চিৎ করে ফেলেছিলাম না? নেহাত ঐ ছিধর ঠাকুর এসে গেলো, তাই! বুঝলে খুড়ো, এই শম্মাও কম যায় না

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, থাক এখন ওসব কথা। আমি ভাবচি কি,

শ্রীধর ভায়াকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে যাতে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

দীনু খুড়ো বললেন, সেটা কি আর শ্রীধর চাটুজ্জের কথায় হবে? মনে রেখো, ছোকরা শ্রীধর চাটুজ্জের ভাই বা ভাইপো নয়, খোদ ছোটগিন্নীর বোনের ছেলে। একে কুটুম্বু, তার উপর ছোটগিন্নীর বাপের বাড়ির ব্যাপার—

বলতে বলতেই দেখা গেলো পরান মিস্তিরের সঙ্গে শ্রীধর চাটুজ্জে আসছেন চণ্ডীমণ্ডপের দিকেই। দেখামাত্রই সকলের মধ্যেই একটা 'চুপচুপ' ভাব দেখা গেলো।

কাছে আসতেই ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, এসো ভায়া এসো। বসো।—নিজের পাশেই জায়গা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

দীনু খুড়ো, হালদার মশায়, হরিহর প্রভৃতিরাও মুখ বুজে রইলেন না, প্রায় সমস্বরে বললেন, আসুন, আসুন চাটুজ্জে মশায়!

শ্রীধর চাটুজ্জের মনে হলো তাঁর অভ্যর্থনার মাত্রাটা যেন একটু বেশিই। তাছাড়া পরান মিস্তিরও তাঁকে ডাকবার সময় একটু আঁচও দিয়েছে : এই আপনার সঙ্গে গাঙ্গুলী মশায়রা একটু পরামর্শ করতে চান, তাই একবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যদি আসেন···

আলোচনা বা পরামর্শের বিষয়বস্তুটা কি তা বুঝতে শ্রীধর চাটুজ্জের দেরি হয়নি। বরং এইরকম একটা আলোচনা-বৈঠকে তাঁর যে একদিন ডাক পড়বে সেটা তিনি মনে মনেই বুঝেছিলেন। তাই পরান মিস্তিরের ডাকে তিনি 'কেন' 'কি জন্যে' ইত্যাদি জেরা না করেই বললেন, চলো যাই।

শ্রীধর চাটুজ্জে ঈশান গাঙ্গুলীর পাশে জোড় আসন হয়ে গুছিয়ে বসে বললেন, তারপর, কী ব্যাপার? হঠাৎ জরুরী তলব যে!

শুনেই গাঙ্গুলী মশায় জিব কাটলেন : ছি, ছি! কী যে বলো ভায়া! তোমাকে তলব করতে যাবো আমরা? কার সে সাহস আছে এই ফুলপুর গাঁয়ে বলতে পারো?

কথাটায় উপস্থিত আর সকলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। শুধু দীনু খুড়ো সরব হলেন : গাঙ্গুলী ঠিকই বলেচে। তুমি হলে গাঁয়ের মাথা!—তারপর মাথাটা চুলকে বললেন, তবে আসল ব্যাপারটা কি জানো ভায়া? গাঁয়ের ছেলেগুলো ক্রমেই কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে যাচ্চে।

শ্রীধর চাটুজ্জে হেসে বললেন, কেন, সেরকম মনে হচ্চে নাকি?

দীনু খুড়ো শুনেই হাতমুখ নেড়ে বললেন, কেন, জানো না, সেদিন

ছোঁড়াগুলো আমার ঐ ফজলি গাছের ডালটা কাটতে গেছলো। এতোদিনকার ডাল, হঠাৎ সেদিন কাটবার ফন্দী মাথায় তাদের এলো কেন ?

—তা ঐ নীচু ডালটায় তো অনেকেই মাথায় গুঁতো খেয়েচে।—শ্রীধর চাটুজ্জে বললেন, কেন ঈশেন, তুমি একবার খাওনি ?

ঈশান গাঙ্গুলী থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা একবার—

হালদার মশায় বলে উঠলেন, আর আমার পুকুরের উপর অত্যাচার করে গেলো ছেলেগুলো। নাকি ঝাঁঝি পরিষ্কার করচে। আর আমার মাছগুলো রোদ্দুরে সব মরে যাক আর কি।

শ্রীধর চাটুজ্জে হেসে বললেন, কিন্তু হালদার-গিন্নীর তো এতে কোনো আপত্তি নেই। বরং বলেচেন, পাঁচজন ঐ পুকুরের জল খায়। কাজেই পরিষ্কার হলেই ভালো।

শুনে হালদার মশায় ঈষৎ গরম হয়ে উঠলেন : আপনাকে কে বললো সে কথা ?

—বাতাসে উড়ে এলো কানে —শ্রীধর চাটুজ্জে আবার হাসলেন।

এদিকে দীনু খুড়ো আর ঈশান গাঙ্গুলী আড়ালে নিজেদের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি শুরু করলেন। ভাবটা : এ ঠিক হচ্চে না, আসল কথাটা পাড়ো।

এমন সময় দুম করে হরিহর বলে বসলো : আবার ইংরিজি পাঠশালা বসিয়ে গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া হচ্চে। সব সায়েব হচ্চে!

শুনেই ধমক দিলেন শ্রীধর চাটুজ্জে : তুমি চুপ করো। মাথা খাওয়া হচ্চে না মাথা তোয়ের হচ্চে, তুমি তার কি বুঝবে ? আর সেটা হচ্চে আমার আমবাগানে। আর পড়ুয়ারা আসচে নিজের ইচ্ছেয়, কেউ ধরে আনচে না তাদের।

শ্রীধর চাটুজ্জের এই ধরনের কথায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব দেখা গেলো। গাঁয়ে এর আগে কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে, কাউকে আসামী সাব্যস্ত করবার সময় দেখা গেছে বিচারকরাই মুখর হয়ে উঠেছেন, অভিযুক্ত হয়েছে মূক অসহায়। এখানে দোষী চোখ রাঙায়, বিচারকরা ভয় পায়, এমনটা তো হয়নি কখনো।

না, আর চুপ করে থাকা উচিত নয়। দীনু বিশ্বাসই ঘা খেয়েছেন, কাজেই তাঁকেই কথাটা বলতে হলো : মানে, শ্রীধর ভায়া, ব্যাপারটা হচ্চে কী, তোমার ঐ শ্যালিকা-পুত্রটি আসবার পর থেকেই গাঁয়ের ছেলেরা কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে গেচে।

শ্রীধর চাটুজ্জে ছোট্ট প্রশ্ন করলেন : সেটা বুঝলে কেমন করে ?

—লোকে তাই বলচে।

—তুমি কি বলচো, তাই বলো।

দীনু খুড়ো আমতা আমতা করে বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

—তা আমাকে কি করতে বলো ?—আবার প্রশ্ন।

—তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো।

শ্রীধর চাটুজ্জে বললেন, দেখো দীনুভায়া, ছেলেটির বয়েস হয়েচে, বুঝতে শিখেচে, বাইরে শহরে ভালো-মন্দ দেখে এসেচে, গাঁয়ে ভালো করবার চেষ্টা করচে, তাকে আমি কি বলতে যাবো বলো ?—তারপর একটু থেমে বললেন, তাছাড়া সতীনাথ আমার কুটুম্বু।

ঈশান গাঙ্গুলী হেসে বললেন, তা কুটুমবাড়িতে আর কতোদিন—

—সেটা তার ইচ্ছাধীন!—সোজা উত্তর দিলেন শ্রীধর।

এবার হালদার মশায় বললেন, তালে বোঝা যাচ্চে, আপনারও ঐসব ব্যাপারে মত আছে।

—সেটা যা মনে করো।—শ্রীধর বললেন, তাবলে আমি তো কুটুমের গলায় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারিনে। তোমরা যদি পারো, তাকে গাঁ থেকে বার করে দাও।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর : আচ্ছা, চলি এখন। বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে।

শ্রীধর চাটুজ্জে উঠে প্রায় বুক ফুলিয়েই চলে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গাঁয়ে যা ঘটলো, তাতে গাঁয়ের লোক কেউ-কেউ বুঝলো, নাঃ, ঐ সতু ছোকরা দু-একটা ভালো কাজও করতে পারে, অবশ্য যদি ইচ্ছে করে।

ফুলপুর গাঁয়ে হঠাৎ এক শেয়ালের উপদ্রব শুরু হলো।

রাত্রে এসে এর ছাগল টেনে নিয়ে যায়, ওর হাঁস টেনে নিয়ে যায়, অথচ ধরতে পারে না কেউই। তাছাড়া যার যায়, তারই যায়, কেউ এগিয়েও আসে না সাহায্য করতে।

শেষকালে শেয়ালটার সাহস বেড়ে গেলো বোধহয়, ঈশান গাঙ্গুলীরই কদিনের বাছুরটাকে গোয়ালঘর থেকে তার টুঁটি কামড়ে টেনে নিয়ে চলে

গেলো। পরদিন দেখা গেলো বাছুরটার হাড়গোড় আর চামড়া পড়ে আছে মাঠের ধারে এক ঝোপের আড়ালে।

ঈশান গাঙ্গুলী প্রায় কেঁদে এসে পড়লেন সতীনাথেরই কাছে : বাবা, তুমি লোকের উপকার করে থাকো, তুমিই এর একটা বিহিত করো বাবা। নইলে তো গাঁয়ে বাস করা দায় হয়ে উঠলো! আর, এ গাঁয়ে একটা মানুষ নেই, যে কিনা এই সব অত্যাচারের প্রতিকার করতে পারে। এ কাজটা তোমরাই পারবে বাবা। নইলে আর কারোর দ্বারা হবে না।—পরে তাঁর ব্যগ্রতার আসল কারণটাও কথার ঝোঁকে বলে ফেললেন. তাছাড়া আমার যে আরো দুটো গরু গাভীন বাবা!

সতীনাথ বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জের বাড়ি থেকে ফুলপুরে ফিরছিলো। পথে ঈশান গাঙ্গুলীর কাছে সব শুনে বললো, আচ্ছা, দেখি কী করতে পারি!

ঈশান গাঙ্গুলী নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, দেখো বাবা, তোমরাই পারবে।

—তবে একটা কাজ করতে হবে যে। - সতীনাথ বললো।

—বলো বাবা, কি করতে হবে?

—একটা হাঁস বা ছাগলের বাচ্চা দরকার হবে। শেয়ালটাকে লোভ দেখিয়ে নাগালের মধ্যে আনতে হবে তো!

প্রস্তাবটা শুনে ঈশান গাঙ্গুলী কিছুক্ষণের জন্যে দম ধরে রইলেন। পরে বললেন, আচ্ছা বাবা, তাই হবে। একটা হাঁসই দেবো বাবা!—পরে মুখখানা ব্যাজার করেই বললেন, আসল কথাটা কি জানো বাবা? উপকারটা গাঁয়ের সকলেরই হবে, অথচ খয়রাতি করতে হবে আমাকেই। কিন্তু উপায় নেই, গরজটা যে আমারই!

সতীনাথ হেসে বললো, জানেনই তো গরজ বড় বালাই।

এবং সেইদিনই সন্ধ্যার মুখে গাঁয়েরই নিতাই মণ্ডলের দেড়বছরের ছেলেটাকে ঘরের দাওয়া থেকে টেনে নিয়ে গেলো শেয়ালটা। মণ্ডলের বৌ গেছলো বাচ্চাটাকে দাওয়ায় রেখে ঢেঁকিঘর থেকে ধানের কুঁড়োগুলো আনতে, ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই! খোঁজ খোঁজ—আর খোঁজ!

মণ্ডলের বৌ হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলো, কিন্তু কান্নাই সার! পাড়ার কারোরই কান্না এলো না, সে কান্না দেখে!

শুধু পরদিন অনেকেই ছুটে গেলো দেখতে, হালদার মশায়ের পুকুরেরই পশ্চিম কোণে বাঁশঝাড়ের মধ্যে পড়ে আছে বাচ্চাটার মুণ্ডুটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে!

সেইদিনই রাত্রে সদর থেকে গাঁয়ে ফিরছিলো সতীশ কামার। হঠাৎ শেয়ালটা কোত্থেকে এসে খ্যাঁক করে তার বাঁ পায়ে এক কামড় দিয়ে গেলো পালিয়ে। সতীশ কামার 'গেলাম রে গেলাম রে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই যে বিছানায় এসে শুলো ধড়াম করে আর উঠলো না সে।

সতীনাথ বললো তার দলকে : আর দেরি নয়। আজই ঐ শেয়ালের শেয়াল-জন্ম শেষ করতে হবে।

পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো ঈশান গাঙ্গুলী একটা বুড়ো হাঁসও দিলেন এবং সতীনাথের দল সেটাকে এক ঝোপের ধারে বেঁধে রেখে, আড়ালে লাঠি নিয়ে সতীনাথের ব্যবস্থামতো এখানে-ওখানে অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই।

হাঁসটা বেশ খানিকক্ষণ ধরে প্যাঁক-প্যাঁক করে বোধহয় ঝিমিয়েই পড়েছিলো। একফালি চাঁদের আবছা আলোয় আশপাশটা ঘোলাটে আর থমথমে। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে লাঠিহাতে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করছে, কোথাও বুঝি গাছের পাতাও নড়ছে না, এমন সময় শোনা গেলো শুকনো পাতার ভাঙা-ভাঙা থামা-থামা চাপা শব্দ—দ্বিধাগ্রস্ত। শেয়ালটা আসছে। আধ-অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে, আবার থামছে। দেখছে এদিক-ওদিক, আবার এগুচ্ছে। লক্ষ্য হাঁসটার দিকেই। জানতে পেরেছে আর একটি সুখাদ্য ওখান পাওয়া যাবে। হাঁসটাই জানিয়ে দিয়েছে তার প্যাঁক-প্যাঁকানি শব্দে। আরো এগিয়ে গেলো শেয়ালটা অতি সন্তর্পণে একটা ছায়ার মতোই। একটা হিংস্র বাস্তব ছায়া। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে আবার এদিক ওদিক দেখলো শেয়ালটা। তারপরই হঠাৎ এক লাফে হাঁসটার কাছে যেতেই হাঁসটা একবার মাত্র শেষ চিৎকার করে উঠলো—প্যাঁ-আ-ক। তার পরেই বিঁধে গেলো শেয়ালটার ধারালো দাঁতে - আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ। চারদিক থেকে সজোরে লাঠি পড়তে লাগলো শেয়ালটার মাথায় ঘাড়ে পিঠে কোমরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে নেতিয়ে পড়লো শেয়ালটা।

কয়েকদিন পরে সতীশ কামারও চোখ বুজলো। টোটকা আর কবিরাজী ওষুধে কিছুই হলো না। কামড়ের ঘা বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় বাঁচানো গেলো না সতীশ কামারকে।

শেয়াল মারার কথাটা ফুলপুরের নানাজায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে গেলো। শ্রীধর চাটুজ্জে এমন ভাব দেখালেন যে, তোমরা তো সতীনাথকে গাঁ ছেড়ে যেতে বলেছিলে,—এখন? অভয়চরণের দোকানেও জটলা হয়েছিলো। হরিহর চাটুজ্জে বললো, অমন দল পাকিয়ে লোকে বাঘও মারতে পারে। এ তো সামান্য শেয়াল। দীনু খুড়ো মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ছোঁড়াটাকে নাই দিলে কিন্তু লোকের মাথা ফাটাবে এবার। হালদার মশায় বললেন, যাই হোক, ছোঁড়ার হিম্মত আছে কিন্তু। ঈশান গাঙ্গুলী কিন্তু শ্রীধর চাটুজ্জের বাড়িতে গিয়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন সতীনাথকে। সতীনাথ হেসে বললো, আপনার আশীর্বাদ কিন্তু আমরা ভাগাভাগি করে নেবো। শেয়ালটাকে সবাই মিলে মেরেচি আমরা। ঈশান গাঙ্গুলী হেসে বললেন, আমি বাবা তোমাদের সবাইকেই আশীর্বাদ করচি। সতীনাথ দুঃখ করে বললো, তবে দুঃখু এই, শেয়ালটা মরবার আগে গাঁয়ের অনেকগুলো প্রাণ নিয়ে গেলো।

লাবণ্যপ্রভার তো মাটিতে পা পড়লো না কদিন। মানদাসুন্দরীরও গদগদ হলো ঃ আহা, এমন ছেলে দেখা যায় না!

আর আটবছরের ডুরে শাড়িপরা চঞ্চলা তার কোঁকড়া চুলের রাশ নাচাতে নাচাতে ছুটে এলো সতীনাথের কাছে ঃ সতুদাদা, তুমি নাকি লাঠি মেরে শেয়ালটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েচো!

সতীনাথ হেসে বললো, হ্যাঁ রে!

—কী করে মারলে একবার দেখাও না! —চঞ্চু আবদার করলো।

সতীনাথ হেসে বললো, তুই মাথাটা নীচু কর। আমি একটা লাঠি এনে তোর মাথায় মারলেই বুঝতে পারবি!

শুনেই আঁতকে উঠলো চঞ্চু ঃ ওরে বাবা, তালে যে আমি মরে যাবো।

—মরে যাবি কেন? তুই কি শেয়াল?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো হেসে।

চঞ্চু বললো, মাথায় লাঠি মারলে বুঝি মানুষ মরে না? তুমি আমাকে বোকা পেয়েচো নাকি?

সতীনাথ মুখখানা গম্ভীর করে বললো, মানুষ মরে, তবে তোর মতো মেয়েমানুষ মরে না।

—কেন ?

—তোর মাথায় তো ঘিলু নেই।

—কী আছে তবে ?

—গোবর।

—কেন, আমি কি গোবর খাই নাকি ?

এমন সময় মানদাসুন্দরীর গলা পাওয়া গেলো ঃ চণ্ডু, চণ্ডু রে! শুনে যা। কোথায় গেলো মুখপুড়ি মেয়ে!

মা'র গলা কানে আসতেই চণ্ডু পালালো ঃ ঐ রে, মা ডাকচে। পালাই। পরে এসে ঝগড়া করবো, এ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।—সতীনাথ হাসলো।

পরে সতীনাথ লাবণ্যপ্রভার ঘরের সামনে দাওয়ায় গিয়ে বললো, মাসি, কিছু খেতে দাও তো, খাই। বড্ডো খিদে পেয়েচে।

লাবণ্যপ্রভা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, খিদে তো পাবেই। সেই কখন বেরিয়েছিলি, এখন বাড়ির কথা মনে পড়লো। কী খাবি ? মুড়ি চিঁড়ে, না মোয়া মুড়কি ?

—যা হয় দাও।

লাবণ্যপ্রভা ঘর থেকে একটা ছোট কাঠায় মুড়ি-মুড়কি আর মোয়া এনে দিলো সতীনাথের হাতে ঃ নে, এই দাওয়ায় বসে খা।—নিজেও বসলো সতীনাথের সামনে।

এমন সময় আবার এলো চণ্ডু তার চুলগুলো নাচাতে নাচাতে।

সতীনাথ একগাল মুড়ি-মুড়কি গালে দিয়ে চণ্ডুকে বললো, তুই চলে এলি যে ?

—আমার ইচ্ছে।—চণ্ডুর কোঁচড়ে কয়েকটা পেয়ারা। হাতেও একটা। হাতের পেয়ারাটায় একটা কামড় দিয়ে বললো, ঝগড়া করতে এলাম আবার।

লাবণ্যপ্রভা হেসে জিগ্যেস করলো, কিসের ঝগড়া ?

—দেখো না ছোটমা—চণ্ডু ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, সতুদাদা বললো, আমার মাথায় নাকি গোবর পোরা।

—গোবরই তো পোরা।—সতীনাথ মোয়ায় কামড় দিয়ে বললো।

চণ্ডু বললো, তোমার পাঠশালায় একবার ভর্তি করে দেখোই না, আমার মাথায় গোবর পোরা, না ঘিলু পোরা।

—ইস!—সতীনাথ হাসলো ঃ পারবি তুই ইংরিজি পড়তে ?

—হ্যাঁ পারবো।—চণ্ডু চেঁচিয়ে বললো, এ বি সি, কাপড়ে—আর বললো না। হঠাৎ একটা পাক ঘুরেই দে ছুট।

সতীনাথ হেসে উঠলো। লাবণ্যপ্রভাও।

আবার পেয়ারা খেতে খেতেই ছুটে এলো চণ্ডু : ওমা, আমি একেবারে ভুলে গেচি। তোমার জন্যে পেয়ারা এনে তোমাকে দিতেই ভুলে গেলাম।—বলেই কোঁচড় থেকে তিন-চারটে পেয়ারা বার করে সতীনাথের সামনে রেখে আবার চলে যাচ্ছিলো, লাবণ্যপ্রভা ডেকে বললো, এই চণ্ডু, দিদি কোথায় রে?

—ঢেঁ—কি—ঘ—রে।—বলেই আবার দৌড়।

লাবণ্যপ্রভা হেসে সতীনাথকে জিগ্যেস করলো, হ্যাঁরে, মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে?

চোখ বুজে মোয়া চিবোতে চিবোতে সতীনাথ উত্তর দিলো, কেন, ভালোই লাগে।

লাবণ্যপ্রভা মুচকে হেসে বললো, বিয়ে করবি ওকে?

শুনেই সতীনাথের চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেলো, মোয়া চিবোনো বন্ধ হয়ে গেলো, প্রায় আঁতকে উঠে বললো, বিয়ে? মানে আমি? ঐ একফোঁটা মেয়েকে? এখনো যার নাকে সিগনি গড়ায়? এখনো যার মুখ টিপলে দুধ বেরোয়? আমি ওর মধ্যে নেই মাসী!

—বাবারে ছেলে!—মুখ বেঁকিয়ে হাসলো লাবণ্যপ্রভা : ঐ বয়েসের মেয়ের বিয়ের কথা যেন প্রথম শুনলেন উনি! কুলীন বামুনের ঘরে অত বড়ো মেয়ে! এখন বিয়ে না দিলে তোর মেসো ওকে বীজ রাখবে নাকি?

—তার আমি কি জানি!—সতীনাথের মুখে মুড়ি-মুড়কি।

—আমার কতো বয়েসে বিয়ে হয়েছিলো, জানিস? পাঁচ বছর বয়েসে। লাবণ্যপ্রভা যেন নিজের মনেই হাসলো : পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বৌ-বাটি খেলছিলাম এমন সময় মা, মানে তোর দিদিমা এসে আমার ডানাখানা ধরে টেনে তুলে বললো, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। বলেই দিলে বসিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে।

—তারপর?—সতীনাথের চিবোনো আবার বন্ধ।

—তারপর পুরুতের একঘেয়ে মন্তর শুনতে শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি আমার সিঁথিতে একগাদা সিঁদুর, আর সবাই তোর মেসোকে দেখিয়ে বললো, ঐ বুড়োই তোর বর!—বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো লাবণ্যপ্রভা।

সতীনাথ গম্ভীর হয়ে যেন আনমনেই বললো, না, না এ অন্যায়। এ চলতে পারে না, চলতে দেওয়া উচিত নয়।

—কী, বিয়ে?

—না! ঐ অতটুকু মেয়ের বিয়ে। তাও আবার তার ঠাকুর্দার বয়সীর সঙ্গে।

—তাহলে মেয়েগুলোর দশা কি হবে?

—অন্তত দুর্দশা তো হবে না।—সতীনাথ বললো, মেয়ে বড়ো হবে, ইংরিজি শিখুক আর না শিখুক, একটু আধটু লেখাপড়া শিখবে—যাতে হিসেব করতে পারে, রামায়ণ মহাভারতটা পড়তে পারে, চিঠিপত্তর লিখতে পারে। তারপর একটা ভালো পাত্তর দেখে বিয়ে দেওয়া উচিত। আর—আর—

সতীনাথের নিজের মেসোর কথা মনে পড়তেই বললো, পুরুষদেরও একগাদা বিয়ে করে বিয়ের ব্যবসা চালানো উচিত নয়।

শুনে হাসলো লাবণ্যপ্রভা: জানিসনে, গৌরীদান করতে পারলে বাপ-মায়ের পুণ্যি হয়।

—রেখে দাওগে তোমার পুণ্যি।—সতীনাথ বললো, নিজেদের পুণ্যি হবে বলে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে হবে? অমন পুণ্যি না হলে নয়?

লাবণ্যপ্রভা বললো, তাছাড়া আইবুড়ো সব কুলীন বামুন কায়েতের মেয়ের কুল রক্ষেও তো দরকার।

সতীনাথ বললো, কুলরক্ষে একে বলে কিনা জানিনে। মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে, মাছ-ভাত খেয়ে, শাড়ি-গয়না পরে বাড়িতেই থেকে গেলো আজীবন। স্বামীর ঘর করতে পারলো না, হয়তো তার সঙ্গে আর দেখাও হলো না কোনোদিন। এই তো তোমাদের কুলরক্ষে। হুঃ।

এমন সময় গোবর্ধনের হাঁক শোনা গেলো: সতুদা, সতুদা···

—যাই রে।—উঠে দাঁড়ালো সতীনাথ।

—এ কটা খেলিনে?—লাবণ্যপ্রভা বললো।

—না, পেট ভরে গেচে।

সতীনাথ বাইরে আসতেই গোবর্ধন বললো, সতুদা, এক মজার ব্যাপার জানা গেচে।

—কী রে?

গোবর্ধন বললো, আজ ভোরে পীরসাহেবের ভিটের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি মদনের বো, ঐ যে ভরার মেয়ে, যাকে পরে ধোপার মেয়ে জানতে

পেরে তার বাচ্চা মেয়েটাকে সুদ্ধ বাড়ির বার করে দিয়েছিলো, সেই পদ্মবৌয়ের ঘর থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে আসচে হরিহর চাটুজ্জে।

সতীনাথ বললো, বৌটা থাকে কোথায় ?

—ঐ পীরসাহেবের ভিটের পূব কোণে বাঁশবাগানের ধারে ভাঙা মাটির ঘরে।—গোবর্ধন হাত ঘুরিয়ে বললো, তাছাড়া আর কোথায় যাবে বাচ্চাটাকে নিয়ে ? আর এর-ওর বাড়িতে কাজকম্মো করে খায়।

সতীনাথ জিগ্যেস করলো, হরিহর চাটুজ্জে কি রোজ তার ঘরে যায় ?

গোবর্ধন হেসে বললো, তা জানিনে। তবে আজ ভোরেই প্রথম দেখলাম। তবে যায় বোধহয়।

সতীনাথ হেসে বললো, তবে দাঁড়া, এই শেয়ালটাকেও ধরতে হবে, তবে প্রাণে মারা হবে না।

—কী করে ?—পরম উৎসাহে জিগ্যেস করলো গোবর্ধন।

সতীনাথ বললো, দাঁড়া, সেটা আমাকেও একটু ভাবতে হবে।

৩৮

লাবণ্যপ্রভা ঠোঁট উলটে মানদাসুন্দরীকে বললো, বুঝলে দিদি, কোনো আশাই নেই। সতু ঘাড় পাততেই চায় না। বলে, ঐটুকু দুধের মেয়ে, মুখ টিপলে দুধ বেরোয়. ওকে বিয়ে করবে কে ?

শুনে মানদাসুন্দরী হেসে বললো, কলকেতায় সাহেবদের সঙ্গে মিশে বোনপো তোর সাহেব হয়েচে। একটু ভেবে বললো, আচ্ছা, কোন দেবতার কি ফুলে পুজো করতে হয় জানি আমি।

হয়তো জানে মানদাসুন্দরী। তাই পরদিন দুপুরে সতীনাথ খেয়েদেয়ে নিজের ঘরটায় ঢুকতেই দেখে চণ্ডু একটা কাঁসার পানের ডিবেয় পান নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কোঁকড়ানো চুলগুলো আঁচড়ে পাটি-খোঁপা করা। পরনে নতুন নীলরংয়ের লালপাড় শাড়ি। পায়ে আলতা, মুখখানি বেশ মাজাঘষা। গোলাপী গাল দুটোয় রক্তাভা। নাকে যথারীতি নোলক ঝুলছে।

—এই নাও গো তোমার পান।—চণ্ডু পানের ডিবে সতীনাথের বিছানার উপর রাখলো।

সতীনাথ বললো, পান আনলি যে ? আমি কি পান খাই ?

চণ্ডু বললো, তা জানিনে বাপু। মা বললে, তুই পান নিয়ে যা ডিবের করে, তাই নিয়ে আসতে হলো।

—তা তুই যে আজ সেজেগুজে এয়েচিস?—সতীনাথ জেরা করলো।

—বারে!—চণ্ডু বললো, মা আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলো। বললো, তোমার সঙ্গে যেন ঝগড়া না করি। তুমি ডাকলে যেন পালিয়ে না যাই—

সতীনাথ হাসলো: ও, আর কি বলেচেন?

—তোমাকে সতুদাদা বলে ডাকতে বারণ করেচে।

—কেন, কেন?

—তুমি শীগগির আমার বর হবে কিনা!—বলেই চণ্ডু বললো, হ্যাঁ সতুদাদা—

বলেই জিব কাটলো সে: ঐ যাঃ, আবার ভুলে 'দাদা' বলে ফেলেচি—

—অ্যাঁ, তালে কি হবে?—চোখ বড়ো-বড়ো করে সতীনাথ বললো, দাদা বলেচিস, বড়ো মাসীকে বলে দেবো।

চণ্ডু ভয় পেয়ে বললো, না, না, তোমার পায়ে পড়ি। মা তালে আমাকে খেয়ে ফেলবে।

—তালে কান মল, দু'হাতে দু'কান।

চণ্ডু তাই করলো। বললো, হলো তো?—বলেই প্রশ্ন করে বসলো, হ্যাঁ সতুদাদা—থুড়ি, আবার মলচি কান। আচ্ছা, বর মানে কি?

—বর্বরকে বর বলে।—সতীনাথ মানে বুঝিয়ে দিলো।

—বর্বর মানে কি?

—যারা গাধার টুপির মতো টোপর পরে।

—তা টোপর পরে কেন?

—টোপর হচ্চে একরকমের টোপ!—সতীনাথ বোঝালো: ঐ টোপ দেখিয়েই তো ছোটছোট মেয়েদের গেঁথে ফেলে বর্বর বরেরা।

—তারপর?—চণ্ডু অবাক।

—তারপর কাঁচা মেয়েটার রক্ত মাংস সব চিবিয়ে গপগপ করে খেয়ে ফেলে।

চণ্ডুর আবার প্রশ্ন: তালে বরগুলো সব রাক্ষস বুঝি?

—হ্যাঁরে—সতীনাথ বেশ উৎসাহিত হলো: জানিস, এক-একটা বর চল্লিশ পঞ্চাশটা করে মেয়েকে খেয়ে ফেলে, তবু তাদের খিদে মেটে না।

—তা, তা তুমি তো আমার বর হবে! তোমাকে তো রাক্ষসের মতো দেখতে নয়।—চণ্ডুর মনে সন্দেহ।

—তবে কিসের মতো দেখতে? —সতীনাথ জানতে চাইলো।

—বলবো?

—বল না!

—রাজপুত্তুরের মতো ঠিক।

—বটে!—হেসে ফেললো সতীনাথ। পরে এক ধমক দিয়ে বললো, এঁচোড়ে পাকা মেয়ে! পালা শীগগির এখান থেকে!

চণ্ডু ছুট্রে পালিয়ে গেলো ঘর থেকে।

মানদাসুন্দরী কাছেই ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিলো। চণ্ডু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই খপ করে হাতটা চেপে ধরলো: ছুটে পালিয়ে এলি যে?

—বারে!—চণ্ডু বললো, সতুদাদা—থুড়ি, বললো যে, পালা!

হাতে ঝাঁকানি দিয়ে মানদাসুন্দরী জিগ্যেস করলো, কেন?

—ও বললো, বরেরা সব রাক্ষস। আমি বললাম, না, তারা রাজপুত্তুর। শুনেই বললে, এঁচোড়ে পাকা মেয়ে, পালা শীগগির। আমি পালিয়ে আসবো না? মারতো যদি—

শুনে ভেংচি কাটলো মানদাসুন্দরী: নেকি!

বলেই ছেড়ে দিলো চণ্ডুর হাত। চণ্ডু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ছুটে ঘরে গিয়ে পুতুল খেলতে বসলো।

৩৯

সতীনাথের নির্দেশমতো পীরসাহেবের ভিটের কাছে বাঁশবনে পরপর দুরাত্রি অন্ধকারে বসে গণেশ আর গোবর্ধন মশার কামড় খেলো, কিন্তু হরিহর চাটুজ্জেকে ধরতে পারলো না। তবে বাঁশবনে তাদের তেরাত্তির বাস বিফলে গেলো না।

গভীর রাত্রে দেখা গেলো হরিহর চাটুজ্জে চাদর মুড়ি দিয়ে চোরের মতো চুপিসাড়ে এসে দাঁড়ালো পদ্মবৌয়ের ঘরের পাশে। তারপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সুট করে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে গেলো ঘরের মধ্যে।

গোবর্ধন আনন্দে গণেশের গলা জড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, বাছাধন ফাঁদে পড়েচেন!

গণেশ বললো, তুই বোস। আমি সতুদাকে খবর দিয়ে আসি।

—আর পাখি যদি পালায়?

গণেশ হেসে বললো, এখুনি পালাবে কিরে ? এই তো সবে খাঁচায় ঢুকলো।

গোবর্ধন বললো, তবে যা, তাড়াতাড়ি আসিস।

—আচ্ছা। বলেই গণেশ পাইপাই করে ছুটলো শ্রীধর চাটুজ্জের বাড়ি। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে সতীনাথের ঘরের দরজা ঠেলে তাকে উঠিয়ে শুধু বললো, সতুদা, ঢুকেচে।

—কখন ?

—এই এক্ষুণি।

সতীনাশ বেশ শান্তভাবেই বললো, আচ্ছা। তুই এক কাজ কর, আমাদের দলকে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে জড়ো হতে বলে, যা গোবর্ধনের সঙ্গে বাঁশবনে পাহারা দেগে. আমি যাচ্চি।

গণেশ চলে গেলো।

সতীনাথ জানতো না কোন ঘরে আজ মেসো শুয়েছেন, তাই উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁয়ে তার মাসীর ঘর আর ডাইনে মানদাসুন্দরীর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে ডাকতে লাগলো, মেসোমশায়, ও মেসোমশায়।

একটু পরেই শ্রীধর চাটুজ্জে বেরিয়ে এলেন লাবণ্যপ্রভার ঘর থেকে। সভয়ে জিগ্যেস করলেন, কি বাবাজী, এতো রাত্তিরে ডাকাডাকি ? কোনো বিপদ ঘটলো নাকি ?

—হ্যাঁ!—সতীনাথ বললো, মানে, হরিহর চাটুজ্জে নাকি পীরসাহেবের ভিটের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্চে।

—সে কি ?

—তাই তো খবর দিয়ে গেলো গণেশ!—সতীনাথ বললো, শীগগির চলুন তো একটা আলো নিয়ে। আমি ততক্ষণ দীনু খুড়ো, হালদার মশায়, ঈশেন জেঠাকে খবর দিয়ে যাই!

একটু পরেই সবাই চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে চললেন পীরসাহেবের ভিটের দিকে। সঙ্গে দলবলসহ সতীনাথ।

পীরসাহেবের ভিটের কাছে এসে দীনু খুড়ো বললেন, কোথায় হরিহর ?

সতীনাথ বললো, ঐ, ঐ যে বাঁশবনের ওধারে ভাঙা ঘরটা, ওরই কাছে।

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, ওখানে তো মদনের বৌ, সেই ধোপার মেয়েটা থাকে শুনেচি। হরিহরই ঐ মেয়েটার কথা বলেছিলো। ভরার মেয়ে ওটা!

সতীনাথ বললো. তা হবে। চলুন তো এগিয়ে। দেখি কিছুতে কামড়ালো নাকি।

—তাই চলো।—সবাই আবার এগুতে লাগলেন।

সতীনাথ কার্তিককে একটু টেনে নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই কার্তিক মহেশকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশবনে গণেশ আর গোবর্ধনকে ডেকে পদ্মবৌয়ের ঘরখানার চারদিকে ঘিরে রইলো। জগন্নাথ আর পতিতপাবন সতীনাথের সঙ্গেই চললো।

পদ্মবৌয়ের ঘরের কাছাকাছি আসতেই সতীনাথ বললো, আপনারা চুপচাপ আমার পেছন পেছন আসুন।

সতীনাথ এগিয়ে গেলো ঘরটার কাছে।

শ্রীধর বললেন, ও তো পদ্মবৌয়ের ঘর।

—ঐ ঘরেই।—সতীনাথের মুখখানা ম্লান আলোতে থমথম করছে।

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, তার মানে?

দীনু খুড়ো হেসে বললেন, মানে তো পষ্টই বোঝা যাচ্চে।

হালদার মশায় বললেন, বটে!

সতীনাথ তার দুই পার্শ্বচরকে নিয়ে ততক্ষণে পদ্মবৌয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে: দরজা খোলো।

তবু দরজা বন্ধ দেখে সতীনাথ বললো, না খুললে দরজা ভাঙবো।

বলতেই হঠাৎ দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেলো। পদ্মবৌ দরজার আড়াল থেকে বললো, আপনারা দরজা ঠেলাঠেলি করতেচেন কেনে?

ঈশান গাঙ্গুলী একটু এগিয়ে এসে বললেন, তোমার ঘরে এই গাঁয়ের হরিহর চাটুজ্জে আছে?

—আছে বৈকি!—পদ্মবৌ নির্বিবাদে বললো। তারপর ঘরের ভেতরে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো: ও ঠাকুর, তোমাকে যে গেঁয়ের ভদ্দরনোকেরা ডেকতে এয়েচে গো!

পদ্মবৌয়ের ডাকে হরিহর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অপরাধীর মতোই। দাঁড়ালো দরজার পাশে।

দীনু খুড়ো বললেন, বা, বা, হরিহর, বেশ!

হালদার মশায় বললেন, বামুন হয়ে শেষকালে ধোপানীর ঘরে? ছ্যা, ছ্যা!

শ্রীধর হাসলেন: হয়তো রামী ধোপানী ভেবেই ঢুকেছিলো। একেবারে চণ্ডীঠাকুর হয়ে গেলে যে হে!

ঈশান গাঙ্গুলী বললেন, তুমি নাকি গোঙাচ্ছিলে ?

—হয়তো।—দীনু খুড়ো হাসলেন : ঐ যে রাত্রে যার নাম করতে নেই তারই কামড়ের জ্বালায়।

এবার দরজার আড়াল থেকে ঝামটা দিয়ে উঠলো পদ্মবৌ : বলি, কামড়ের জ্বালাটা আপনাদেরও তো কম নয় গো! নইলে ঘর থেকে যখন ঐ মিনসে আমাকে তাইড়ে দিলো, তখন ভদ্দরনোকদের কম কামড় আমাকে সহ্য করতে হয়নি গো!

ঈশান গাঙ্গুলী ধমক দিলেন : চুপ কর মাগী।

বলতেই আরো ক্ষেপে গেলো পদ্মবৌ : বলি চুপ করবো কেনে ? তোমার খাই, না, পরি ?—বলেই সুর করে বললো : ওরে আমার রে! ভাত দিবার বেলায় নেই কিল মারবার গোঁসাই!

দীনু খুড়ো এবার ধমক দিলেন : ফের কথা!

—বেশ করবো।—পদ্মবৌ জবাব দিলো : কেনে আমার ঘরে এয়েচো তোমরা ? রাতদুপুরে একটা মেয়েমানুষকে জ্বালাতন করতে নজ্জা করে না তোমাদের।

হালদার মশায় হরিহরকে দেখিয়ে বললেন, তোর ঘরে ও আসে কেন ?

শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো পদ্মবৌ : বেশি মুখ নাড়তে এসো না ঠাকুর। তোমাদের মতোন বামুন-কায়েত আমার ঢের দেখা হয়েচে। বলি, দিনির বেলায় এই ধোপার মেয়েব গায়ে গন্দ, না ? আর রাতির বেলায় পদ্দ-গন্দ বেরোয় বুঝি ?—বলেই হরিহরকে দেখিয়ে বললো : ঐ মুখপোড়া ঠাকুরকে জিগ্যেস করো না—আমি ওর পায়ে ধরে আনতি গিছিলাম, না, ঐ আমার আঁচলের তলায় সোহাগ কাঁড়াতে এয়েছিলো ? বোবা হয়ে গেলে যে ঠাকুর! মরণ আর কি!

বলেই পদ্মবৌ ধড়াম করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আর হরিহর ছুটে এসে ঠাস করে পড়লো ঈশান গাঙ্গুলীর পায়ে।

ঈশান গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন।

শ্রীধর চাটুজ্জে এতক্ষণ তেমন কোনো কথাই বলেননি। এবার শুধু বললেন, চলো যাওয়া যাক।

পরদিনই হরিহরের বিচারসভা বসলো সর্বময় চৌধুরীর বিরাট সাজানো বৈঠকখানায়। গাঁয়ের মাথা-মাথা সবাই এসে জড়ো হলেন। ঘরজোড়া ফরাশের একদিকে ব্রাহ্মণরা বসলেন, অন্যদিকে কায়স্থরা। মাঝখানে বসলেন চৌধুরীমশায়. তাকিয়া হেলান দিয়ে। মুখে গড়গড়ার নল। আর গোমস্তা পরান মিত্তির দাঁড়িয়ে রইলো কর্তার পেছনে।

হরিহর দূরে এককোণে দাঁড়িয়ে।

সতীনাথরা বৈঠকখানার বাইরেই একটা কাঁঠালগাছতলায় জটলা করতে লাগলো। গোবিন্দ মিত্রকে কোথাও দেখা গেলো না।

অনেক আলোচনার পর সর্বময় চৌধুরী হরিহরকে বললেন, ফুলপুর গাঁয়ের উপস্থিত মাননীয় ভদ্রমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনার পর এই সাব্যস্ত হলো যে আজ থেকে তুমি হরিহর চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে পতিত হলে। ধোপা নাপিত হুঁকো এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপার তোমার সঙ্গে করা নিষিদ্ধ হলো। যদি কেউ জ্ঞানে বা অজ্ঞানেও করে তবে সেও পতিত হবে।

হরিহর কিছু বললো না। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো শুধু। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠলো : হায়, হায়, একী হলো।

বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

সর্বময় চৌধুরী এবার শ্রীধর চাটুজ্জেকে বললেন, চাটুজ্জে মশায়, আপনার শ্যালিকা-পুত্রটির নাম কি যেন ?

—সতীনাথ।—শ্রীধর বললেন।

—তাকে একটু দরকার ছিলো।—চৌধুরী বললেন।

সর্বময় চৌধুরীর কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই এঁর-ওঁর দিকে তাকাতে লাগলেন, ব্যাপার কি ?

শ্রীধর বললেন, এই তো বাইরেই ছিলো যেন দেখলাম।

শুনেই সর্বময় চৌধুরী গোমস্তা পরান মিত্তিরকে বললেন, যাও তো পরান, সতীনাথকে ডেকে আনো।

পরান মিত্তির তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা ঘরের বাইরে এসে দেখে সতীনাথ তখনো তার দলের ছেলেদের সঙ্গে কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছুটে-

বেরিয়ে যাওয়া হরিহর চাটুজ্জের ব্যাপার নিয়েই হয়তো চলছিলো তাদের আলাপ-আলোচনা।

পরান মিস্তির গিয়ে বললো, ও ঠাকুর, এসো গো, কত্তামশায় তোমাকে ডাকচেন।

—আমাকে?—সতীনাথ অবাক হলো।

—হ্যাঁ গো।

—চলো।

সতীনাথ পরান মিস্তিরের সঙ্গে চললো বৈঠকখানায়, বেশ ভাবিত হয়েই।

সর্বময় চৌধুরী সতীনাথকে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখেই বললেন, সতীনাথ, তুমি এদিকে এসো।—কাছেই জায়গা দেখিয়ে বললেন, বসো এইখানে।

সতীনাথ সবিনয়ে বললো, আপনি ডেকেছিলেন আমাকে?

—হ্যাঁ।—সর্বময় চৌধুরী বললেন, আমি তোমার সব খবর রাখি আর তোমার পরিচয়ও পেয়েচি। এই ফুলপুর গাঁয়ে এসে তুমি ছেলেদের নিয়ে যে সব ভালো কাজ করেচো তারও খবর আমার কানে এসেচে। আজ তোমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম।—তারপর মুচকে হেসে বললেন, জানো বাবাজী, কোনো ভালো কাজ করতে গেলেই বাধা আসে। তুমি সে বাধা অতিক্রম করতে পেরেচো দেখচি।—পরে একটু থেমে আবার বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, যে কাজ আমার করা উচিত ছিলো তুমিই সে কাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেচো। এতে আমার লজ্জা নেই, বরং গৌরব বোধ করচি এই ভেবে যে আমাদের ভাবীকালের ছেলেরা দেশের উন্নতির দিকে নজর দিয়েচে।

সর্বময় চৌধুরীর কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। এ পর্যন্ত সতীনাথের প্রশংসা তাঁরা কেউই করেননি—আর এখন তাঁদের সামনে খোদ কর্তার মুখে তার প্রশংসা! কানে কেমন যেন বেসুরো লাগলো।

সতীনাথ চুপ করেই রইলো, মাথা নীচু করে।

সর্বময় চৌধুরী বললেন আবার, এই সব কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহের ব্যাপার নিয়ে কলকেতা গোবিন্দপুরে শুনেচি রামমোহন রায় নামে এক ভদ্রলোক নাকি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করচেন?

—হ্যাঁ।—সতীনাথ বললো, তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধেও লেখালিখি করচেন। তিনি এবিষয়ে একখানা বইও লিখেচেন: সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তন ও নিবর্তকের সম্বাদ।

—ও, বেশ, বেশ !—সর্বময় চৌধুরী বললেন, তুমি বাইরে ঘুরে এসেচো, তাই তোমার দৃষ্টিভঙ্গীও উদার হয়েচে। বাইরে না বেরুলে লোকের জ্ঞানচক্ষু খোলে না।

এই ধরনের আলোচনা স্বভাবতই প্রীতিপ্রদ হবার কথা নয়, তাই ঈশান গাঙ্গুলীই মাথা চুলকে আমতা-আমতা করে বললেন, আচ্ছা চৌধুরীমশায়, আমরা তাহলে—

সর্বময় চৌধুরী হাত জোড় করে বললেন, আসুন, আসুন, প্রণাম হই।

সকলের সঙ্গে সতীনাথও উঠছিলো, সর্বময় চৌধুরী বললেন, তুমি বাবাজী একটু বসো।

সকলে চলে গেলে চৌধুরীমশায় সতীনাথকে ভেতর-বাড়িতে একখানা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে আরো অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুতোনুটি কলকাতা গোবিন্দপুরের কথা জানলেন, এবং বিদায় দেবার আগে বিরাট জলযোগে আপ্যায়নও করলেন তাকে। শেষে সতীনাথকে বললেন, বেঁচে থাকো বাবাজী, শতায়ু হও, বড়ো হও, দেশের কল্যাণ করো।

অন্দরমহল থেকে চৌধুরী-গিন্নী সতীনাথের জলযোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে আড়াল থেকে দেখলেন সতীনাথকে।

এবং স্নেহলতাও।

৪১

একটু পরেই ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে, মদ গিলে গোবিন্দ এলো ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়িতে।

নিজের ঘরে ঢুকতেই স্নেহলতা বললো, জানো আজ ঐ ছেলেটি আমাদের বাড়িতে এসেছিলো।

—কোন ছেলেটা?—ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলো গোবিন্দ।

—ঐ যে গো শ্রীধর ঠাকুরের শালীর ছেলে, যে কলকাতা থেকে এসে গাঁয়ে ইংরিজি পাঠশালা বসিয়েচে, শেয়ালটাকে মারলো, আর, আর—মুচকে হেসে বললো স্নেহলতা, কাল রাত্তিরে পদ্মবৌয়ের ঘরে, হরিহর ঠাকুরকে হাতেনাতে ধরেছিলো।

বলেই বললো, জানো আজ থেকে হরিহর ঠাকুরকে একঘরে করে দেওয়া হলো।

—বটে।—খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলো গোবিন্দ : তা ঐ ছোঁড়াটা যে এ বাড়িতে এলো বড়ো?

—বাবাই তো তাকে ভেতর-বাড়িতে ডেকে আনলেন, কত গল্পসল্প করলেন। তাইতো তাকে দেখতে পেলাম। সত্যিই বেশ ছেলেটি।

গোবিন্দ ঠোঁট উলটে বললো, বটে! প্রথম দর্শনেই পীরিত!

—ধ্যেৎ!—স্নেহলতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

গোবিন্দ একটা মদের ঢেঁকুর তুলে বললো. তা বেশ তো, এবার তাকেই তোমার বাবা ঘরে এনে রাখুক না! আমার তো অনেকদিন হলো, এবার ছুটি দিক, বাঁচি আমি।—বলেই একটু থেমে বললো, অবশ্য সামনে একটা শিখণ্ডী খাড়া করে গোপন পীরিতে মজাটা হয় অনেক বেশি! না?

এবার রাগ করলো স্নেহলতা : মদ খেয়ে এসে একেবারে বেহুঁশ হয়েচো নাকি? কী বলচো যা-তা!

—ঠিকই বলচি।—গোবিন্দ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, আমার তো সন্দেহই হয় তোমার পেটের ওটা আমার, না. অন্য কারোর।

—কি? কী বললে?—স্নেহলতা বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে ফেললো : এত বড়ো কথাটা বলতে পারলে তুমি মুখ ফুটে?

টসটস করে তার দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

স্নেহলতা আর যেন সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। পারলো না ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে। ছুটে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে সে তার মায়ের ঘরে গিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো কৃপাময়ীর কোলে।

পরে অশ্রুভেজা ভাঙা-ভাঙা কথা যেটুকু শুনতে পেলেন কৃপাময়ী তাঁর মেয়ের কাছে, তাতে আঁতকে উঠলেন তিনিও : ছি, ছি! তুই বলিস কি? এতো বড়ো কথাটা বলতে পারলো জামাই?

অতি দুঃখে কথাটা পরে কর্তাকে না বলেও থাকতে পারলেন না কৃপাময়ী। মেয়ের মুখে কথাটা শোনা পর্যন্ত তাঁর বুকের ভেতরটাও কেমন যেন গুমরে উঠছিলো, একটা চাপা কান্না আর অভিমানে কণ্ঠ যেন তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। আদ্যরসের বংশের সুনামটুকু রাখবার জন্যে যাকে যথাসাধ্য রাজার হালে রাখা হয়েছে, যার নানা অত্যাচার ব্যাভিচার মুখ বুজে সহ্য করা হচ্ছে, আর যে কারণে এতো করা হচ্ছে যে, বংশের নাতি হবে কুলীনের ছেলে, শেষে সেখানেই সন্দেহ? কী কাণ্ড!

সর্বময় চৌধুরী শোনামাত্রই দপ করে জ্বলে উঠলেন : কী। কুলীন কায়েত বলে এতো বড় স্পর্ধা ! আমার মেয়েকে অপমান করা ! আমি ওর গর্দান নেবো !

কৃপাময়ী ভয় পেয়ে বললেন, আহা, অমন বলতে নেই। একটু ঠান্ডা হও। হঠাৎ রেগে যা-তা করা ঠিক হবে না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে অমন কথাবার্তা অনেকই হয়ে থাকে, আবার ঝগড়াঝাটি মিটেও যায় ! তবে মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়লো কোলে, তাই আর থির থাকতে না পেরে তোমাকে বললাম।

সর্বময় চৌধুরী একটু ভেবে বললেন, বলেচো, ভালোই করেচো। বলচো ঠান্ডা হতে, হুঃ, ঠান্ডা আমাকে হতেই হবে। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষচি, ছোবল তার খেতেই হবে। তারপর বললেন, তবে জেনো রেখো গিন্নী, আমি ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ।

সর্বময় চৌধুরী পেছনে হাত দুখানা দৃঢ়বন্ধ করে যেন অন্যমনস্ক হয়েই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সর্বময় চৌধুরী গাঁয়ের সকলের সামনেই সতীনাথের প্রশংসা ও পরে আদরযত্ন করলেও তার মনটার মধ্যে কেমন যেন খচখচ করতে লাগলো।

সতীনাথের কেবলই মনে হতে লাগলো, হরিহর চাটুজ্জের একঘরে হওয়ার জন্যে দায়ী সে-ই। হরিহর যেতো পদ্মবৌয়ের ঘরে, তাতে তার মাথা ঘামাবার কী দরকার ছিলো ? বাইরে বামুনগিরি ফলিয়ে ভেতরে ধোপার মেয়ের বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, সেজন্যে ? তা সেজন্যে সমাজ আছে, গাঁয়ের মাতব্বররা আছেন, তার নাক না গলালেই হতো এই ব্যাপারে ! তাছাড়া এমনটা যে হয় না বা হয়নি তাও তো নয় ! এমন কি, শক্ত মাটি দেখলে সমাজ সেখানে চোখ বুজেও থাকে।

না, একটু মজা করবার জন্যেই সতীনাথ হরিহরকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিলো। অবশ্য, এই ফুলপুরে অভয়চরণের দোকানের সামনের ঘটনাটাও যে তার মনে উঁকিঝুঁকি মারেনি, তা নয়। প্রতিশোধ নেবার মনোভাবও ছিলো বৈকি ! অর্থাৎ শুধু নিছক মজা করবার জন্যে নয়, তাকে মজা দেখাবারও ইচ্ছা আর চেষ্টাও ছিলো সতীনাথের।

শেষে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, যে হরিহর একদিন সতীনাথকে বলেছিলো, 'বেরিয়ে যাও এই গাঁ থেকে' সেই হরিহরকেই শেষপর্যন্ত গাঁ থেকে বেরিয়ে

যেতে হলো সতীনাথের জন্যেই। অথচ এই গাঁ হরিহরের, তার পিতৃপুরুষের ভিটে এই গাঁয়েই। এখানে সতীনাথ কেউ নয়, বাইরের লোক মাত্র।

হ্যাঁ, গাঁ ছেড়েই যেতে হলো হরিহরকে সপরিবারে। যার এ গাঁয়ের ধোপা নাপিত হুঁকো বন্ধ, কারোর পুকুরে নামা বন্ধ, কারোর বিয়ে-থাওয়ায় যাওয়া বন্ধ, ক্রিয়াকলাপ সব বন্ধ, তার পক্ষে সেখানে থাকা আর না-থাকা দুই সমান। থাকা মানে অস্পৃশ্য হয়ে থাকা, মরে থাকা। না-থাকারই সামিল। বরং বেঁচে থাকতে হলে অন্য কোথাও গিয়ে থাকাই যুক্তিসংগত।

হরিহর কয়েকদিন পরেই তার বৌ আর তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে রওনা দিলো তার মামাবাড়ির গাঁয়ের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে। বাপ-পিতামহর ভিটে ছেড়ে যাওয়া মানে গাছের গভীর শিকড়কে টেনে উপড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া—হৃদপিণ্ডটাকেও উপড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতোই। তাতে চোখ শুকনো থাকে না, থাকতে পারেও না। বরং শিকড় যখন ছিঁড়তে থাকে মাটিও তখন চড়চড় করেই ওঠে, বুঝি বেদনায় চাপা কান্নায়—পরে সরে গিয়ে ছেড়ে দেয় তাকে। গাঁয়ের লোকেরাও হরিহরের শেষযাত্রায় 'হায় যায়' করেই উঠলো, তবে সাহস করে তাকে ধরে রাখলো না কেউই।

তাছাড়া কেউ তার বাড়িঘর পাহারা দেবারও ভার নিলো না। আর নিয়েই বা কি হবে? একখানা গরুর গাড়িও পেলো না হরিহর। পায়ে হেঁটেই যেতে হলো তাকে। গোলার ধানগুলোকে বিক্রি করতে পারলো না, তেমনি পড়ে রইলো ইঁদুর-বাঁদরের ভক্ষ্য হয়ে। গোয়ালের গরুগুলোর গলা থেকে দড়ি দিলো খুলে, তবু মাঠ চরে খেতে পারবে। পড়ে রইলো ঘর দরজা বিছানাপত্তর, বাক্স প্যাটরা, বাসন-কোসন, আর সারা বাড়িময় কতো শত টুকরো টুকরো স্মৃতি।

শুধু যেটুকু না নিলে নয় আর সঙ্গে নেওয়া যায়, হরিহর তাই নিলো সঙ্গে: টাকাকড়ি, সোনাদানা, পথে খাওয়ার মতো চাল চিঁড়ে আর কাপড় গামছা চাদর।

হরিহর সপরিবারে নিঃশব্দেই কাঁদতে-কাঁদতে গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে গেলো। গাঁয়ের সকলেই দেখলো তাদের যাওয়া। কেউ সামনে দাঁড়িয়ে, কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে, কেউ বা দূরে থেকে।

গাঁয়ের শেষ সীমানায় এসে হরিহর এবার হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করে উঠলো: ফুলপুর—ফুলপুর রে আমার। চললাম।

নীচু হয়ে খানিকটা ধুলো মুঠো ভরে তুলে নিলো সে। তারপর কী ভেবে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো সে ধুলো।

সতীনাথ দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সবই দেখলো। দেখলো অপরাধীর মতোই।

সতীনাথ লাবণ্যপ্রভাকে বললো, মাসী, এবার আমি আসি।

লাবণ্যপ্রভা চমকে উঠে বললো, সে কি রে?

সতীনাথ ম্লান হেসে বললো, তা অনেকদিন তো থাকা হলো। বেশিদিন কি কুটুমবাড়িতে থাকা উচিত?

—আরে, এ তো তোর মাসীর বাড়ি!

—তা হোক!—সতীনাথ বললো, এবার দেশে যাই. বাড়ি ঘরদোর দেখিগে!

লাবণ্যপ্রভা বললো, তা একটা বিয়ে-থা তো করা দরকার।

সতীনাথ হেসে বললো, দরকার বৈকি! একটা কেন, দশটা বিশটা করতেও বাধা কি? তবে তার আগে ঘরদোর গুছিয়ে নিই—

লাবণ্যপ্রভা বললো. বটে! বিয়ের আগেই সংসারী হতে চাস দেখচি!

সতীনাথ বললো, দেখাই যাক না মাসী! লোকে বিয়ে করে সংসারী হয়, আমি না হয় সংসারী হয়ে বিয়ে করবো।

শ্রীধর চাটুজ্জে শুনে বললেন হ্যাঁ বাবাজী, তুমি নাকি যেতে চাও?

—হ্যাঁ মেসোমশায়।—সতীনাথ বললো, অনেকদিন তো থাকা হলো। এবার গাঁয়ে গিয়ে ঘরদোর জমিজমা দেখাশুনো করিগে একটু।

শ্রীধর চাটুজ্জে একটু ভেবে বললেন, হুঁ, তা তো করাই দরকার। কাজেই বাধাই বা দিই কি করে? তবে এ গাঁয়ে তুমিই ছিলে আশা-ভরসা! সেদিন জমিদারমশায়ও তোমার কতো সুখ্যাতি করলেন! শুনে আমার বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠলো।

সতীনাথ বললো, আপনাদের আশীর্বাদে যেটুকু হয়েচে তাতে আমার কোনো বাহাদুরী নেই, সবই সকলের সহযোগতার জন্যেই হতে পেরেচে! তাছাড়া, কার্তিক গণেশ মহেশ সব রইলো, ওরাই সব দেখে শুনে করবে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে।

কথাটা মানদাসুন্দরীর কানে যেতেই সে ছুটে এলো লাবণ্যপ্রভার কাছে: হ্যাঁরে ছোটো, একি শুনচি! সতু নাকি চলে যেতে চাচ্চে?

—হ্যাঁ দিদি।—লাবণ্যপ্রভা বিষন্ন মুখেই বললো।

—তাহলে চণ্ডুর বিয়ে ?

—তাই তো ভাবচি।

—ওকে আটকা না।

হাসলো লাবণ্যপ্রভা : আজকালকার ছেলে ওরা। আমাদের কথা শোনে, না, মানে ? যা ভালো বোঝে তাই করে।

—তা তো বুঝলাম।—মানদা ভাবিত হলো।

লাবণ্যপ্রভা হেসে বললো, বললাম, বে-থা কর একটা। বললে, একটা কেন, দশটা-বিশটা করবো'খন। তার আগে ঘরদোর গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে তো। শোনো ছেলের কথা।

কথাটা মানদা যেন বুঝলো : তা মিথ্যে বলেনি সতু। তবে কত্তাকে দিয়ে ওর দিকে একটু নজর রাখা দরকার। একে ছেলেমানুষ তায় একলা। —তারপর একটু ভেবে বললো, তা হ্যাঁরে ছোটো, তুইও তো ওর সঙ্গে গিয়ে সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আসতে পারিস।

শুনেই লাবণ্যপ্রভার মাথায় একটা ঝিলিক খেলে গেলো : মাগী আমাকে সরিয়ে ভাতারকে পুরো দখল করতে চায়! ইস আর কি!

মুখ বেঁকিয়ে বললো : তা দিদি, তুমিই যাও না কেন ? তোমার মেয়েরই তো সংসার হবে। তুমি গুছিয়ে দিয়ে এলেই তো ভালো।

—আ মুখপুড়ি!—হাসলো মানদা : খাওয়াই হলো না, আঁচাতে বলিস!

৪২

সতীনাথের কাছে চঞ্চলা এলো শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে কোঁকড়া চুল নাচাতে-নাচাতে : হ্যাঁ সতুদাদা — থুড়ি, দাদা নয়, দাদা নয়, তুমি নাকি চলে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। হাসলো সতীনাথ।

—কেন ?

—পরের বাড়ি বেশি দিন থাকতে হয় নাকি ?

—বারে!—আশ্চর্য হলো চঞ্চলা : তুমি তো আমার বর হবে গো! তোমার তো এটা শ্বশুরবাড়ি হবে। পরের বাড়ি হবে কেন ?

সতীনাথ হাসলো। পরে খুব একটা ভাবনার ভাব দেখিয়ে বললো, দ্যাখ

চঞ্চু, আমি অনেক ভেবে দেখলাম তোর মতো মেয়ের জন্যে আমার চাইতেও একটা ভালো বরের দরকার।

—কী রকম? —আশ্চর্য হলো চঞ্চলা।

—এই ধর তার গায়ের রং হবে রাঙা টকটকে। দেখতে হবে রাজপুত্তুরের মতো। মাথায় পাগড়ি, গায়ে জরির জামা বলেই শুধরে নিয়ে বললো, না, না, মাথায় টুপি, গায়ে কোট-প্যান্ট, কাঁধে বন্দুক, ঘোড়ায় চড়ে টগবগ টগবগ করে আসবে আর ফরফর করে ইংরিজি বলবে।

—ও বাবা! আমি তার কথাই বুঝতে পারবো না—চঞ্চলা হাত ঘুরিয়ে বললো।

সতীনাথ বললো, ততোদিনে তুই আমাদের ইংরিজি পাঠশালায় ইংরিজি শিখে নিবি। হ্যাট, ব্যাট, ক্যাট, গেট আউট!

—আর সে যদি আমার দিকে বন্দুক ছোঁড়ে?

—ধ্যেৎ, বৌকে আবার কেউ বন্দুক দিয়ে মারে নাকি?—সতীনাথ হেসে বললো, সে বন্দুক দিয়ে ঐ রকম শেয়াল মারবে, হাঁস মারবে, পাখি মারবে। কতো কি মারবে!

কথাটা পছন্দ হলো না চঞ্চলার: না, সে হবে না। দুষ্টু শেয়াল না হয় মারতে পারে, তা বলে হাঁস পাখি এসব মারবে কেন? ওরা তো কোনো দোষ করে না।

বেশ, তবে তুই যাকে বলবি তাকেই মারবে।

—মারবে না, পাড়বে।—চঞ্চলা সমাধান করে দিলো।

—কী পাড়বে রে?

—বন্দুক ছুঁড়ে উঁচু মগডাল থেকে আম পাড়বে, জাম পাড়বে, পেয়ারা পাড়বে আর উই উঁচু নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়বে।

সতীনাথ হেসে বললো, দূর, তা কখনো ঐসব বর পারে? ওরা যে সাহেব রে—পরে একটু ভেবে বললো, তবে তুই শিখিয়ে দিলে পারবে বোধহয়!

শুনে চঞ্চলাও খুব উৎসাহিত হলো: হ্যাঁ, আমি বরটাকে পেয়ারা গাছে আম গাছে জাম গাছে চড়া দেখিয়ে দিতে পারবো। তবে নারকেল গাছে চড়া তো দেখাতে পারবো না!

সতীনাথ বললো, সেটা তুই কার্তিক গণেশ ওদের কাউকে বলিস, ওরা তাকে দেখিয়ে দেবে।

চঞ্চলা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো : হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।—বলেই বললো, তালে তুমি একটা সাহেব-বরই পাঠিয়ে দিয়ো। তবে একটা ভালো দেখে শুনে পাঠিয়ো কিন্তু। দরকার হলে গাই দোয়া, পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা—এসবও যেন করতে পারে।

সতীনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, নিশ্চয়ই, সে তো করতেই হবে। সংসার করতে হবে তো!

চঞ্চলা এবার নেচে উঠলো : তালে বেশ হবে, না? আমি মাকে বলবো, সতুদাদা আমার বর হবে না, দাদাই থাকবে। বরং আমার জন্যে একটা ভালো সাহেব-বর এনে দেবে বলেচে—

—সব্বোনাশ, এখন ওসব বলিসনে।—সতীনাথ বললো, আমি আগে চলে যাই, তারপর বলতে হয় বলিস। নইলে আমাকে কেউ যেতেই দেবে না। আর তোর সাহেব-বর আনাও হবে না। শেষে বুঝলি, এই ধুতি-চাদর-পরা রং-ময়লা একটা গেঁয়ো বর নিয়ে ঘর করতে হবে তোকে। দূর! সে কী ভালো হবে?

—হুঁ, ঠিকই তো!—চঞ্চলা বুঝলো, তার হঠকারিতায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিলো আর একটু হলে। বললো, তুমি চলে গেলে তবেই বলবো, অ্যাঁ!

সতীনাথ চঞ্চলার থুতনি নেড়ে দিয়ে হেসে বললো, লক্ষ্মী মেয়ে!

পরদিন ভোররাত্রে উঠে সতীনাথ সকলকে প্রণাম করে তার গাঁয়ের দিকে রওনা দিলো। চঞ্চলা জানলো না। সে তখন একটা মাটির পুতুল কোলের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে বিছানায়।

সতীনাথের দলের ছেলেরা সতীনাথকে এগিয়ে দিলো অনেক দূর পর্যন্ত।

আর দুদিন পরে দেখা গেলো পদ্মবৌয়ের ঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। কে বা কারা আগুন ধরিয়েছে বোঝা গেলো না। পদ্মবৌ কচি মেয়েটিকে নিয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে আশ্রয় নিলো এক গাছতলায়।

সতীনাথ মাঝে একবার বল্লভপুরে গেছলো লোহারাম বাঁড়ুজ্জেকে কলকাতায় তাঁর জামাই মানিক মুখুজ্জের খবরটা দিতে। কিন্তু লোহারাম তখন স্বর্ণকে নিয়ে মানিকপুরে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে সতীনাথের দেখা হয়নি, কাজেই খবরটাও আর দেওয়া হয়নি।

একবার ভেবেছিলো সতীনাথ, খবরটা বাড়ির কাউকে দিয়ে যাবে। তারপর ভেবে দেখলো, বাড়িতে এক চাকর-বাকর ছাড়া এমন কোনো

পুরুষমানুষ নেই যাকে খবরটা দেওয়া চলে। হাতকাটা গোমস্তা গোপীচরণও গেছে কর্তার সঙ্গে। কাজেই তাকেও পাওয়া গেলো না। শেষে ভেবে দেখলো সতীনাথ—যাক, পরে এসে খবরটা দেওয়া যাবে'খন। ভারি তো সুখবর! যতো দেরিতে বৃদ্ধ শুনতে পান ততই ভালো।

তাই এবার ফুলপুর থেকে নিজের গাঁ গৌরহাটিতে যাবার সময় সতীনাথ ভাবলো, এবার যাবার পথে খবরটা দিয়ে যাওয়া যাক। আবার কবে উলটে সেই গৌরহাটি থেকে বল্লভপুর আসতে পারবে তার ঠিক নেই।

কাজেই সতীনাথ খানিকদূর এগিয়ে গৌরহাটির পথ না ধরে ধরলো বল্লভপুরের পথ। হরিণবেড়িয়ার মাঠটা পার হয়ে পাটকেবাড়ি আর যশাই গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে গেলে দুপুরের পরেই পেঁছে যাবে সে বল্লভপুরে।

সতীনাথ বোঁচকাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে জোরে হাঁটা দিলো।

৪৩

বল্লভপুরে দুপুর নাগাদ পেঁছে সতীনাথ লোহারামের বাড়িতে এসে শুনলো, কর্তা শয্যাশায়ী।

হাতকাটা গোপীচরণের সঙ্গে দেখা হলো তার।

পরিচয় দিতে গোপীচরণ সতীনাথকে সাদরে আহবান করে বাইরের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলো। তার স্নানাহারের ব্যবস্থাও করে দিলো গোপীচরণ।

পরে গোপীচরণের মুখেই শুনলো সতীনাথ ঃ লোহারাম স্বর্ণকে নিয়ে পালকিতে ফেরবার পথে কংকনার মাঠের মাঝখানে দারুণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েন। একেই কর্তার বয়েস হয়েছে, তার উপর পালকির ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ায় ভিজে জবজবে হয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। আর এসেই সর্দি কাশি জ্বর। কবিরাজমশায় দেখছেন, বুক কফে ভর্তি। এখনও বিপদ কাটেনি মোটেই।

সব শুনে সতীনাথ বললো, তাহলে তো বড়ো চিন্তার কারণ ঘটেচে।—পরে একটু ভেবে বললো, আর আমি এবারও যেজন্যে এলাম সে কাজটা হলো না।

গোপীচরণ বললো, যদি আপত্তির কারণ না থাকে, তবে আমাকে বলতে পারেন। আর যদি দুচারদিন থেকে যান তবে কর্তা একটু ভালো হলে আপনি নিজেই দেখা করে যা বলবার বলতে পারেন।

সতীনাথ বললো, দু'চারদিন বোধহয় থাকা যাবে না। কালই ভোরে রওনা হবো ভাবচি। তবে—সতীনাথ আবার একটু ভেবে নিয়ে বললো, তবে খবরটা আপনাকেও দেওয়া যেতে পারে—হ্যাঁ, দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জানতে পারি কি, এ বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক।

—আজ্ঞে, আমি গোমস্তা।

সতীনাথ একটু ভেবে একে-একে মানিক মুখুজ্জের সব কথাই গোপীচরণকে বললো। তার সঙ্গে মানিক মুখুজ্জের প্রথম দিনের দেখা এক বাবুর বাড়ির সামনে এবং কলকাতা থেকে ফেরবার দিন এক নর্দমার ধারে মানিক মুখুজ্জেকে যে অবস্থায় দেখেছিলো সে কথাও গোপন করলো না সতীনাথ। শেষে বললো সতীনাথ : এসব কথা বলতে আমার সংকোচই ছিলো, কিন্তু খবরটা দেওয়া দরকার মনে করেই দিলাম।

গোপীচরণ বললো, সে তো বটেই।

সেই রাত্রেই ভোরের দিকে লোহারামের বাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। লোকজন উঠে পড়লো। শোনা গেলো এক নারীকণ্ঠের চাপা ক্রন্দন। ব্যাপার কি?

সতীনাথও বিছানায় উঠে বসলো। কর্তার কিছু হলো নাকি?

না। একটু পরেই ভেতরবাড়িতে সাতবার শাঁখ বেজে উঠলো। শুভ মঙ্গলধ্বনি।

একটু পরেই সতীনাথ দেখতে পেলো গোপীচরণকে। মুখখানা তার হাসি মাখানো।

—ব্যাপার কি?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো।

গোপীচরণ মৃদু হেসে বললো, আজ্ঞে, এইমাত্র কর্ত্তার নাতি হলো। বড়ো মেয়ের ছেলে।

—ও—সতীনাথ বললো, তবু ভালো। আমি ভয় পেয়ে গেছলাম। যাক, ভালোয়-ভালোয় হয়েচে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—গোপীনাথ বশম্বদ হয়ে বললো, এখন বেঁচেবর্তে থাকুক, এই আশীর্বাদই করুন।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—সতীনাথ বললো, বেঁচে থাকুক, বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। পাঁচজনের একজন হোক।—বলেই বললো, আচ্ছা, এবার রওনা দিতে হয়।

গোপীনাথ বললো, কিন্তু গিন্নীমা বললেন, আজ এবেলা খাওয়াদাওয়া করে যেতে। তাছাড়া আপনার সঙ্গে তাঁর একটু দরকারও আছে।

—কি ?—বলেই সতীনাথের মনে পড়লো লোহারামের কথা : ভালো কথা, আপনার কর্তা কেমন আছেন ?

—একটু ভালো।—গোপীচরণ বললো, রাত্তিরে ঘুমও হয়েছিলো।

—যাক। ভালোই। হ্যাঁ, গিন্নীমার কী দরকার বলছিলেন আপনি ?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো।

—মানে, ছোটজামাইবাবুর ঠিকানাটা জানতে চাচ্ছিলেন।

—ঠিকানা ?—সতীনাথ একটু ভেবে কলকাতার সেই বাবুর নামটা বলে বললো, মানিক মুখুজ্জের বাড়িটা দেখেছি বটে, তবে ঠিকানাটা তো ঠিক জানা নেই। তবে গঙ্গার কাছেই।

সতীনাথকে সকালবেলাটা থাকবার কথা আসলে বিরাজমণি বলেননি, বলেছিলো বিন্দুবাসিনী। বিরাজমণি কদিন স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর কাছেই সর্বক্ষণ।

তার উপরে ভোররাত্রে ইন্দুর প্রসববেদনা ওঠায় বিরাজমণি আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্দুকে আঁতুড়ঘরে নিয়ে যাওয়া, দাই ডাকানো, নাড়ি কাটানো, কতো কি ঝামেলা।

একবার হাতকাটা গোপীচরণকেও দেখতে পেলেন আধ-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের ঘরের আড়ালে। দেখে ঘুরিয়ে নিলেন মুখ : হুঁ। পোড়া কপাল মেয়ের! তাই গোমস্তা হলো ছেলের বাপ!

তা ছেলেটার নাক মুখ চোখও হয়েছে বুঝি ঐ গোপীচরণের মতোই। বিরাজমণির বুকটা একবার ধড়াস করে উঠলো।

স্বর্ণমঞ্জরী কিন্তু আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। বিরাজমণিকে জিগ্যেস করলো, হ্যাঁ দিদিমা, আমার তো নাতি হলো, না ?

বিরাজমণি হেসে বললেন, হ্যাঁ রে। আবার নতুন করে সতীন হলি। এবার আর বুড়ো বর নিয়ে ঝগড়া নয়, কাঁচ বর নিয়ে ঝগড়া।

স্বর্ণ হেসে বললো, তোমার সতীন হতে আমার বয়ে গেচে। আমার নাতি হয়েচে, আমি দিদিমা হয়েচি। কী মজা!

আঁতুড়ের ঝিটা কাছেই ছিলো। সুযোগ বুঝে বললো, হ্যাঁগো ছোটঠাকরুণ, অমন সুন্দর নাতি হয়েচে, তুমি নতুন দিদমা হলে, কিছু বখশিস পাবো না ?

শুনেই স্বর্ণর খেয়াল হলো, ঠিকই তো। একটু ভেবেই হাতের চুনি বসানো আংটিটা খুলে নিয়ে তার হাতে দিলো : এই নে।

তবে বিন্দু গোপীচরণের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, কী গো, নতুন বাপ হলে, এবার মিষ্টি খাওয়াও।

গোপীচরণ হেসে বললো, খাওয়াতাম। কিন্তু তোমার মুখখানা দেখে আমার বুকখানা ফেটে যাচ্চে যে!

—থাক, আর রসিকতা করতে হবে না!—বিন্দু বললো, দিদিকে খুঁজে এবার আমার দিকে নজর বুঝি? কিন্তু বিন্দি বামনী অতো সহজে ভোলে না জেনে রেখো।

গোপীচরণ বললো, তা জানি, তবে কাল বাবুটি এসে যে খবরটা জানালেন—

থামলো গোপীচরণ।

বিন্দু ভয় পেয়ে জিগ্যেস করলো, কী খবর?

—ছোটজামাইবাবুর খবর।

—কি, কি?—বিন্দু অধৈর্য হয়ে উঠলো।

গোপীচরণ সতীনাথের কাছে মানিক মুখুজ্জের কথা যা-যা শুনেছিলো সবই খুলে বললো বিন্দুকে। শুনে বিন্দুর মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। যে স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই, নামেই স্বামী শুধু, তার চরিত্রদোষের কথা শুনে কেন যেন বিন্দু উতলাই হলো। একবার ভাবলোও, সে কাছে থাকলে এমনটা হয়তো হতো না। শেষে হাসলো নিজের মনে : কুলীনের কটা মেয়ের ভাগ্য হয় স্বামীর কাছে থাকা? পরে হঠাৎ খেয়াল হলো বিন্দুর, কলকাতায় কোথায় থাকে সে?

জিগ্যেস করলো গোপীচরণকে : ঠিকানাটা জেনেচো?

—না তো!—গোপীচরণ অপ্রস্তুতে পড়লো।

—ও, তুমি এই বুদ্ধি নিয়ে গোমস্তাগিরি করো বুঝি?—বিন্দু খোঁটা দিলো।

গোপীচরণ তাড়াতাড়ি বললো, আচ্ছা, আমি কাল জেনে নেবো।

বিন্দু বললো, হ্যাঁ, জেনে নিয়ো। আর খেয়েদেয়ে ওবেলা যেন যান, তাও বলো।

কাজেই সতীনাথকে থাকতেই হলো।

দুপুরে ভেতরবাড়িতে খেতে বসলো যখন, তখন বিরাজমণিই একগলা

ঘোমটা দিয়ে সতীনাথকে ভাত বেড়ে দিলেন। দূর থেকে দেখলো বিন্দু। ঐ ভদ্রলোক কলকাতায় তার স্বামীকে দেখে এসেছেন, আরো কতো কি দেখে এসেছেন কে জানে। হয়তো এমন কিছু দেখেছেন তা খুলে বলা যায় না। তা বাড়ির ঠিকানাটা ভালো করে আনতে পারেননি। শুধু বাবুর নাম ঠিকানা দিয়েছেন গোপীচরণকে। হয়তো বাড়ির ঠিকানাটা জানাতে চান না, কিংবা জানা দরকার মনে করেননি। হুঃ। পুরুষগুলোর অমনিই মোটা বুদ্ধি।

দেখছিলো স্বর্ণমঞ্জরিও। ঘরের আড়াল থেকে। চোখ ভরেই দেখছিলো সে সতীনাথকে। বেশ দেখতে লোকটাকে। বেশ সুন্দরপানা চেহারা। কেমন কোঁকড়ানো চুল। বয়েসও বেশি নয়। লোটার নাম কি, কোথায় থাকে, কেন এসেছে বা এ বাড়ির কে হয়, কিছুই জানে না সে। তবু দেখতে লাগলো স্বর্ণমঞ্জরী। আচ্ছা, বিয়ে হয়েছে লোকটার? হয়েছে নিশ্চয়ই। হয়তো দশটা বিয়ে করে রেখেছে এর মধ্যেই। তা বর হবার মতোই চেহারা বটে।

তারপরেই হঠাৎ তার মনে হলো, আহা, এমন যদি তার একটা—

এমন সময় ঘরের মধ্যে লোহারামের কাশি শোনা গেলো। স্বর্ণ স্বপ্নের আকাশ থেকে যেন ধপ করে পড়লো মাটিতে। হিরাজমণি তার উপর লোহারামের ভার দিয়ে গেছেন রান্নাঘরে। কাজেই সে ছুটে গেলো ঘরের মধ্যে লোহারামের খাটের কাছে। তখনও কাশছেন তিনি খক খক। কিন্তু কাশি উঠছে না মোটেই, জমে গেছে বুকে।

পিকদানিটা নিয়ে মুখের কাছে এনে দাঁড়ালো স্বর্ণমঞ্জরী।

দেখতে লাগলো লোহারামকে। নেতিয়ে পড়ে আছেন। কাঠির মত চেহারা। হাড়-বার করা। সব শিরাগুলো ফুলে আছে। সব চুলগুলো গেছে পেকে। ফোকলা, দাঁত নেই একটাও!···স্বামী! তার স্বামী। জীবন-মরণের দেবতা।

না, কাশি উঠলো না। কাশির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন লোহারাম। স্বর্ণমঞ্জরী স্বামীর কষ্ট দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ডান হাতখানা তাঁর কপালে বুলিয়ে দিতে লাগলো।

একটু পরেই কাশিটা কমলো।

পিকদানিটা রেখে দিয়ে স্বর্ণমঞ্জরী আবার সেই দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। না, লোকটার খাওয়া হয়ে গেছে। চলে গেছে।

কিন্তু মানুষটা কে ? বিরাজমণিকে জিগ্যেস করতেও লজ্জা করলো তার।

সতীনাথ খাওয়াদাওয়া করে দুপুরেই রওনা হয়ে গেলো গৌরহাটির দিকে।

লোহারাম জামাইয়ের খবরটা পেলেন না, তবে বিন্দুর কাছ থেকে বিরাজমণি জানতে পারলেন, জামাই কলকাতায় ভালোই আছে। আর বেঁচে আছে, সেটাই বড়ো কথা। মেয়েটা তবু দুটো মাছ-ভাত খেতে পাবে, শাঁখা-সিঁদুর পরতে পারবে।

৪৪

বাসনাময়ীর যখন জ্ঞান ফিরলো, তখনও সে বজরার মধ্যেই। কালো অন্ধকারে জল কেটে বজরা চলেছে—ছপ ছপ ছপ ছপ।

বাসনাময়ীর হাত পা মুখ তেমনিই বাঁধা। চোখ মেলে দেখলো, সে তেমনিই পড়ে আছে এক বাবুর পায়ের কাছে। বাবু তাকিয়া হেলান দিয়ে মদে বেঘোর হয়ে পড়ে আছেন। নাক দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে—ঘরর ঘরর। কখনোবা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে—ড্যাম ব্লাডি সোয়াইন। কাকে গালাগাল দিচ্ছেন তিনিই জানেন।

আরো দু'তিনজন বাবু এদিক-ওদিকে বসে-বসেই ঢুলছে মদের ঝোঁকে। মোসাহেব সব।

বাসনাময়ী নড়বার চেষ্টা করলো, পারলো না। সারা অঙ্গে ব্যথা। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারাদিন মুখেও কিছু পড়েনি। ক্রমে চোখের সামনে ভেসে উঠলো খোকনের মুখ, স্বামীর মুখ, মোক্ষদাসুন্দরীর মুখ, মনোমোহিনীর মুখ।

হায়, হায়, এ কী হলো! এ কোথায় এলাম? আমার এ কী হলো? আমার সর্বনাশ হলো!—গুমরে উঠলো বাসনাময়ী।

ফেটিবাঁধা মুখ থেকে একটা চাপা আওয়াজ এলো বেরিয়ে।

আওয়াজ পেয়েই কাছে এগিয়ে এলো রামহরি ওরফে মানিক মুখুজ্জে। জিগ্যেস করলো, কী গো চাঁদ, জল খাবে একটু?

বাসনাময়ী মাথা নাড়লো, হ্যাঁ খাবে।

—কিন্তু খবরদার। মুখ খুলে দিলে একটু চেঁচিয়েচো কি মেরে ফেলবো।—পরে হেসে বললো, আর চেঁচিয়েও কোনো লাভ নেই। আশপাশে কেউ নেই। বুঝলে?

সনাময়ী মাথা নাড়লো, বুঝেছে সে।

—দাঁড়াও, আনচি জল।—মানিকচন্দ্র অতি কষ্টে উঠে টলে পায়ে বজরার এক কোণে গিয়ে একটা গেলাসে জলের সঙ্গে কী যেন মিশিয়ে নিয়ে এসে ধরলো বাসনাময়ীর মুখের সামনে।

—মুখ খুলে দিচ্চি, কিন্তু খবরদার।—বলে বাসনাময়ীর মুখের বাঁধন খুলে দিলো মানিকচন্দ্র। গেলাসটা মুখে ধরতেই ঢকঢক করে গেলাসের সবটা জল শেষ করে ফেললো বাসনাময়ী। কেমন যেন বিস্বাদ। হোক, তবু জল তো। গলাটা ভিজলো তো।

এবার মুখ খোলা পেয়ে বাসনাময়ী ছলছল চোখে বললো বাবা আমাকে বাঁচাও—

বলতেই ধমকে উঠলো মানিকচন্দ্র : চোপরও মাগী!—এবং হঠাৎ 'হুঁ হুঁ আমার চাঁদবদনী' বলেই বাসনাময়ীর দুটো গাল দিলো টিপে। বাসনাময়ী ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাঁধা পড়লো মুখ আবার সেই কাপড়ের ফেটিতে।

বাসনাময়ীর দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো মানিকচন্দ্র। বেশ একটা তৃপ্তির হাসি। না, ওর চাইতে আর এগোনো চলে না মোটেই। বাবা, এটি গানুবাবুর মাল।

বাসনাময়ী আবার যেন ঝিমিয়ে পড়লো। তার জলভরা চোখের পাতা দুটি বুজে এলো আস্তে-আস্তে। বজরা আবার নিস্তব্ধ।

তারপর যখন বাসনাময়ীর ঘুম ভাঙলো, তখন দেখে সে একটা বেশ বড়ো সাজানো ঘরে খাটের উপরে শুয়ে। গঙ্গার ঘাট থেকে রাতের অন্ধকারে কখন যে তাকে পালকিতে করে গানুবাবুর বিরাট বাড়ির এই ঘরখানাতে আনা হয়েছে, বাসনাময়ী মোটেই টের পায়নি! বাসনাময়ী জানতেই পারলো না, এ কার বাড়ি, কোন শহর, কেমন করে এলো। তবে পর্দা ঝোলানো জানলার বাইরে দেখলো দিনের আলো উঠেছে ফুটে।

আবার তার মনের পটে ফুটে উঠলো খোকনের মুখ। খোকন। কোথায় সে, কী করছে সে? আর তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে জানে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বেণীমাধবের মুখ। কোথায় তিনি? হয়তো খুঁজছেন তাকে। সারা মাহেশে খোঁজ করছেন তার। তারপর? তারপর হয়তো ফিরে গেছেন মানিকপুরে।

আরো ভাবতে লাগলো বাসনাময়ী : তাঁর আর কি ? আবার একটা বিয়ে করবেন। নতুন বৌ নিয়ে ঘর করবেন। তার সাধের সংসারে আবার একজন এসে বসবে। নতুন বৌ পেয়ে স্বামী ক্রমে ভুলে যাবেন তার কথা। কিন্তু খোকন ? খোকনের কি হবে ? সৎমায়ের হাতে পড়ে খোকনের কী অবস্থা হবে ?

আর তার কী হবে ?—বাসনাময়ী নিজের কাছে ঘুরে এলো : ঐ বাবুটার চেহারাটা কী ভীষণ ! কতো বড় গোঁফ ! খুব বড়লোক বোধহয়। কিন্তু তাকে ধরে আনলো কেন ? কেন ?

কেন, তা বাসনাময়ী যে একেবারে বুঝলো না, তা নয়। কিন্তু কতো তো মেয়েমানুষ আছে যাদের পয়সা দিয়ে কেনা যায়, যারা পয়সা পেলেই সব দিতে পারে, তারা থাকতে তাকে কেন ? একটা গেরস্তের বৌকে কী দরকার ?

না, না। পালাতে হবে। কিন্তু কী করে পালাবে ? পালিয়ে কোথায় যাবে ? মানিকপুরে যাবে কি করে ? পারবে কি ? ওর চাইতে আত্মহত্যা করা ভালো। আগুনে পুড়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে। দড়ি কোথায় ? ঘরের কড়ি-বরগাও তো অনেক উঁচুতে। তবে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ওর সঙ্গে বেঁধে হতে পারে। গলায় শাড়ির ফাঁস দিয়ে ! ফাঁস দিয়ে ? সেই নিরোদার মতো ?

ফাঁসে ঝোলা নীরোদার সে বীভৎস নগ্ন চেহারাটা ভেসে উঠলো বাসনাময়ীর চোখের সামনে। আঁতকে উঠলো সে : না, না—না—

হঠাৎ উঠে বসলো সে বিছানার 'পরে। এতোক্ষণে খেয়াল হলো তার, মুখে ফেটি নেই, বাঁধা হাত আর পা দুটোর বাঁধনও খোলা। আর নজরে পড়লো, ঘরের কোণে মেঝেতে বসে আছে একটা মাঝবয়সী মেয়েমানুষ। তার দিকেই চেয়ে আছে। মুখে হাসি।

বাসনাময়ীকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে সেও উঠে এলো বাসনাময়ীর কাছে। হেসে বললো, ঘুম ভাঙলো ?

—হ্যাঁ।—বাসনাময়ী বললো : এ কোথায় আমি ?

—বলতে বারণ।

—কার বাড়ি এটা ?

—বলতে মানা।

—তুমি কে ?

—এ বাড়ির দাসী।

—আমাকে এখানে নিয়ে এসেচো কেন ?

এবার হাসলো দাসী : জানো না ? ন্যাকা বুঝি ?

কিন্তু আবার প্রশ্ন বাসনাময়ীর : কেন, কেন ?

উত্তরে মুখ বেঁকিয়ে দাসী বললো, আমি তার কি জানি ? যাক, এখন মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দেবে ?

—না।

—উপোষ করে থাকবে ?

—হ্যাঁ।

—কতোদিন ?

—তা জানিনে।

দাসী আবার মুখ বেঁকালো : হুঃ। কতো দেখলাম, এখন তোমার ঢঙ দেখতেই বাকি আছে।

বাসনাময়ী এবার অনুনয় করলো : আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

দাসী হাসলো : তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে এই বাবু ধরেচেন কিনা !

—না-হয় তুমি আমাকে ছেড়ে দাও !

দাসী হাসলো আবার : আমার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে বুঝি ?

বাসনাময়ী বললো, আমার ছেলে আছে স্বামী আছে সংসার আছে গেরস্তের বৌ আমি, আমাকে কেন —

দাসী উত্তর দিলো : তোমার দেহে রূপ-যৌবন আছে কেন ?

—সে কি আমার দোষ ?

—তোমার কপাল-দোষ।

—তা দাও না একটা নুড়ো জেলে এই রূপ-যৌবন পুড়িয়ে !

দাসী আবার হাসলো : সে জন্যে ভাবনা কেন ? কপাল পুড়েচে, মুখ পুড়ুক। তারপর রূপ-যৌবনও পুড়বে বৈকি।—নাও, এখন মুখ হাত ধুয়ে খাবে কিনা বলো ?

বাসনাময়ী চুপ করে রইলো।

দাসী বললো, যে পাল্লায় পড়েচো, আর মুক্তির কথা ভেবো না। কেউ মুক্তি পায়নি। বরং কিছু মুখে দাও, শরীরটে ঠাণ্ডা করো।

বাসনাময়ী কথার উত্তর দিলো না।

দাসী বললো, আর যাবেই বা কোথায় বাপু ? সোয়ামী পুত্তুর আর

তোমাকে ঘরে নেবে নাকি? নাও ওঠো।—বাসনাময়ীর হাতটা ধরে টানলো সে।

অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠলো বাসনাময়ী।

বাসনাময়ী একবার জানলার কাছে গেলো। জানলাটার মোটা লোহার গরাদ। বাইরেটায় জাল দেওয়া। অনেক উঁচুও জানলাটা। হয়তো দোতলা বা তেতলা। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো, নীচেটা ফাঁকা। দূরে অনেক গাছ, নারকেল গাছও। আর মাঝে মাঝে হোগলা পাতার কাঁচা ঘর।

দাসীর সঙ্গে গেলো বারান্দা দিয়ে কাছেই কলঘরে। বারান্দাটা কাঠের খড়খড়ি দিয়ে ঘেরা। বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা রাখবার ব্যবস্থা। আর আশ্চর্য, এতোবড় বাড়িটায় আর লোক নেই নাকি? সব থমথম করছে, নীরব নিস্তব্ধ।

দাসীর সঙ্গে বাসনাময়ী আবার ফিরে এলো ঘরে। এসে চুপ করে বসে রইলো খাটের উপর। দাসী একটা রেকাবিতে জলখাবার এনে সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলে রেখে বললো, খাও এগুলো, জল দিই।

জল এনে টেবিলে রাখলে বাসনাময়ী জিগ্যেস করলো, আচ্ছা, এ বাড়িতে আর কাউকে তো দেখছিনে, আর কেউ থাকে না?

—থাকে বৈকি।

—কোথায় তারা?

ওসব জিগ্যেস করতে নেই।—নাও খাও।

বাসনাময়ী হাত গুটিয়ে বসে রইলো। দেখে ধমক দিলো দাসী: নাও, খাও না। কেন মিছে বকাচ্চো?

অগত্যা বাসনাময়ী অল্প একটু মুখে তুলে ঢকঢক করে সব জলটাই খেলো।

দাসী কিছু বললো না। বাকি খাবার সমেত রেকাবিটা ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজেই সবটা শেষ করে ফেললো। পরে ফিরে এলো ঘরে।

তারপর যে ক'বার দাসীটা ঘরের বাইরে গেলো, বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গেলো সে। ঢুকলো আবার তালা খুলে। দুপুরে মেঝের আসন পেতে ভাতের থালা দিলো সাজিয়ে। কোথা থেকে কীভাবে সব আসছে যাচ্ছে বাসনাময়ী কিছুই বুঝতে পারলো না।

দুপুরে খাওয়ার পর বাসনাময়ী চুপচাপ শুয়ে থাকলো বিছানায়। চোখ বুজে শুয়ে রইলো। মাথায় কতো রকমের ভাবনা চিন্তা প্রশ্ন। কোনো কিছুরই সমাধান করা গেলো না। সারাক্ষণ দুচোখ খুলে চেয়ে রইলো কড়ি-বরগার

দিকে, কাঁচের আলোর ঝাড়ের দিকে। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় কানে এলো বাইরে ঘণ্টা বাজার শব্দ।

ক্রমে বাইরে দিনের আলো হয়ে এলো ম্লান। বাইরে মুক্ত আকাশটা সারাটা দিনই ঘরে বন্দিনী বাসনাময়ীর দিকে চেয়ে-চেয়ে হেসেছে। এখন সেও সাঁঝের অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করছে। ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো আবছা অন্ধকার।

দাসীটা সারাদিনই ঘরের মধ্যেই আছে। মাঝে একবার ঘরের বাইরে দরজার গোড়ায় বসে খেয়ে নিয়েছে। পান-দোক্তাও চিবিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। তবে সেও চোখের পাতা এক করেনি ভুলেও।

সন্ধ্যে হতেই দাসীটাই ঘরের কোণে জোড়া বাতিদান দুটোর আলো জ্বালিয়ে দিলো। সেই আলোয় ঝোলানো বড়ো বাতিঝাড়টা চিকচিক করে উঠলো। যেন ফিকফিক করে হেসে উঠলো বাসনাময়ীকে দেখে।

বাসনাময়ীর মনে পড়লো মানিকপুরে তুলসীমঞ্চের কথা। এখন তার সেখানে প্রদীপ জেলে প্রণাম করবার কথা। দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে এখানেও সে প্রণাম করলো। অভ্যেস। তবে আজকের প্রার্থনা আলাদা রকমের। এতোদিন বলে এসেছে, হে ঠাকুর, স্বামী-পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখো, সংসারে সুখ-শান্তি দাও। আর আজ শুধু বললো সে : হে ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করো। এ কী করলে তুমি? কী দোষ করেচি আমি?

কিছুক্ষণ পরে বাসনাময়ীর কানে ভেসে এলো দূরে কোথা থেকে গানের সুর। কেমন যেন অন্যধরনের গান। কীর্তন বা গাঁয়ে যেমন বেষ্টম-বেষ্টমীদের গান শোনা যায় তেমন গান নয়।

বাসনাময়ী অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো : কোথায় গান হচ্চে?

—এ বাড়িতে।—দাসী বললো, বাবু বৈঠকখানায় বসেচেন।

বাসনাময়ী চুপ করে রইলো।

একটু পরে আবার জিগ্যেস করলো : আচ্ছা তোমাদের বাবুর বৌ আছে? গিন্নীমা?

—আছেন বৈকি।

—তাঁকে তো দেখলাম না?

শুনে হাসলো দাসী : তাঁকে চন্দর সুয্যু দেখতে পায় না, আর তুমি দেখবে!

আবার প্রশ্ন : তোমাদের গিন্নীমা খুব সুন্দরী, না?

—হুঁ। যেন পটে আঁকা ছবি।

—তাহলে কেন—

এবার আঁতকে উঠলো দাসী ঃ চুপ করো। আমার মুখ দিয়ে সব বলিয়ে বিপদে ফেলতে চাও নাকি ?

অগত্যা চুপ করতে হলো বাসনাময়ীকে। শুনতে লাগলো বৈঠকখানার অদ্ভুত গানের আওয়াজ।

একটু পরে দাসী মেঝেতে জায়গা করে লুচি তরকারি দই মিষ্টি এনে রাখলো ঃ নাও, এগুলো খেয়ে নাও।

বাসনাময়ী জিগ্যেস করলো. এখুনি ?

—হ্যাঁ।—দাসী কড়া হুকুম দিলো ঃ বেশি বকিয়ো না। এসো এসো।

কাজেই বাসনাময়ী গিয়ে বসলো থালার সামনে। কোনোরকমে দুখানা লুচি মুখে তুলে জল খেয়ে উঠে পড়লো সে। দাসী বাকি খাবার বাইরে নিয়ে গিয়ে সকালের মতোই শেষ করলো সেগুলো।

একটু পরেই বাসনাময়ীর কানে এলো ঘুঙুরের আওয়াজ ঐ বৈঠকখানা থেকেই।

—কেউ নাচ্চে বুঝি ?—বাসনাময়ী জিগ্যেস করলো।

দাসী চুপ করে রইলো।

কিন্তু বাসনাময়ীর আবার প্রশ্ন ঃ হ্যাঁগো, কেউ নাচ্চে বুঝি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।—তেড়ে উঠলো দাসী ঃ বাঈজী নাচ্চে।

কিন্তু বাঈজী কী বস্তু, কেন নাচ্চে সে, কিছুই আর জিগ্যেস করতে সাহস হলো না তার।

তবে একটু পরে আর একজন অল্পবয়সী মেয়েমানুষ, দাসীই হবে বোধহয়, হাতে রেশমীশাড়ি জামা আতর চন্দন কুমকুম গয়না আর ফুলেরমালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। দেখে বাসনাময়ী অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, এসব কি ?

নতুন দাসী বললো, এসব পরতে হবে।

—কেন ?

নতুন দাসীটা এবার আগেকার দাসীর দিকে চেয়ে হেসে বললো, নাও গো মাসী, এবার এনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাও কেন এসব পরতে হবে।

আগেকার দাসীটা বললো, বাবুর কাছে যেতে হবে যে।

—না, না, আমি যাবো না।—আঁতকে উঠলো বাসনাময়ী।

শুনে দাসী দুজনই হি-হি করে হেসে উঠলো।

আগেকার দাসী বললো, তবে কি তোমাকে নৈবিদ্য খাওয়াবে বলে ঘরে এনেচে!

বাসনাময়ী বললো, আমাকে ছেড়ে দিক না। কে আমাকে নৈবিদ্য খাওয়াতে বলেচে!

আগেকার দাসীটা বললো, সেসব বাবুকে জিগ্যেস করো বাপু। এখন এসবগুলো পরে সেজেগুজে নাও তো!

—না।

নতুন দাসী বললো, এ বাড়িতে 'না'-য়ের মানে কি তা জানো না, তাই বলতে পারচো।—আগেকার দাসীকে বললো, বলো না মাসী, সেই মাগীর চাবুক খাওয়ার গপ্পোটা।

—হুঁ—আগের দাসীটা বললো, ভালোমানুষের মেয়েকে আগে থেকে বলে রাখাই ভালো। শোনো গো বাছা, এক মাগী খুব হেন্ডাই-পেন্ডাই করছিলো, কিছুতেই বাবুর কাছে যাবে না। অগত্যে আমরা খবর পাঠালাম বাবুকে, মাগী যেতে চাচ্চে না। শুনে বাবু রেগে গিয়ে একঘর ইয়ার বন্ধুর সামনে তাকে আনিয়ে ন্যাংটো করিয়ে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগলেন। মাগী জ্বালায় কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগলো। আমাদের চোখে পর্যন্ত জল এসে গেছলো। তাই না রে?

শুনে বাসনাময়ী ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

নতুন দাসী এবার বললো, মাসী, আর সেই আর এক মাগীকে মদে চুবোনোর গপ্পোটা? সেটাও শুনিয়ে দাও একবার।

—হুঁ, সেও এক কাণ্ড।—আগেকার দাসীটা বললো, বাবু সে মাগীকে কতো সাধলেন, একটু মদ খাও। সে কিছুতেই খাবে না। বেয়াড়াপানা দেখে বাবু তো চটে লাল। বললেন, তবে রে মাগী, খাবিনে! তবে মদই তোকে খাবে। ব্যাস, তখনই হুকুম হলো, বড় গামলা এলো, তার মধ্যে ঢালা হলো বোতল-বোতল মদ। তারপর মাগীকে ন্যাংটো করিয়ে সেই গামলার মধ্যে ফেলে সেই মদ বাবু ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে গেলাস-গেলাস খেতে লাগলেন আর কুলকুচি করে মাগীর চোখে-মুখে ছিটোতে লাগলেন। তখন মাগী শায়েস্তা হলো।

শুনে দুহাত মুখে চাপা দিয়ে বাসনাময়ী হুমড়ি খেয়ে পড়লো বিছানায়। নতুন দাসীটা এবার হেসে বললো, নাও, শুনলে তো এ বাড়িতে 'না' বলার ফল। এখন জামা-কাপড়গুলো পরে সেজেগুজে নাও।

আগেকার দাসীটা হেসে বললো, কোনো উপায় নেই বাছা। পড়েচো যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

এবার বাসনাময়ী মাথা তুললো। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। জিগ্যেস করলো ঃ আমাকে মদ খেতে হবে?

—হবে হয়তো।

—কিন্তু মেয়েমানুষে আবার মদ খায় নাকি?

—খায় বৈকি!

—মদ খাওয়া তো পাপ।

—পাপ পুণ্য এ বাড়িতে নেই।

বাসনাময়ী হঠাৎ জিস্যেস করলো, আচ্ছা, মদ খেতে কি রকম?

—আমরা খেয়েচি নাকি কখনো! তবে শুনিচি তেতো।

—খেলে কি হয়?

—মাতলামি করে তো দেখি।

—বেশি খেলে কি হয়?

—অজ্ঞান হয়ে যায়।

নতুন দাসীটা বললো, মরেও যায়। তাই না মাসী?

—তাও যায় হয়তো।—মাসী বললো।

নতুন দাসীটা বললো, এসো সাজিয়ে দিই। দেরি হলেই বিপদ। বাবুর আসার সময় হয়ে এলো।

আর দেরি না করে নতুন দাসী বাসনাময়ীকে সাজাতে আরম্ভ করলো। বাসনাময়ী নির্বিকার হয়ে রইলো। একটা মৃতদেহকে যেন চিতায় তোলার আগে সাজানো হচ্ছে। কোনো সাড়া নেই বাসনাময়ীর। জোরজার কিছুই করলো না সে। কোনো লাভ নেই, এটুকু বুঝতে আর বাকি নেই বাসনাময়ীর।

সাজানো হয়ে গেলে বড়ো দেওয়াল-আর্শিতে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলো বাসনাময়ী। মনে পড়লো তার সেই বিয়ের দিনের কথা। এমনি করেই সেজেছিলো সে। মনে সেদিন তার কতো আশা-আশংকা, ভয়-ভরসা। আর আজ? সে কার সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে চলেছে। যাচ্ছে এক রাক্ষসের সামনে। তার খাদ্য হয়ে। পেটুকের সামনে যেমন খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি করেই তাকে সাজানো হয়েছে। হে জগন্নাথ, এই ছিলো তোমার মনে?

—বাঃ, দিব্যি মানিয়েচে!—আগের দাসীটা বললো, বাবুর পছন্দ আছে বলতে হবে। তাই না রে?

মুখ টিপে হেসে নতুন দাসীটা বললো, তা আর বলতে।

বাইরের বৈঠকখানায় তখনও শোনা যাচ্ছে ঘুঙুরের শব্দ। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজলো অনেকগুলো।

ঢাকা বারান্দা দিয়ে দুই দাসীর সঙ্গে বাসনাময়ী চললো, কোথায় কে জানে। পরনে নববধূর বেশ। চলনের সঙ্গে আলক্ত পায়ে তোড়া বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। আর বাসনাময়ীর বুকের মধ্যে ঝাঁঝর বাজছে যেন ঝমঝম ঝমঝম।

একবার থমকে দাঁড়ালো সে। না, না।

—কী হলো?—নতুন দাসী টানলো তাকে।

আবার চলতে শুরু করলো সে। বলির পাঁঠা।

একটু পরেই একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা।

—এসো।

তাদের সঙ্গে ঢুকলো ঘরে বাসনাময়ী। সুসজ্জিত ঘর। মৃদু সবুজ আলো। সুগন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছে। চার দেওয়ালে বড়োবড়ো আর্শি ঝোলানো। ঘরের মাঝখানে বিরাট একখানা খাট। তাতে মখমলের বিছানা পাতা, তাকিয়া বালিশ আর পাশবালিশ দিয়ে সাজানো। খাটের বাজুতে ফুল, ঝুলছে ফুলের মালা। জুঁই ফুল।

হ্যাঁ, দেখলো চেয়ে চেয়ে বাসনাময়ী, ঘরের এক কোণে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর মদের বোতল আর গেলাস।

দেখলো সবই। সাজানো নরম বিছানাও। তার সতীত্বের বধ্যভূমি। বাবুর কামলীলা-ক্ষেত্র। স্বপ্নের ঘোরে দেখতে লাগলো সে। নির্বাক নির্বিকার।

—বসো এইখানে।—একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে তারা বসালো তাকে।

নতুন দাসী বললো, বাবু এলে উঠে দাঁড়িয়ো।

আগেকার দাসী বললো, তুই থাক। আমি যাই।

বাইরে চলে গেলো সে। নতুন দাসী বাসনাময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো কাঠ হয়ে। না, পাথর হয়ে।

ঘামছে বাসনাময়ী। দরদর করে ঘামছে। মুখের চন্দনরেখা বুঝি মুছে যায়। দেখে দাসী একখানা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে বাসনাময়ীর। কান দুটো গরম হয়ে গেছে, ঝাঁ-ঝাঁ করছে। অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি। গেলে ভালোই হয়।

বাসনাময়ী কপালটা ডান হাতে টিপে ধরে বসে রইলো।

কতক্ষণ এমনভাবে বসেছিলো জানে না বাসনাময়ী, হঠাৎ জুতোর ঘষড়ানি শব্দে মুখ তুলে দেখে দরজার সামনে বাবু দাঁড়িয়ে। দু'পাশে দু'জন চাকর তাঁকে ধরে আছে।

বাসনাময়ী ভয়ে আতংকে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো ঃ না, না।

বাবু শুনলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন শুধু। তারপর ঢিলে পায়ে নিজেই হেঁটে এলেন খাটে কাছে। চাকর দুজন চলে গেলো। দাসীও পাখা রেখে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। যাবার সময় ঘরের দরজাটা দিলো বন্ধ করে।

বাবু খাটে এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসলেন।

মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি পরা। গিলে-করা হাতা। পরনে কাঁচি মিহি ধুতি। শরীরের সর্বাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। দশ আঙুলে দশটা আংটি। নানারকমের পাথর বসানো। বাবরি চুল। গোঁফজোড়া প্রজাপতির মতো। সেই বাবু। মাহেশের ঘাটের সেই বাবু! বজরার সেই বাবু!

বাসনাময়ী ভয়ে চোখ বুজলো।

বাবু বাসনাময়ীর দিকে একবার ভালো করে দেখলেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলেনও। পরে জড়ানো স্বরে বাজখাঁই গলায় বললেন, এসো, বসো এই খাটে।

বাসনাময়ী কিন্তু তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলো।

বাবু আবার বললেন, কই, এসো—।

খাটের কাছে এসে দাঁড়ালো বাসনাময়ী।

—নাম কি তোমার?

বাসনাময়ী চুপ করে রইলো।

—নাম কি?

—বা-বা-বাসনাময়ী।—গলা দিয়ে কোনোরকমে বেরুলো কথাটা।

—দেশ কোথায়?

—মানিকপুর।—গলা শুকনো।

—কে আছে তোমার?

—স্বামী পুত্তুর সংসার—সব, সব আছে।—বলেই বাসনাময়ী হঠাৎ বাবুর পায়ে ঢিবঢিব করে মাথা ঠুকতে লাগলো: আমাকে বাঁচান, রক্ষে করুন। আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আমার বাবা—

শুনেই ধমকে উঠলেন বাবু: এই চোপ। আমি তোর বাপ কে বললে? আমি তোর মাকে দেখিইনি কোনোদিন।—বলেই বললেন, দ্যাখো চাঁদবদনি, আমার রঙীন নেশাটাকে নষ্ট করো না। তা হলেই সব গুলিয়ে যাবে। যাও, ঐ মদের বোতল আর গেলাসটা নিয়ে এসো তো!

বাসনাময়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—যাও!—বাবু হাঁকলেন: নিয়ে এসো। যা বলচি শোনো। জানো, আমার কথা না শুনলে···। আর শুনলে রানীর হালে থাকবে। বুইলে?

বাসনাময়ী কথার কোনো উত্তর দিলো না।

বাবু বাসনাময়ীর থুতনিটা দুবার নেড়ে দিয়ে বললেন, দ্যাখো সুন্দরি, আমি ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ। বুইলে?—বলেই ডান হাত দিয়ে বাসনাময়ীর মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়ালের কোণটা দেখালেন: ঐ দ্যাখো—!

বাসনাময়ী সভয়ে দেখলো একটা চাবুক। মনে পড়লো দাসীর গল্পটা।

বাবু বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে: অবশ্য, ওটা আমি সহজে ব্যবহার করতে চাইনে। তবে ভুলে যেয়ো না, বৈঠকখানার মজা ছেড়ে তোমার কাছে এসেচি, কেবল তোমায় দেখে মজেচি বলে। বুইলে? যাও, নিয়ে এসো ঐ গেলাস বোতল।

বাসনাময়ী বিনা বাক্যব্যয়ে নিয়ে এলো বোতল গেলাস।

—ঢালো।

বোতলের ছিপি খুলে কাঁপাহাতে বাসনাময়ী খানিকটা মদ ঢাললো গেলাসে।

—দাও।—নিজে খানিকটা খেয়ে বাবু গেলাস এগিয়ে ধরলেন বাসনাময়ীর মুখের সামনে: নাও, খাও।

বাসনাময়ী চুপ করে রইলো।

—কী, খাবে না? এঁটো খাবে না বুঝি?—বলেই হঠাৎ বাঁ হাতে বাসনাময়ীর গলাটা জড়িয়ে ধরে কোলের মধ্যে টেনে এনে তার দুই ঠোঁটে হিংস্রভাবে চুম্বন করলেন: নাও, এবার তো মুখ এঁটো করে দিলাম, খাও এবার! খেলে দেখবে কেমন মজা!

বাসনাময়ী নিজেকে কোনরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আমি ওসব খাইনে।

বাবু হাসলেন ঃ এসব পাবে কোথায় চাঁদ যে খাবে ? এসব খাস বিলিতি মাল ।

বাসনাময়ী সে কথায় উত্তর না দিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন ।

—হুঃ ! ছেড়ে দেবো ?—বাবু আবার ঠোঁট বাঁকালেন ঃ তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যেই বুঝি এতো কষ্ট করে আনালাম ?—বলেই একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন, দ্যাখো বাপু, শহরের সব বাঈজী বেশ্যা ভোগ করে-করে মুখটা কেমন যেন মেরে গেচে, তাই তোমাদের মতো দু'একটাকে মাঝেসাঝে আনা, এই একটু মুখ বদলাবার জন্যে । বুইলে ? অনেকটা শহুরে ঘোড়া দানাভূষি খেয়ে খেয়ে মাঠের সবুজ ঘাস পেলে যেমন খুশি হয়, ঠিক তেমনি ।

বলেই হো-হো হেসে উঠলেন বাবু । বুঝি নিজের রসিকতাতেই । তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, বসো, খাটের ওপরে উঠে বসো ।

বাসনাময়ী কিন্তু নড়লো না ।

—কই, বসো ।—হাত ধরে টানলেন বাবু ।

বাসনাময়ী একটু দূরে সরে বসলো খাটে ।

—এই নাও, খাও ।—বাবু এগিয়ে দিলেন গেলাসটা ।

বাসনাময়ী বাবুর হাতের গেলাসটার দিকে একবার দেখলো চেয়ে । তারপর বললো, না, আমি খেতে পারবো না ।

—পারবে না ? বেশ আমি খাওয়াচ্ছি—বলেই বাবু কাছে সরে এসে বাসনাময়ীর মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে ফেলে তার নাক টিপে ধরলেন বাঁ হাত দিয়ে । বাসনাময়ী দম বন্ধ করে থাকতে না পেরে যেই মুখ খুলেচে একটু, অমনি গেলাসটার মদ উপুড় করে ঢেলে দিলেন তার মুখে ঃ এবার ?

হ্যাঁ । মুখের মধ্যে গেলো মদ খানিকটা । বিস্বাদ । তেতো । গা গুলিয়ে উঠলো তার । তারপর কী খেয়াল হলো তার, উঠে বসে বাবুর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বোতলটার থেকে আরো খানিকটা মদ ঢেলে নিলো । নিয়েই চোখ বুজে ঢকঢক করে গিলে ফেললো সবটা ।

গেলাস খালি করে বাসনাময়ী আবার ঢাললো মদ বোতল থেকে । দাসীটা বলেছিলো, বেশি মদ খেলে অজ্ঞান হয়ে যায়, মরেও যায় ।

বাসনাময়ী আবার গেলাস মুখে তুলতেই বাবু বললেন, ওকি করচো ?

বাসনাময়ী বললো, মদ খাচ্ছি । মজা হবে । কখনো খাইনি তো । বেশ খেতে ।

বলেই ঢকঢক করে আরো আধ গেলাস শেষ করতেই বাবু তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিলেন : অতো খেতে হয় নাকি।

—হ্যাঁ হয়।—বাসনাময়ীর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগলো। চোখের পাতাদুটো ভারি হয়ে এলো।

বাবু বাসনাময়ীকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তার চোখে-মুখে চুমু খেতে লাগলেন : ছিঃ! প্রথম বার অতোটা খাওয়া খুব অন্যায় হয়েচে।

অন্যায়! বাসনাময়ীর মুখে ফ্যাকাসে হাসি। তার কথাও তখন ঢিলে-ঢালা : কী—অ—ন—ন্যা—য়—বা—বু—ম—শা—য় ?

বাবু তাকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরলেন : ছিঃ, অতোটা খেলে কেন ?

—বেশ বে—শ করে—চি। খু—উ—ব—খু—ব করে—চি।—বলেই নেতিয়ে পড়লো, এলিয়ে পড়লো বাসনাময়ী বিছানায়।

—বটে!—বাবু হাসলেন। খুলতে লাগলেন তার শাড়ি-জামা। ফল খাওয়ার আগে যেন তার খোসা ছাড়ানো।···ততক্ষণে বাসনাময়ীর পৃথিবী ঘোলাটে হয়ে গেছে। চোখের পাতা সীসের মতোই ভারি। সর্বাঙ্গ অসাড়।

একবার মনে হলো, একটা রাক্ষস তার দেহের 'পরে উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গায়ের মাংসগুলো খাবলে খাবলে খাচ্ছে। খা—ক। খাকগে!

বাসনাময়ী অজ্ঞান হয়ে গেলো।

৪৬

—মা কোথায়? মাকে এনে দাও। আমি মার কাছে যাবো—বলে মাঝরাত্রে মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে খোকন। কালিদাসী তাড়াতাড়ি তাকে বুকে চেপে ধরে। বলে, আচ্ছা কাল তোর মাকে নিয়ে আসবো।

খোকন আবার কালিদাসীর বুকের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে চুপ করে থাকে। একসময় ঘুমিয়েও পড়ে।

কালিদাসীর হয়েছে মুশকিল।

ছেলেটাকে তার বাপের কাছে রাখতেও সাহস পায় না। বাবু যেন কেমনতর হয়ে গেছেন। মানুষটার হুঁশ যেন আর নেই বললেই হয়।

স্বর্ণ সেই যে বেণীমাধবকে জোর করে খাইয়ে গেলো, তারপর থেকে নামমাত্র খেতে বসেন, অথচ খান না কিছুই। একটু মুখে দিয়েই উঠে পড়েন।

মাঝে মাঝে হা-হা করে হেসে ওঠেন। কখনোবা কাকে যেন শাসান।

ঐ সব দেখে কালিদাসী খোকনকে তার বাপের কাছে শুতে দিতেও ভয় পায়। কী জানি, কী ভেবে ছেলেটার গলা টিপে দিলেই হলো।

তাছাড়া দু'এক রাত্রে উঠে দেখেছে সে, বেণীমাধব চুপচাপ শোবার ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা উঠোনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। এক রাত্রে দেখে, পিসীমা মানে নীরোদাসুন্দরী যেঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরেছিলো সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই যেন কী সব বলছেন।

দূর থেকে দেখে কালিদাসীরও চোখে জল আসে। ভাবে, মানুষটা কী ছিলো, কী হয়ে গেলো! হায়, হায়! এমন জমজমাট সংসারটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেলো। এখন ছেলেটুকুকে মানুষ করতে পারলে তবেই রক্ষে। খোকনকে বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনতে পারলে তবেই যদি সংসারটা আবার দাঁড়ায়।

কালিদাসী আগে বেণীমাধবের সঙ্গে কথাবার্তা কিছুই বলতো না। বাসনাময়ী যখন ছিলো তখন দরকারও ছিলো না কথা বলবার। যা কিছু কথা হতো তা গিন্নীমায়ের সঙ্গেই। তার নির্দেশমতোই কাজকর্ম করতো।

কিন্তু বেণীমাধবের অবস্থা দেখে কালিদাসী ভাবলো, আর লজ্জাসরম করে লাভ নেই। এমন করে না খেয়ে মানুষটা কতোদিন বাঁচবে! নিজে কৈবর্তের মেয়ে, কাজেই বামুনবাড়িতে তার হাতের রান্না চলবে না, তাই সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে পাড়ার এক বামুনবৌ'কে দিয়ে রান্না করিয়ে কর্তাকে ভাত দেবার ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো কর্তার কেবল পাতে বসাই সার হচ্ছে, তখন সে একদিন নিজেই একগলা ঘোমটা দিয়ে বললো, কত্তাবাবু, দুটো মুখে দিন, শরীলটে নষ্ট করে তো লাভ নেই। ছেলেটুকুর জন্যেও নিজের দিকে একটু নজর দেন বাবু!

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তেমনি দু'গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন বেণীমাধব।

কালিদাসী পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে গিন্নীদের কাছে গিয়ে চেষ্টা করেছিলো, যদি কেউ এই অচল অবস্থার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। তা তাঁরাও নিজেদের কর্তাদের বুঝিয়ে পাঠিয়েছিলেন বেণীমাধবের বাড়িতে। এসেছিলেন দীনু কোবরেজ, তাঁর ছেলে উমাচরণ, আরো অনেকে। গরুর গাড়ির সেই প্রাণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণও এসেছিলো। এবার এসেছিলেন সবাই আন্তরিকভাবেই সহানুভূতি জানাতে, সান্ত্বনা দিতে।

কিন্তু বেণীমাধব তাঁদের দেখেই ঘর থেকে একখানা লাঠি বার করে

তেড়ে এলেন : কী চাই, কী চাই এখেনে ? মজা দেখতে আসা ? মজা ?
বেরোও, বেরোও আমার বাড়ি থেকে !

এরপর কেউ থাকতে পারেন না। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সবাই।

অবশ্য কালিদাসীর চেষ্টায় মেয়েরাও এসেছিলেন। এসেছিলেন মোক্ষদাসুন্দরী, মনোমোহিনী, যশোমতী, হরিমতী আর তাদের মা কৃপাসুন্দরী। এসেছিলো মানময়ীও। কিন্তু বেণীমাধবের কাছে কেউই এগুতে সাহস করলেন না। নিজেদের মধ্যেই গুজগুজ ফুসফুস করে চলে গেলেন। শেষে একদিন সাহস করে এলেন মোক্ষদাসুন্দরী আর মনোমোহিনী। হাজার হোক বেণীমাধবের সঙ্গে তাঁরাই গেছলেন মাহেশে। তাছাড়া বর্ষীয়সী তাঁরা, হয়তো তাঁদের কথা রাখতে পারেন বেণীমাধব। এই ভেবে দুজনেই সলজ্জ ভীরুপায়ে এগিয়ে গেলেন বেণীমাধবের ঘরের দরজার সামনে। এঁদের মধ্যে দীনু কোবরেজের স্ত্রী মনোমোহিনীই প্রবীণা, তাই তিনিই একগলা ঘোমটা দিয়ে দরজার কাছ থেকে বললেন, দেখুন বাবা, যা হবার সে তো হয়ে গেচে। আপনি পুরুষমানুষ, আপনার তো এভাবে অধৈর্য হওয়া চলে না। ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোঁ —

আর বলতে পারলেন না মনোমোহিনী। বেণীমাধব ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, কেন মিছিমিছি বিরক্ত করতে এয়েচেন ? আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন তো !

অগত্যা এঁদেরও বিদায় নিতে হলো।

কালিদাসী সব দেখে অকূল সাগরে ভাসতে লাগলো। নাঃ, বাবুকে আর বাঁচানো গেলো না দেখছি !

কালিদাসী খোকনকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুয়ে শুয়ে কতো কি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে একরাত্রে হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আচ্ছা, গাঙ্গুলী-বাড়ির বড়ো মেয়ে যশোমতীকে এ বাড়িতে ডাকলে কেমন হয় ? বলে কয়ে বাবুর রান্নাটুকুও করে দিতে পারে আর দেখাশুনোও করতে পারে বাবুর। তারপর, তারপর বাবুর মনটা তো ঘুরে যেতে পারে! পুরুষের মন তো। আর যশোমতীর বয়েস হলেও দেখতেও মন্দ নয়। ঠিক হয়েছে ! এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। বাবুরও ভালো হবে আর আইবুড়ো কুলীন মেয়েটাও ঘর বর পেয়ে বেঁচে যাবে।

কালিদাসীর ইচ্ছে হলো তখনই ছুটে যায় সে গাঙ্গুলী-বাড়িতে। কিন্তু রাত তখন দুপুর। কাজেই কোনোরকমে জেগেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন খোকনকে

কোলে নিয়ে ছুটলো সাতসকালে গাঙ্গুলী-বাড়িতে। গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক : গিন্নীমা, ও গিন্নীমা, আমি কালিদাসী। একটু শুনবে নাকি গো, কথা ছিলো।

ডাক শুনে কৃপাসুন্দরী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কালিদাসী তাঁকে দেখতে পেয়েই আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার মনের কথাটা সব খুলে বললো।

গাঙ্গুলীগিন্নী সব শুনে ভেবে দেখলেন, কালিদাসীর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আরো ভেবে আশ্চর্য হলেন, ঝিটার মাথায় যা এসেছে, তাঁর মাথায় তো আসেনি এতোদিন।

কৃপাসুন্দরী রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা তুই যা। আমি যশোকে বুঝিয়ে বলে যা করতে হয় করবো'খন।

এবং সেইদিনই যশোমতী মায়ের অনুরোধে গেলো বেণীমাধবের বাড়িতে। অবশ্য, কৃপাসুন্দরীও সঙ্গে এসে তাকে রেখে গেলেন। তারপর দুপুরে পাঁচ-ব্যাঞ্জন ভাত রান্না করে যশোমতী যখন বেণীমাধবের সামনে ভাতের থালা সাজিয়ে দাঁড়ালো, তখন বেণীমাধব মুখ খুললেন : তুমি কে?

—যশো।

—যশো মানে? গাঙ্গুলীমশয়ের বড়ো মেয়ে?

—আজ্ঞে।

—তা তুমি যে রান্না করে বড়ো খাওয়াতে এলে?

—এমনি।

—এমনি? ও।—বলে বেণীমাধব যথারীতি দুচার গ্রাস খেয়েই উঠে পড়লেন।

যশোমতী হাঁ-হাঁ করে উঠলো : ও কি করচেন, উঠলেন যে। খাবেন না?

বেণীমাধব শুধু বললেন, না।

বেণীমাধব নিজের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই যশোমতী পানের ডিবেয় পান নিয়ে ঘরে ঢুকলো : এই নিন।

—কি?

—পান।

—পান আমি খাইনে।

যশোমতী তবু ছাড়লো না। বিছানা থেকে হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বললো, আমি একটু হাওয়া করি, আপনি ঘুমোন।

বেণীমাধব বললেন, কেন? এসব কেন?

যশোমতী হাসলো : এমনি।

—এমনি ?—বেণীমাধব ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, এ সংসারে এমনি-এমনি কিছু হয় ? মোটেই না। সব কর্মফলে হয়। এখন পাখাটা রেখে চলে যাও তো। আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। যিনি ভাববার, তিনি ভেবেই কাজ করচেন। কাজেই তাঁকেই ভাবতে দাও।

যশোমতী বললো, আপনি মিছিমিছি উতলা হচ্চেন।

—উতলা ? উতলা হবো কেন ?—বেণীমাধব বললেন, তুমি এয়েচো, আমার ঘর দেখতে সংসার দেখতে আমাকে দেখতে, না ?

যশোমতী মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

বেণীমাধব বললেন, তুমি এয়েচো এ সংসারের ভার নিতে। মানে, মানে, না, সে হবে না। হতে দেবো না।—বলেই একটু থেমে বললেন, আমি কোনো মেয়েমানুষকে আর বিশ্বাসই করিনে। যাও, যাও তুমি।

বেণীমাধবের কথায় যশোমতীর দুচোখ ফেটে যেন জল আসছিলো। আর সে নিজেকে সামলাতে পারলো না। পাখাখানাকে ফেলে দিয়ে দুচোখ আঁচলে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে ঘর থেকে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিলো কালিদাসী। যশোমতীকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে সে ডাকতে লাগলো : দিদিমণি ও দিদিমণি—

আর দিদিমণি। যশোমতী ছুটতে ছুটতে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলো।

কালিদাসীর মনে যেটুকু আশার আলো ফুটে উঠেছিলো, কে যেন এক ফুৎকারে সেটুকু নিভিয়ে দিলো। কালিদাসী ধপ করে বসে পড়লো দাওয়ায়।

৪৭

বিন্দুবাসিনী রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো, এখন কী করা যায় ? কলকাতায় উচ্ছন্নে-যাওয়া স্বামীকে ভালো করা যায় কি না ? কিন্তু সুতোনুটি কলকেতা শুনেছে খুব বড়ো শহর। ঠিকানাটাও ভালো করে জানা নেই। কে নাকি গানাবাবু আছেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে খবর নিতে হবে। স্বামী তাঁর নাকি মোসাহেব, না, কি।

কিন্তু একলা মেয়েমানুষ, ঐ বড়ো শহরে যাবে কি করে ? হয়তো হারিয়ে যাবে সেখানে। কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু কাকে সঙ্গে

নেবে? গোপীচরণ? কিন্তু সে কি দিদিকে ছেড়ে নড়বে? তাছাড়া বাবারও এখন বাড়াবাড়ি। বাড়িতে পুরুষমানুষ দরকার। তাহলে?

বিন্দু ভাবতে লাগলো। উপায়?

অথচ এমনিভাবে থেকেই বা কি লাভ? সধবা হয়ে বিধবার মতো থাকা!

কিন্তু এতোদিনে তো স্বামীর জন্যে তার মন কেমন করেনি? আর আজ খবর পেয়ে হঠাৎ এতো আকুল হয়ে উঠলো কেন তার জন্যে? সে কথাও ভাবলো বিন্দু।

কী জানি। হয়তো ভেবেছে, সে ভালোই আছে, সুখে আছে, শান্তিতে আছে। আর পাঁচটা কুলীনের ছেলে যা করছে, সেও তাই করছে। পাঁচ-দশটা বিয়ে করে আজ এখানে কাল ওখানে করে কাটাচ্ছে! কিন্তু যা শুনলো, তা তো নয়। মদ খেয়ে নাকি নর্দমায় পড়ে থাকে সে! শহরের পাঁচটা নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশছে সে। এমনি করে ধনেপ্রাণে শেষে মারা যাবে লোকটা। গাঁয়ের মানুষ, অতশত কিছু বোঝে না, তাই হয়তো শহরে গিয়েই ফাঁদে পড়েছে।

একবার ভাবলো, আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোক, সতীনাথ, না কী যেন নাম, ওঁকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? কিন্তু তিনিই বা যাবেন কেন? তাছাড়া একজন পরপুরুষের সঙ্গে যাওয়াটাও তো ভালো দেখায় না। হয়তো এ নিয়ে কতো কথাও উঠবে গাঁয়ে। তাহলে?

না। উপায় নেই।

তাছাড়া বাবার অসুখ। এ সময় বাবার কাছেই থাকা দরকার। আবার ভাবলো: কিন্তু থেকেই বা কি হবে? কী উপকারটা করতে পারবে সে? আর, আর বাবার যদি কিছু হয়, মা হয়তো বলবে আমিও চললাম 'সতী' হতে, আর বাবার সঙ্গে চিতায় উঠবে। হয়তো ঐ কচি মেয়েটাও। না না, সে সব চোখেও দেখা যাবে না। আর তখন সব ভার এসে পড়বে তার ঘাড়ে।

বরং দিদি আছে, ছেলে হলো, গোপীচরণ আছে, ওরাই যা হয় করবে।

আরো ভাবলো বিন্দু: আর যদি সে সত্যিই তার স্বামীর ঘর করতো! তাহলে কি পড়ে থাকতো সে বাপের বাড়িতে? তখন? ধরে নেওয়া যাক সে স্বামীর ঘরেই যাচ্ছে, শ্বশুরবাড়িতে, স্বামীর ঘর করতে।

কিন্তু মা? মা ছাড়বে নাকি? কখনোই না। একলা মেয়েকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আর একলা যাবেই বা কী করে?

হঠাৎ মনে জোর পেলো বিন্দুর: কেন পারবে না? মেয়েমানুষ বলে?

কেউ ধরতে এলে চেঁচাবে, অমনি লোক জড়ো হয়ে যাবে। ধরলেই হলো। না হয় ছুরি একখানা সঙ্গে থাকবে, নিজের বুকে বসিয়ে দেবে। না হয় বিষ নেবে সঙ্গে, ধুতরোর বিষ। তেমন বুঝলেই মুখে ফেলবে!

তারপরেই তার খেয়াল হলো: আচ্ছা, ব্যাটাছেলে সাজলেই তো হয়! চুলগুলো ছেঁটে ফেলে, ধুতি-চাদর পরে—

হঠাৎ তার মনে হলো, না, তা হয় না। নজর পড়লো নিজের সুগোল বক্ষযুগলের দিকে। না, ধরা পড়ে যাবে। খুব আঁটসাট জামা পরলে হয়তো হতে পারে। তার উপর ভালো করে চাদর জড়িয়ে—

কিন্তু গলার স্বর? সেও তো মেয়েমানুষের। মিহি। তার কি হবে? বোবা সাজবে?

নাঃ। অনেক বাধা। হবে না। মেয়েমানুষের অনেক বাধা। মন করলেই হয় না।

বিন্দু হতাশ হয়ে গেলো। পরে অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সে।

স্বপ্ন দেখলো, সে যেন পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে তীর-ধনুক হাতে কোথায় চলেচে। একটা শহরে আসতেই একদল লোক তাকে দেখিয়ে বলতে লাগলো, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি মেয়েমানুষ। আর সে যেন আঁতকে উঠে বলতে লাগলো, না, না, আমি মেয়েমানুষ নই। সত্যি বলচি নই। তবু তারা বিশ্বাস করলো না। কে যেন তার পাগড়ির ঝোলানো কোণটা ধরে টান দিলো। সে তখন তীর ছুঁড়তে লাগলো, অনেক তীর! তারপরেই ঘোড়া ছোটাতে গেলো, কিন্তু ঘোড়াটা এমন লাফালো যে, উলটে পড়ে গেলো সে দড়াম করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ঘুম ভেঙে গেলো বিন্দুর: না, না, আমাকে ধরো না।

দেখে দরদর করে ঘামছে সে।

সকালে উঠে বিন্দু মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো গত রাত্রের ভাবনা-চিন্তা। যে স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, তার জন্যে অতো মাথাব্যথা কেন? কবে একদিন তার সিঁথিতে খানিকটা সিঁদুর লেপে দিয়ে তার উপর মৌরসীপাট্টার ব্যবস্থা করে চলে গেলো, তারপর থেকে আর দেখাই নেই। নিজের গরু-বাছুরকেও লোকে দেখে। আর যেহেতু সে কুলীনের মেয়ে··

দূরে। কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারে না তার স্বামীর চিন্তা। তার মুখখানাও যেন আবছা মনে পড়ে বিন্দুর। চোখের সামনে যেন দেখতে পায়, লোকটা মদ খেয়ে নর্দমায় গড়াগড়ি দিচ্ছে! দেখতে পায়, কোনো এক মেয়ে-মানুষের পায়ে মাথা রেখে সাধছে আর সে খুব তর্জন-গর্জন করছে। দেখতে পায়, সেই গানাবাবু না কে, তার হুকুম খাটতে খাটতে জীবনটা বেরিয়ে যাচ্ছে! নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। হয়তো অসুখে পড়ে যাবে, শক্ত কোনো ব্যায়রাম।

তা আর আমি কি করবো?—বিন্দু ভাবে: আমি মেয়েমানুষ, আমার আর কতোটুকু ক্ষেমতা। ভগবান যা করেন, তাই হবে।

ভগবান, দেখা গেলো, লোহারামকে একটু ভালোর দিকেই নিয়ে গেলেন। জ্বরটা কমলো, কাশিটাও। কমলো বুকের ঘড়ঘড়ানি।

কমলো ভাবনা-চিন্তা। বিরাজমণি যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বাড়ির সকলেই।

লোহারাম খবর পেলেন ইন্দুর ছেলে হয়েছে। তবে কোনো উত্তর দিলেন না। চুপ করেই রইলেন।

বিন্দুর স্বামীর খবরটা দেওয়া হলো না তাঁকে। কী দরকার। এমন কিছু দেবার মতো খবর নয়।

হঠাৎ অনেকদিন পরে এক সকালে 'জয় রাধে' বলে উঠোনে এসে দাঁড়ালো নন্দ বোষ্টম। মাথার লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা, গলায় তুলসীর মালা, নাকে রসকলি, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা।

—মা-দিদিমণিরা সব ভালো তো?—নন্দ বোষ্টম কুশল জিগ্যেস করলো।

বিরাজমণি হেসে বললেন, আপাতত ভালো বাবা। তা তুমি ভালো তো? কোথায় ছিলে এতোদিন?

নন্দ বোষ্টম হেসে বললো, ভালোই আছি মা। আর আমাদের কি থাকার কোনো ঠিকঠিকেনা আছে?

তারপর নন্দ বোষ্টম দেখলো কর্তার নতুনবৌ ঘোমটা-দেয়া স্বর্ণমঞ্জরীকে। শুনলো কর্তার নাকি শক্ত অসুখ হয়েছিলো, একটু ভালো। শুনলো, ইন্দুর বর এসেছিলো অনেকদিন পরে। দেখলো আঁতুড়ঘরে ইন্দুর ছেলেকে। তারপর হেসে বললো, বেশ, বেশ, অনেকদিন পরে এসে অনেক কিছুই নতুন দেখলাম। তারপর বললো বিরাজমণিকে: তা মা, নাতি হয়েচে এবার কিন্তু ছাড়বো না, ভালো করে বিদেয় দিতে হবে।

বিরাজমণি বললেন, হবে বৈকি বাবা ! নাও, তুমি একটা গান করো ; অনেকদিন তোমার গান শুনিনি ।

ইন্দু আঁতুড়ঘর থেকে বললো, ঘরের সামনে এসে গান করুক, আমি একটু শুনি ।

বিন্দু হেসে বললো, নন্দদাদা, রাধার সেই বিরহের গানটা গাও ।

নন্দ বোষ্টম হেসে বললো, আচ্ছা দিদিমণি ।—তারপর একতারা বাজিয়ে শুরু করলো সুরেলা গলায়—

সই, রজনী কি দিন, হয়ে জ্বালাতন
এই বাসনা কি অনুক্ষণ—
হয়ে বিহঙ্গম যাই সেই ধাম ;
দেখি গিয়ে শ্যাম বংশীবদনে ।
হায়, কোথা গেলে পাবো
সে প্রাণমাধব,
কিরূপে মিলিব তাঁহার চরণে ।
গৃহ পরিবার সকলি অসার
সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বিনে ॥

বিন্দু নন্দ বোষ্টমের মুখের দিকে চেয়ে একমনে গান শুনছিলো, হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আচ্ছা, নন্দদাদার এই সাজটা তো মন্দ নয় । চুলগুলো তো মেয়েমানুষের মতোই ঝুঁটিবাঁধা । মাকুন্দ, দাড়ি গোঁফ না থাকায় মুখখানাও মেয়েমানুষের মতোই । তিলক কাটাও হয়েছে বেশ । তার উপর গলায় তুলসীর মালা । পরনের পোশাকটাও তো ঢিলেঢালা, পা-পর্যন্ত ঝুল ।···এ পোশাকে তো দিব্যি বেরিয়ে পড়া যায় পথে ।

আর নন্দদাদার গলার স্বরটাও যেন সরু, অনেকটা মেয়েমানুষের মতোই । বিন্দু বেশ ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলো নন্দ বোষ্টমকে । নন্দদাদাকে যদি অনেকটা মেয়েমানুষের মতো দেখায়, তবে কোনো মেয়েমানুষ যদি নন্দ-দাদার মতো সাজে তবে লোকে ধরবে কি করে ?

—এই বিন্দি, একটা বড়ো করে সিদে বানিয়ে আন ।—বিরাজমণি বলতেই চমক ভাঙলো বিন্দুর । উঠে বললো, যাই ।

স্বর্ণমঞ্জরী ঘরের দরজার আড়াল থেকে নন্দ বোষ্টমের গান শুনছিলো ঘোমটা দিয়ে, বিন্দু তার কাছে গিয়ে বললো, ছোটঠাকরুণ, একটা বড়ো করে সিদে সাজিয়ে মাকে দাওগে যাও, আমি আসচি ।

বলেই বিন্দু বাড়ির গায়েই আমবাগানে গিয়ে দাঁড়ালো।

একটু পরেই নন্দ বোষ্টম তার ঝুলিতে সিদে নিয়ে বাড়ির বার হতেই বিন্দু ডাকলো : নন্দদাদা শোনো।

—কি দিদিমণি ? —নন্দ বোষ্টম দাঁড়ালো।

—তুমি আমার একটা কথা রাখবে নন্দদাদা ?

—বলো, পারলে নিশ্চয়ই রাখবো।

বিন্দু হেসে বললো, নন্দদাদা, তোমার ঐ একতারাটা আমাকে দাও না !

শুনে নন্দ বোষ্টম হেসে ফেললো : এতো জিনিস থাকতে শেষে এই একতারাটার দিকে নজর যে ?

হাসলো বিন্দু : এমনি। দাও।—বলেই তার হাত থেকে একতারাটা নিয়ে বললো, দিলে তো ?

নন্দ বোষ্টম হেসে বললো, দিলাম। তবে কেন দিচ্চি তাও বুঝলাম না, কেন নিচ্চো তাও জানিনে।

বিন্দু বললো, এর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে ? তোমার এটা বেশ বাজে দেখলাম, তাই নিলাম।—তারপর অভিমান স্বরে বললো, আর তুমি যদি না দিতে চাও তো এই নাও।—এগিয়ে দিলো সে একতারাটা।

নন্দ বোষ্টম তাড়াতাড়ি বললো, না, না। নিয়েচো নাও। তবে ভাবছিলাম, আজ আর অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না দেখচি।

—খুব যাবে।—বিন্দু বললো, এটা ছাড়াও তোমার মিষ্টি গলার গান শুনে সবাই ভিক্ষে দেবে। তারপর বাড়ি গিয়ে একটা বানিয়ে নিয়ো।

নন্দ বোষ্টম হেসে বললো, তাই হবে।

তারপর 'জয় রাধে' বলে রওনা হলো নন্দ বোষ্টম।

বিন্দু আঁচলের তলায় একতারাটা লুকিয়ে নিয়ে সোজা এসে ঘরে ঢুকলো নিজের ঘরে।

৪৮

ফুলপুরের জমিদার সর্বময় চৌধুরীর বাড়িতেও একদিন শাঁখ বেজে উঠলো তিনবার নয়, সাতবার।

মেহলতার ছেলে হলো।

সারাবাড়ি আনন্দে যেন ডগমগ হয়ে উঠলো। সারা ফুলপুর গ্রামেও

খবরটা প্রচার হয়ে গেলো বেশ তাড়াতাড়িই। কুলীন জামাইয়ের ঔরসে জমিদারবাবুর মেয়ের ছেলে হলো, এ একটা জবর খবর বৈকি। চৌধুরীবংশে আদ্যরসের ধারা অক্ষুন্ন রইলো, একি কম কথা!

নাতি পেলো কুলীনের পদবী। সর্বময় চৌধুরীও খুশি হলেন। যাক, এতোদিনের আশা সফল হলো তাঁর।

কৃপাময়ী তো আহলাদে আটখানা। সোনারচাঁদ নাতি হয়েছে। তাও কুলীনের ছেলে। তিনি তো প্রায় আঁতুড়ঘরেই পড়ে রইলেন।

তবে কুলীন-জামাই গোবিন্দ মিত্র ইদানিং বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।

চৌধুরীবংশেরই এক দূরসম্পর্কীয়া যুবতী রাধারানী এসেছিলো কিছু সাহায্যের আশায়। কয়েকবছর আগে তার স্বামী মারা গেছে। একটি ছেলে নিয়ে কোনোরকমে দিন কাটাচ্ছিলো, ভেবেছিলো ছেলেটা বড়ো হলে তার দুঃখ ঘুচবে, কিন্তু একদিনের ভেদবমিতে সেও মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেলো।

রাধারানী এসেছিলো ফুলপুরে জমিদার বাড়ির ধনী আত্মীয়ের কাছে, যদি কিছু সাহায্য পায়, যদি তার কোনো সুরাহা হয়।

তা কৃপাময়ী তাকে হাতের কাছে পেয়ে খুশিই হলেন। ভাবলেন, স্নেহলতা তো আর দুদিন পরেই আঁতুড়ে যাবে, তখন ছেলে বা মেয়ে যাই হোক তাকে দেখাশোনারও দরকার। কাজেই যদি স্বজাতি ঝাড়া-হাতপা এমন একটি মেয়েকে কাজের জন্যে পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি?

কিন্তু ভালো করতে গিয়ে মন্দই হলো।

গোবিন্দের নজর পড়লো রাধারানীর উপরে।

পুরুষের চাহনি বুঝতে মেয়েদের দেরি হয় না। রাধারানী বুঝলো, এবাড়ির জামাইবাবুটি লোক বড়ো সুবিধের নয়। একটু এড়িয়ে চলা দরকার। কাজেই গোবিন্দ সুযোগ-সুবিধেমতো তার সঙ্গে হেসে কোনো কথা বলতে গেলেই সে লজ্জায় থতমতো খেয়ে হ্যাঁ-হুঁ করে ছিটকে সরে পড়তো। কখন কোথায় কার চোখে পড়ে যায় বলা যায় নাকি। আর পড়লেই এবাড়ির আশ্রয় ছাড়তে হবে নির্ঘাত। ঐ লোকটার আর কি? একে পুরুষমানুষ, তায় এবাড়ির জামাই! কাজেই সাতখুন মাপ! বিশেষ করে কুলীন-জামাই। দেবতার ভোগেই আছেন। সর্বনাশ যদি হয় তারই হবে।

কিন্তু ব্যাধের নজরে পড়লে হরিণীর প্রাণ বাঁচানো দায়। রাধারানীও বাণবিদ্ধ হলো।

স্নেহলতার আঁতুড়ঘরে আঁতুড়ে-ঝি থাকা সত্ত্বেও তার পাশের কোণের ঘরটায় শুতো রাধারানী। একলাই। কৃপাময়ীই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সারাদিনটা কৃপাময়ীই নজর রাখতেন মেয়ের এবং নাতির দিকে। ছেলেকে তেল মালিশ করানো, পোয়াতিকে শেঁক দেওয়ানো, নাড়ি শুকোবার জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের লুচি ভাজিয়ে চিঁড়ে ভাজিয়ে ঠিক সময়মতো খাওয়ার ব্যবস্থা করা—সব কিছুই কৃপাময়ী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করাতেন। কিন্তু রাত্রি জাগরণটা তাঁর দিয়ে হতো না। বয়েস তো হয়েছে। তাই রাধারানীর উপরেই সে ভার দিয়েছিলেন তিনি: দ্যাখ রাধি, ঐ কোণের ঘরে থাক, ছেলেটা যদি কাঁদে তো শুনতে পাবি, একটু লক্ষ্য রাখিস।—অবশ্য কারণটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কৃপাময়ী: মাইনে করা ঝি, ওদের তো আর দুখদরদ নেই। হয়তো মাগী নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, আর ছেলে ওদিকে কেঁদে ককিয়ে একশা হয়ে যাবে।—আরো বোঝালেন: তাছাড়া লতু এই পরথম পোয়াতি, এসবের কী আর বোঝে বল?

রাধারানী ঘাড় নেড়ে জানালো: মাসীমা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি মাঝে-মাঝে উঠে দেখে যাবো।

এবং গোবিন্দ এতো সব না জানলেও এটুকু লক্ষ্য করে জানতে পারলো, রাধারানী কোণের ঘরটায় একলাই শোয়। আর ঘরটাও তার শোবার ঘর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা ঢাকা বারান্দায় যোগ করা। নিরালা আর অন্ধকারও।

স্নেহলতা আঁতুড়ে যাবার পর থেকে গোবিন্দ কদিন ধরে ওৎ পেতেই ছিলো। তার ফাঁকা ঘরটায় মনটাও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। মদ গিলে গিলে মনটা যেন আরো অস্থির। ভাবটা: এমন ফাঁকা ঘর, নরম গদি বিছানা, হাতের কাছেই বিধবা যুবতী। অথচ, অথচ—ধ্যেত্তেরি!

গোবিন্দ মনে মনে ভাবলো, আর দেরি করা বোকামি। তাই এক গভীর রাত্রে গোবিন্দ পা টিপেটিপে হাজির হলো রাধারানীর ঘরের সামনে। চোরের মতো চারিদিকটা চেয়ে দেখলো কাছোকাছি কেউ নেই। চারিদিক আবছা অন্ধকার,নীরব নিস্তব্ধ। আঁতুরঘড়েও কোনো আওয়াজ নেই। ঘুমুচ্চে হয়তো।

গোবিন্দ আস্তে করে দরজায় ঠেলা দিতেই ভেজানো দরজাটা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেলো সে। আধ অন্ধকারেই শয়তানের চোখ দেখলো, রাধারানী তার যৌবনময় দেহখানা বিছানায় মেলিয়ে দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

গোবিন্দ আর সময় নষ্ট করলো না। অতি সাবধানে ভেতর থেকে দরজার পাল্লাটা চেপে বন্ধ করে দিলো। পরে নিজের কোঁচার কাপড়টা হাতে পুঁটুলি পাকিয়ে রাধারানীর পাশে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার বুকের উপরে।

আচমকা আক্রমণে রাধারানী থতমতো খেয়ে ভয় পেয়ে চেঁচাতে গিয়েও পারলো না, মুখ তার বন্ধ। চোখ দুটো তার ড্যাবড্যাব করতে লাগলো।

গোবিন্দ রাধারানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। তাতে তোমারই ক্ষতি। আমি এবাড়ির জামাই, বিশেষ করে কুলীনের ছেলে, কাজেই সাতখুন মাপ, বুঝলে?

তবু রাধারানী ছটফট করতে লাগলো।

কিন্তু রক্তপিপাসু বাঘের থাবার তলায় দুর্বল হরিণীর কতোটুকু শক্তি!

গোবিন্দ হাসলো : জোর করে লাভ নেই। বরং এসো তুমিও উপোসী, আমিও উপোসী—

রাধারানী মাথা নাড়তে লাগলো। তার মুখ দিয়ে চাপা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুতে লাগলে—গোঁ গোঁ—

—চুপ! চেঁচালেই গলা টিপে মারবো—বলেই একটু হেসে ফিসফিস করে বললো, কেন জাদু অমন করচো? গোবিন্দ মিত্তিরের হাতের মুঠো থেকে এ পর্যন্ত কোনো মেয়েমানুষই পিছলে যেতে পারেনি। আর তুমি পারবে?

না, পারলো না।

খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে শেষে হাল ছেড়ে দিলো রাধারানী। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। সে জল গিয়ে লাগলো গোবিন্দের হাতেও।

গোবিন্দ সবলে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বললো, ইস, কান্না আবার!···

খানিক পরেই কান্না শোনা গেলো আঁতুড়ঘরে। নবজাত ছেলেটা কাঁদছে : ওঁয়া, ওঁয়া!

কাঁদতেই লাগলো ছেলেটা।

স্নেহলতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঝিটারও হুঁস নেই বুঝি। ঘুমে অচেতন।

আর কর্মফল পাবার জন্যেই বুঝি ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই সেই রাত্রেই ছেলেটার কান্না ভেসে গেলো দিদিমা কৃপাময়ীর কানে।

কৃপাময়ীর কানে এলো নতুর ছেলেটা কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আঁতুড়ঘরের কাছে আসতেই হঠাৎ নজরে পড়লো, কে যেন রাধারানীর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো এলোমেলো ধুতিখানা কোমরে জড়াতে জড়াতে।

থমকে থেমে গেলেন কৃপাময়ী। তাঁর চিনতে দেরি হলো না : জামাই!

দেখে মাথাটা যেন তাঁর চন্ করে ঘুরে গেলো। কোনোরকমে দেয়ালটা ধরে নিজেকে সামলে নিলেন। আর এগুতে পারলেন না তিনি আঁতুড়ঘরের দিকে।

আর ছেলেটাও ততক্ষণে চুপ করেছে। ঝিটা হয়তো উঠে পড়েছে কান্না শুনে।

কৃপাময়ী ভারি পায়ে প্রায় টলতে টলতে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

সর্বময় চৌধুরী জেগেই ছিলেন।

গৃহিণীকে এতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে বিছানায় উঠে বসলেন : কী হলো, এর মধ্যেই চলে এলে যে!

—এমনি।—মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছে না কৃপাময়ীর।

—উহুঁ।—সর্বময় চৌধুরীর মনে সন্দেহ : কি হয়েচে বলো।

—কিছু হয়নি।

সর্বময় কড়া হলেন : আমাকে ভুল বুঝিয়ো না। বলো।

—না, না। সে আমি বলতে পারবো না।—কৃপাময়ী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ছুটে এসে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে কেঁদে ভেঙে পড়লেন।

সর্বময় কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে চেয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে কৃপাময়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বলো আমায় কী হয়েচে?

তবু কৃপাময়ী চুপ করে রইলেন।

সর্বময় এবার আচমকা জিগ্যেস করে বসলেন, জামাই—?

কথাটা কানে আসতেই কৃপাময়ী অশ্রুসজল চোখে মাথা তুলে চাইলেন স্বামীর দিকে। নিজের হাতখানা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে বললেন, আগে আমার গা ছুঁয়ে বলো, রাগের মাথায় কিছু করে বসবে না?

সর্বময় কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, কথা দিচ্ছি, চুপ করেই থাকবো। বলো তুমি।

অগত্যা কৃপাময়ীকে বলতে হলো, তিনি যা দেখেছেন।

শুনেই রেগে লাফিয়ে উঠলেন সর্বময় চৌধুরী : কোথায়, কোথায় আমার চাবুক? কোথায় সেই হারামজাদা?

কৃপাময়ী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি স্বামীর সামনে এসে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেন ঃ একি। তুমি যে কথা দিলে, কিছু বলবে না। শোনো, একটু ঠাণ্ডা হও, পরে যা হয় করো। আর মেয়েটার কথাও তো ভাবো—

সর্বময়ের যেন চমক ভাঙলো। থমকে থেমে বললেন, হুঁ, কথা দিয়েচি। এখন চুপ করেই থাকতে হবে, না? —বলেই যেন নিজের মনেই বললেন ঃ আদ্যরস। বংশের আদ্যরসের সুনামটুকুর জন্যে! নইলে···আচ্ছা···

সর্বময় বিছানায় এসে ধপাস করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন খুব ভোরেই কৃপাময়ী এসে দাঁড়ালেন রাধারানীর ঘরের সামনে। এসে তাকে বললেন শুধু ঃ তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও! এই নাও হাতে কিছু টাকা।

ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট্ট একটা টাকার বাণ্ডিল ছুঁড়ে ফেললেন মেজের উপরে ঃ তোমার পাল্কিও তৈরি আছে। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।

আর দাঁড়ালেন না তিনি। রাধারানীকে কিছু বলবারও সুযোগ দিলেন না।

রাধারানী হতভম্ব হয়ে রইলো।

তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। চোখে দেখলো আবার অন্ধকার। একটু আশ্রয় পেয়েছিলো, নিশ্চিন্ত হয়েছিলো সে, কিন্তু কপালে তার সেটুকুও সইলো না। বিনা দোষে—

রাধারানী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় একটা ঝি এসে তার সামনে দাঁড়ালো ঃ আসেন, পালকিতে ওঠেন!

রাধারানী যেন স্বপ্নচালিত হয়ে এগিয়ে চললো সদরের দিকে। ঝি রাধারানীর কাপড়চোপড়ের একটা পুটুলি বেঁধে মেজে থেকে টাকার বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে রাধারানীর পেছন-পেছন বাইরে এলো। তাকে পালকিতে উঠিয়ে তাতে ভরে দিলো পুঁটলিটা আর টাকা ক'টি।

পালকি বেয়ারারা কাঁধে তুলে নিলো পালকি।

আঁতুড়ঘরে স্নেহলতা এসবের কিছুই জানতে পারলো না। কচি ছেলেটাকে কোলের কাছে নিয়ে সে তখনও সুখনিদ্রায় মগ্ন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই জমিদার বাড়িতে নহবত বেজে উঠলো। সারাবাড়ি আত্মীয়স্বজনে সরগরম। বাড়ির লোকেরা কাজকর্মে ব্যস্ত।

জমিদার সর্বময় চৌধুরীর নাতির আজ ষষ্ঠীপুজো।

গাঁয়ের লোকেরা এই ধুমধামে একটু আশ্চর্যই হলো।

ধুমধাম তো হয় অন্নপ্রাশনে।

তবে বড়োলোকের হালচাল সবই আলাদা। একটা কিছু করলেই হলো। চাপ-চাপ টাকা থেকে কিছু-কিছু খরচ করতে হবে তো।

তাছাড়া জমিদারবাবুর এতদিনের মনের সাধ পূর্ণ হলো। কুলীন জামাইকে ঘরে রাখা সার্থক হলো তাঁর। নাতি হলো কুলীনের ছেলে। বংশের আদ্যরসের সুনামটুকু রক্ষে হলো। কম কথা।

হ্যাঁ, আশ্চর্য হলেন কৃপাময়ীও।

স্বামীকে বললেন, হ্যাঁগো, ষষ্ঠীপুজোতে এতো ধুমধাম করচো যে?

সর্বময় চৌধুরী হেসে বললেন, বারে, নাতি হলো কুলীনের ছেলে। আদ্যরসের ঘর হলাম আমরা। লোককে জানান দিতে হবে না?

তবু সন্দেহ: তা সে অন্নপ্রাশনে করলেই তো হতো?

আবার হাসলেন সর্বময়: আহা, একটু শখ হলো—

স্নেহলতা অবশ্য আনন্দেই ভরে উঠলো।

আর গোবিন্দ মিত্রের মান যেন সব চাইতে বেশি। তার জন্যেই তো এই উৎসব। হুঁ হুঁ বাবা। ভাবটা: মৌলিক, নীচু তো। এখন জাতে উঠলো, হবে না আনন্দ।

তা সর্বময় চৌধুরী মানিকপুরের গরীব বেয়ান আর তাঁর মেয়ের কথাও ভুললেন না। সঙ্গে লোক দিয়ে পালকি পাঠিয়ে আনালেন তাঁদের। সাদরে ভেতরে এনে যত্ন-আদর করলেন কৃপাময়ী। মোক্ষদাসুন্দরী তাঁর চাঁদপানা নাতিকে কোলে নিয়ে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করলেন তাঁর পুত্রবধূকেও। এই প্রথম দেখলেন তাকে। আহা যেন দুগ্‌গো পিরতিমে।

মানময়ীও খুব খুশি।

আহা, কী সুন্দর দেখতে বৌদিকে। ভাইপোটিও কেমন সুন্দর হয়েছে দেখতে। আর কী বিরাট বাড়ি। কতো লোকজন। ঝি-চাকর। পালকি, ঘোড়া। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আর লোকগুলিও বাপু বেশ। এতো বড়লোক, কিন্তু কর্তা-গিন্নীর কারোর একটু দেমাক নেই।

কিন্তু আশেপাশে কোথাও গোবিন্দকে দেখা গেলো না। অথচ গোবিন্দ বাড়িতেই। জানেও যে তার মা-বোন এসেছে। কিন্তু একবারও তাদের

সঙ্গে সে দেখা করবার দরকারও মনে করলো না। বড়োলোকের জামাই সে, গরীব মা বোনের সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক ভালো দেখায় না। তাছাড়া বাড়ির লোকজনরাও তো জেনে ফেলতে পারে, ওরা হচ্ছে জামাইবাবুর মা আর বোন।

কাজেই গোবিন্দ মিত্র বেশ একটু দূরেদূরেই রইলো। বরং চারদিকের কাজকর্ম তদারক করে বেড়াতে লাগলো। তদারক ঠিক নয়, উপর-ওস্তাদি করতে লাগলো সে। দেখাতে লাগলো, এই উৎসবের নায়ক সে-ই। তারই জন্যে এই উৎসব।

মোক্ষদাসুন্দরী কয়েকবার ছেলের খোঁজ করেছিলেন। মানময়ীও খোঁজ করেছিলো দাদার। যার সুবাদে এবাড়িতে আসবার সুযোগ পাওয়া গেছে, অথচ সে লোকটাকে হাতের কাছে না পাওয়ায় কেমন যেন অসহায় বোধ হতে লাগলো। কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো।

গোবিন্দর কথা জিগ্যেস করায় ঝি জানালো: আমাদের জামাইবাবুর কী আর নিঃশ্বেস ফেলবার যো আছে। এদিক-ওদিক দেখাশোনা করতে হচ্চে তো।

প্রায় সারাদিন ধরে খাওয়াদাওয়া চললো। সারা ফুলপুর গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়ন করলেন জমিদার সর্বময় চৌধুরী। সবাই দুহাত তুলে নবজাতককে আশীর্বাদ করে গেলেন। চৌধুরীবংশে আদ্যরসের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন বলে উপস্থিত ব্রাহ্মণরা ভোজন-দক্ষিণা পাওয়ার পর সরব ঢেঁকুর তুলতে তুলতে জমিদারবাবুর উচ্চপ্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠলেন।

আর, বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো কাঙালী-ভোজন।

ঐ বিকেলেই দুজন পেয়াদা বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়ে সর্বময় চৌধুরী পালকিতে চড়িয়ে রওনা করে দিলেন তাঁর বেয়ান আর মেয়েকে।

জোড়হাতে বেয়ানকে নমস্কার জানালেন সবিনয়ে।

গোবিন্দর সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো না।

সারাদিনের ক্লান্তি শ্রান্তিতে ভারাক্রান্ত বাড়িখানা সন্ধ্যার পর যেন অবসাদে ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো। লোকজনেরা যেন একটু তাড়াতাড়িই শয়নে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে লাগলো। কদিন ধরেই একনাগাড়ে কাজ আর কাজ চলেছে। আজ রাত্রিটায় বিশ্রাম। কাল আবার ধোয়া-মোছা, ঘর গোছানো।

গোবিন্দ মিত্র সারাটা দিন একটা কোণের ঘরে আলমারি খুলে সুবিধেমতো একটু-আধটু করে মদ্যপান করেছে যাতে মাত্রাটা বেশি না হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর গোবিন্দ ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে গাঁয়েরই আড্ডায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসলো সোমরস সেবায়। সারাদিনের খাটাখাটনির পর একটু চাঙা হতে হবে তো।

সর্বময় চৌধুরীও সারাদিনের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। অন্দরমহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর একসময় বেরিয়ে এলেন বাইরে। রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেছে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। ঘরে কৃপাময়ীও শ্রান্তিতে বিছানায় নিদ্রামগ্ন। স্নেহলতা নিজের বিছানায় ছেলেটাকে স্তনপান করাতে করাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, ছেলেটিও। ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ সে গোবিন্দর আশাও করেছিলো।

সর্বময় চৌধুরী বারমহলের একটা ঘরে গদি-আঁটা চেয়ারে এসে বসলেন। অন্দরমহলে যেতে হলে এই ঘরখানার সামনে দিয়েই যেতে হয়। সর্বময় চৌধুরী চেয়ে রইলেন খোলা দরজাটার দিকে।

খানিকপরেই একটা আবছা পায়ের শব্দ শোনা গেলো। সর্বময় চৌধুরী সোজা হয়ে বসলেন। তারপরেই দেখলেন দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে গোবিন্দ। জামাই।

—এদিকে এসো! —গম্ভীর গলায় ডাকলেন সর্বময় চৌধুরী।

শ্বশুরের হঠাৎ-ডাকে চমকে উঠলো গোবিন্দ। তার বিয়ের পর এই বোধহয় প্রথম ডাকলেন তিনি জামাইকে। গোবিন্দর গোলাপী নেশাটা এক ফুৎকারেই যেন চুপসে গেলো।

শুকনো গলায় গোবিন্দ জিগ্যেস করলো, আমাকে ডাকচেন?

—হ্যাঁ।—একটু থেমে বললেন, কোথায় যাচ্ছো?

—ঘরে। শুতে।

—না। এদিকে এসো।

গোবিন্দ ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—বাইরে।

—কী, মদ গিলতে?

চুপ করে রইলো গোবিন্দ।

সর্বময় চৌধুরী আবার জিগ্যেস করলেন, তোমার মা বোন এসেছিলেন, দেখা করেছিলে তাঁদের সঙ্গে?

—না।

—কেন?

—কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—বটে।—ভেংচি কেটে উঠলেন শ্বশুরমশায়ঃ এতো বড়ো কাজের লোক যে, মা-বোন এলেন অতো দূরে থেকে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার সময়টুকুও হলো না! না, গরীব মা-বোনের সঙ্গে দেখা করলে পাছে মান যায় সেজন্যে দেখা করলে না?

এবার গোবিন্দ বললো, যা ভাবেন।

সর্বময় চৌধুরী আবার জেরা করলেনঃ এ বাড়িতে রাধারানী নামে একটি মেয়ে এসেছিলো, তার উপর তুমি বলাৎকার করেচো। কেন?

গোবিন্দ কথার উত্তর দিলো না।

—জবাব দাও। কেন?—সর্বময় চৌধুরী ফুঁসে উঠলেনঃ আমার বাড়িতে অনাচার! তোমার ভয় নেই। এতদূর স্পর্ধা!

গোবিন্দ চুপ।

সর্বময় চৌধুরী আবার গর্জে উঠলেনঃ আর এতদূর সাহস তোমার, আমার মেয়েকে বলো কিনা তার গর্ভের সন্তান তোমার নয়! আমার বংশে কলংক দিতে চাও? তোমাকে কী জন্যে এখানে মাথায় করে রাখা হয়েচে জানো না?

—জানি।—গোবিন্দ এবার কথার উত্তর দিলোঃ কুলীনের ছেলেকে ঘরে আটকে রেখে আপনাদের আদ্যরসের বংশের সুনাম রাখতে চেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ—সর্বময় চৌধুরী বললেন, আর সেই সুনাম তুমি নষ্ট করতে চেয়েছিলে।—একটু থেমে বললেন, তাইতো অন্নপ্রাশনের আগেই ঘটা করে ষষ্ঠীপুজোয় লোক নিমন্ত্রণ করে জানিয়ে দিলাম, ও ছেলে কার! বুঝলে?

এতোক্ষণে ঐ উৎসব আনন্দের আসল কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেলো গোবিন্দর কাছে। তাই শুধু সে বললো, বুঝলাম এতোক্ষণে।

সর্বময় চৌধুরী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেনঃ নইলে তোমার মতো বেহায়া নির্লজ্জ মাতাল লম্পট কেউ আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে সাহস করে?

এবার গোবিন্দর মুখে যেন কথা ফুটলো। বললো, আমরা কুলীন। কুলীনের মান সব জায়গায়। আপনি নতুন কিছু করেননি। আর যা করেচেন তা নিজের স্বার্থের জন্যে, আমার জন্যে নয়।

—বটে!—অবাক হলেন সর্বময় চৌধুরী জামাইয়ের সাহস দেখে।

গোবিন্দ বললো, হ্যাঁ, তাই। নিজের স্বার্থের জন্যেই। নইলে কুলীনের কিসের অভাব? এতোদিনে বিশ-পঁচিশটা বিয়ে করে দিব্যি থাকতে পারতাম! পাখিকে সোনার খাঁচায় আটকে রেখে ভেবেচেন তার মাথা কিনে নিয়েচি।

—চুপ।—ধমকে উঠলেন সর্বময় চৌধুরী।

—কেন চুপ করবো?—গোবিন্দ বললো, আপনার কার্যোদ্ধার হয়ে গেচে, তাই এতো চোখ রাঙাচ্চেন! বিয়ে ফুরালে ছাদনাতলায় লাথি!

—বটে! যতো বড়ো মুখ নয়, ততো বড়ো কথা!

—যা সত্যি কথা, তাই বলচি—গোবিন্দ বেশ বুক ফুলিয়েই বললো, নইলে কে আপনার বাড়িতে আসতে চেয়েছিলো? আপনিই তো বাবার পায়ে ধরে—

—খবরদার!—সর্বময় চৌধুরী হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন: আমার মুখের ওপর কথা বলার ফল কি জানো?

বলেই ঘরের কোণ থেকে চাবুকটা এনে সপাং-সপাং করে মারতে লাগলেন গোবিন্দের আগাপাছতলা: কুলীন! কুলীনের অহংকার! তুই যদি কুলীন হোস, আমার এ বাড়ির কুকুর-বেড়ালগুলোও কুলীন। বেরো, বেরো এই বাড়ি থেকে, এখুনি বেরো।

চাবুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো গোবিন্দ। বললো, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। এই চামারের বাড়িতে কোনো ভদ্রলোক থাকে না!

—চামার!—আবার সপাসপ চালালেন চাবুক গোবিন্দর মুখে হাতে পায়ে। কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াতে লাগলো।

গোবিন্দ আর দাঁড়ালো না। ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে বাইরে।

আমি চামার! আর উনি কুলীন!—সর্বময় চৌধুরীও চাবুক হাতে নিজের মনেই গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে এলেন বারমহলে। এসে হাঁকলেন: সর্দার, বদু সর্দার!

সঙ্গে সঙ্গে বদু সর্দার সামনে এসে দাঁড়ালো। খালি গা। কালো কুচকুচে গায়ের রং। মালকোঁচা মারা। হাতে লাঠি। কোমরে ছোরা। রাতের প্রহরী।

সর্বময় চৌধুরী আধ-অন্ধকারে অদূরে গোবিন্দকে দেখিয়ে বললেন, ঐ যে লোকটা যাচ্চে, ওর পেছন নাও। এই ফুলপুর গাঁয়ের বাইরে বার করে দেবে ওকে। তারপর—

নীচু গলায় কী যেন বলে দিলেন বদু সর্দারকে।

শুনে বদু সর্দার চমকে উঠলো।

সর্বময় চৌধুরী শুধু বললেন, যাও, আমার হুকুম। দেরি করো না।

বদু সর্দার তীরের মতোই ছুটে গেলো গোবিন্দর দিকে। মিশে গেলো অন্ধকারে।

সর্বময় চৌধুরী তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। হাতের চাবুকটা টানতে টানতে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন : আদ্যরস। আদ্যরস। তাই এতো কুলীনের গর্ব।···গর্ব তোমার ভাঙচি।···একেবারেই ভাঙতাম। শুধু মেয়েটা—হ্যাঁ, মেয়েটার জন্যেই বেঁচে গেলি।···হারাম—জা—দা···

সর্বময় চৌধুরী ঘুরে দাঁড়ালেন। বেশ ধীরপায়েই ভেতরে গেলেন। আগেকার ঘরখানার মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন চাবুকটা।

পরে নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন বিছানায়।

কৃপাময়ী তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। আর নিজের ঘরে সৎসা স্নেহলতাও।

৪৯

পরদিন ভোরবেলা দেওড়া গাঁয়ের একটা রাখাল ছেলে মাঠে গরু চরাতে এসে শুনতে পেলো একটা গোঙানির শব্দ। কে যেন কাতরাচ্ছে, উঁ-আঃ-আ। তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক খোঁজ করে দেখে, ঝোপের ধারে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরনে ফরসা জামা-কাপড়। জামায় সোনার বোতাম, হাতে সোনার আংটি।

গোবিন্দ!

রাখাল ছেলেটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো গোবিন্দর কাছে।

মরে গেছে নাকি লোকটা?

সাপে কামড়েছে নাকি লোকটাকে?

না, কেউ মেরে ফেলে রেখেছে এখানে?

ছেলেটা গোবিন্দর পাশে বসে তাকে টেনে চিৎ করে শোয়ালো।

গোবিন্দর চোখ দুটো বন্ধ, মুখে অস্ফুট আর্তনাদ।

ছেলেটা এবার গোবিন্দর বুকের উপর হাত রেখে ভালো করে দেখলো, হুঁ, বুকটার মধ্যে এখনও ধুকধুক করছে।

—হ্যাগো বাবু, তুমি কে? কী হয়েচে?—জিগ্যেস করলো ছেলেটা। কিন্তু কোনো উত্তরই পেলো না।

পরে হঠাৎ ছেলেটার নজর পড়লো গোবিন্দর তলপেটের কাছে। দেখে তার কোলের কাপড়টা রক্তে লাল হয়ে রয়েছে।

ব্যাপার কি?

পেটে কেউ ছুরি বা বল্লম মেরেছে নাকি?

রাখাল ছেলেটা কৌতূহলী হয়ে গোবিন্দর তলপেটের কাপড়টা সরিয়ে দিতেই যা দেখতে পেলো, তাতে চমকে উঠলো সে।

দেখে, বাবুটার পুরুষাঙ্গটা কাটা! নেই-ই। সেখানে খানিকটা কালো রক্তের চাপ। আর খানিকটা ছেঁড়া কাপড় সেখানে ডেলা-পাকানো।

আশ্চর্য তো!

এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ছেলেটা কী করবে হঠাৎ ভেবে পেলো না। কেমন যেন হকচকিয়ে গেলো সে।

পরে ছেলেটার খেয়াল হলো, বাবুটার চোখে-মুখে জল দেওয়া দরকার। তাকে আগে বাঁচানো দরকার। সুস্থ করা দরকার। অজ্ঞান হয়ে গেছলো, ভালো করে জ্ঞান হওয়া দরকার।

সে তখনি ছুটে গিয়ে কাছেই একটা ডোবা থেকে নিজের কাপড়ের এক কোণা জলে ভিজিয়ে আনলো। পরে জল নিংড়ে নিংড়ে দিতে লাগলো গোবিন্দর চোখে-মুখে গলায়।

জলটুকু শেষ হয়ে যেতেই রাখাল ছেলেটা আবার ছুটলো ডোবার দিকে। আবার কাপড় জলে ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে আসছে, এমন সময় দেখে এক বোষ্টম বাবাজী মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

বোষ্টমটির বয়েস বেশি নয়। পরনে আলখাল্লা, কাঁধে ঝুলি, নাকে রসকলি, চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা। হাতে একটি একতারা।

বোষ্টমকে দেখে রাখাল ছেলেটার ধড়ে যেন প্রাণ এলো। বললো, বাবাজী, আমার সঙ্গে একবার এসো তো, একটা বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর—

বলেই থেমে গেলো ছেলেটা।

—আর, কি?—জিগ্যেস করলো বোষ্টমটি।

ছেলেটি উত্তরে বললো, চলো, গিয়েই দেখবে চলো।

বোষ্টমটিকে নিয়ে রাখাল ছেলেটা গোবিন্দর কাছে এসে দেখলো, বাবুটা তখন অল্প অল্প মাথা নাড়াচ্ছে আর চোখদুটো তেমনি বুজেই মুখবিকৃতি করছে মাঝে মাঝে: ওঁ-আঁ! গে-লা-ম!

ছেলেটা বোষ্টমটির হাতটা টেনে বললো, এদিকে এসো, দ্যাখো—

বলেই গোবিন্দের তলপেটের কাপড়টা একটু সরিয়ে দিয়ে যা দেখালো, সে বীভৎস দৃশ্য একপলক দেখেই শিউরে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিলো বোষ্টমটি।

তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো : ইস্!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এ-ও মনে হলো, আশ্চর্য, এমনি একটা লোকেরই বুঝি দরকার ছিলো তার চলবার পথের সাথী হিসেবে। ঈশ্বর একে বুঝি এখানে এভাবে শুইয়ে রেখেছেন তারই জন্যে, তারই সাহায্যের জন্যে। না, এ লোক মরতে পারে না, মরতে দেওয়া হবে না।

বোষ্টম তাড়াতাড়ি তার হাতের একতারাটা আর কাঁধের ঝুলিটা মাটিতে রেখে ছুটে গেলো কাছেই ঝোপজঙ্গলের দিকে। সেখান থেকে কী-এক গাছের পাতা কতকগুলো ছিঁড়ে এনে দুহাতের তালুতে রগড়ে বোষ্টম সেটা ছেলেটার হাতে দিয়ে বললো, এটা ঐ কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে দে। আর এই নে, ছেঁড়া ন্যাকড়াটা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দে।

বোষ্টমটি তার ঝুলি থেকে একটুকরো ন্যাকড়াও ছিঁড়ে দিলো তাকে। ছেলেটা বোষ্টমটির কথামতো কাজ করলে বোষ্টমটি বললো, তুই বোস এখানে। আমি আমার ঘটিটা নিয়ে জল আনচি আরো।

বোষ্টমটি তার ঝুলির ভেতর থেকে ছোট একটা পেতলের ঘটি বার করে চলে গেলো ডোবার দিকে। আর রাখাল ছেলেটা ততক্ষণে তার ভিজে কাপড়টা নিংড়ে জল দিতে লাগলো গোবিন্দর চোখে-মুখে।

একটু পরেই বোষ্টমটি এসেও তার ঘটির জল ছিটিয়ে দিতে লাগলো গোবিন্দর চোখে মুখে বুকে গলায় বেশ ভালো করে।

পরে একসময় বোষ্টমটি জিগ্যেস করলো, কে এমন করলো?

—কী জানি বাবাজী!—রাখাল ছেলেটা বললো, গরু চরাতে এসে দেখি এই কাণ্ড। তারপর ভাগ্যিস তুমি এলে!

হঠাৎ বোষ্টমটির কী মনে হলো, তাই যদিও সে গোবিন্দকে চেনে না, দেখেওনি কোনোদিন, তবু বললো, এ বাবুটিকে আমি চিনি। এ বাবুর গাঁ যেদিকে, আমি সেই দিকেই যাচ্চি—এই কাছেই—

বলেই বোষ্টমটি এবার গোবিন্দকে ডাকলো : বাবু, ও বাবু, এই দ্যাখো না, আমি এইচি।

উত্তরে গোবিন্দ কিছুই বললো না। তবে এবার চোখ মেলে চেয়ে আবার চোখ বন্ধ করলো।

—তাই নাকি ?—রাখাল ছেলেটা যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেলো। বললো, তাহলে একটা কাজ করো না বাবাজী। একে এর গাঁয়ে পেঁছে দাও না গো।

বোষ্টমটি হাসলো : এতো বড়ো লোকটাকে আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারি নাকি ?

তাই তো। ছেলেটা ভাবলো, কথাটা তো সত্যিই। তবে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না তাকে। মাথায় মতলব এসে গেলো তার। বললো, উই দ্যাখো আমাদের গরুগুলোর সঙ্গে দুটো মোষও আছে, একটার পিঠে একে কোনোরকমে বসিয়ে ধরে ধরে নিয়ে যাও তো কেমন হয় ?

বোষ্টমটি হেসে বললো, আর তোর মোষটা ?

—সে তুমি এই দ্যাওড়া গাঁয়ের ধারে কোথাও এনে ছেড়ে দিলেই ও ঠিক চলে আসবে।

বোষ্টমটি ভাবলো, ছেলেটার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মন্দ নয় এই জন্যে যে, বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে গাঁয়ের লোক যদি এদিকে আসে তখনি শুরু হবে নানা প্রশ্ন কৈফিয়ত জেরা আর নানারকমের মন্তব্য আর বক্তব্য। তার আগেই লোকটাকে অন্তত এ গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তবে বোষ্টমটি ভাবলো, কাপড়ের রক্তের চিহ্ন ঢেকে ফেলাই দরকার। তাই সে ছেলেটার সঙ্গে গোবিন্দকে এপাশ-ওপাশ করে কোনোরকমে কাপড়টার রক্তের দিকটা ঘুরিয়ে দোপাট করে জড়িয়ে দিলো গোবিন্দর কোমরে। পরে ছেলেটাকে বললো বোষ্টমটি : এটা পুরুষমানুষের লজ্জার কথা, কাউকে যেন বলতে যাসনে। বুঝলি ?

ছেলেটা ঘাড় নাড়লো।

তবে একটু পরেই মনে হলো, গোবিন্দ যেন একটু শান্ত হয়েছে। বোধহয় চোখে মুখে জল পড়ার দরুন।

বোষ্টমটি তখন সামান্য ঠেলা দিয়ে ডাকলো : বাবু, বাবু, ও বাবু।

রাখাল ছেলেটাও এগিয়ে এলো গোবিন্দর মাথার কাছে। ডাকতে লাগলো, বাবু, ও বাবু শুনচো—

আবার চোখের পাতা খুললো গোবিন্দ। বেশ খানিকক্ষণ। ঘোলাটে চোখ। ফাঁকা দৃষ্টি।

—জল দেবো, জল ?—জিগ্যেস করলো বোষ্টমটি।

উত্তরে শুধু সামান্য হাঁ করলো গোবিন্দ।

বোষ্টমটি গোবিন্দর মুখে ঘটির জল খানিকটা ঢেলে দিলো খুব সাবধানে।

—কেমন লাগচে এখন? —জিগ্যেস করলো বোষ্টমটি।

গোবিন্দ এবার ক্ষীণকণ্ঠে বললো, ভা—লো—

বোষ্টমটি আবার জিগ্যেস করলো, উঠে বসতে পারবে?

ঘাড় নাড়লো গোবিন্দ: হুঁ।

তখন বোষ্টমটি আর ছেলেটা দুজনে গোবিন্দর ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঠেলে উঠিয়ে বসালো তাকে।

এতোক্ষণে গোবিন্দর বোধহয় সব কথাই মনে পড়লো। বললো, আমাকে—আমাকে—আমাকে—তোমরা—বাঁচালে কেন?

শুনে হাসলো বোষ্টম: বাঁচা-মরা কি আমাদের হাতে?

—মরলেই—ছিলো—ভালো।— গোবিন্দ নিজের মনেই বললো। তারপর জিগ্যেস করলো, এ জায়গাটা?

—এজ্ঞে, দ্যাওড়া গাঁ।—রাখাল ছেলেটা বললো।

—আর—আর—তুই?

—আমি কানাই। এই গাঁয়েই বাড়ি।

এবার বোষ্টমটিকে জিগ্যেস করলো গোবিন্দ: তু—তুমি?

—আমি?—হাসলো বোষ্টম: আমি সেই বিন্দাবন দাস গো! বেন্দা বোষ্টম!

কৌতূহলী রাখাল ছেলেটা এবার জিগ্যেস করলো, কিন্তু তুমি, তুমি কে বাবু?

শুনে গোবিন্দর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো: আমি? আমি? কেউ না। কিচ্ছু না···

চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো গোবিন্দর। দুফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

বেন্দা তাড়াতাড়ি অন্য কথায় এলো: হাঁটতে পারবে?

গোবিন্দ বললো, বোধহয়।

—আমার সঙ্গে যাবে?

ঘাড় নাড়লো: হুঁ।

বেন্দা বোষ্টম ঘাড় ঘুরিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে কানাইকে বললো, তোর একটা মোষ নিয়ে আয় তো। দেখি যদি মোষের পিঠে চাপিয়ে একে

নিয়ে যেতে-পারি। এই বড়ো মাঠটা পার হয়েই তোর মোষ ফেরত পাঠিয়ে দেবো।

—আচ্ছা।—বলেই কানাই ছুটে গেলো মাঠে-চরা একটা মোষের কাছে। একটু পরেই সে মোষটার পিঠে চড়ে চলে এলো। মোষের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বললো, হ্যাঁগো বাবু, পারবে উঠতে? আচ্ছা, দাঁড়াও, মোষটাকে বসিয়ে দিই—

কানাই মোষটাকে বসিয়ে দিলো।

পরে কানাই আর বেন্দা বোষ্টম কোনোরকমে ধরাধরি করে মোষের পিঠে গোবিন্দকে বসিয়ে দিলো, তার দুটো পা একদিকে ঝুলিয়ে। বেন্দা বোষ্টম গোবিন্দকে ধরে থাকলো। কানাই দিলো মোষকে গুঁতো : হি-হি-হেই ওঠ।

মোষটা উঠে দাঁড়ালো।

বেন্দা বোষ্টম গোবিন্দকে তেমনিভাবেই ধরে রেখে, আর এক হাতে কানাইয়ের মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে হেসে বললো, যাবি নাকি খানিকটা?

কানাই ঘাড় নেড়ে বললো, চলো।

কানাইয়ের হঠাৎ নজর পড়লো, বেন্দা বোষ্টমের একতারাটা আর ঝুলিটা মাটিতে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেদুটো হাতে তুলে নিয়ে হেসে বললো, আর একটু হলে ফেলে যাচ্ছিলে তোমার জিনিস বাবাজী।

বেন্দা বোষ্টম হাসলো।

কানাই গোবিন্দকে ঠেলে ধরে মোষের পাশে পাশে চললো খানিকদূর।

৫০

বিন্দু শেষপর্যন্ত ঠিকই করলো, সে কলকাতাতেই যাবে।

আর লোহারামও একটু ভালোর দিকেই। বিছানায় উঠে বসেছেন। অতএব ভয়ের কারণ আর নেই। কবিরাজমশাইও তাই-ই বলেছেন।

ইন্দুও আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে।

কাজেই এই হচ্ছে বেরিয়ে পড়ার ঠিক-সময়।

বিন্দু তার মনকে শক্ত করলো : পারবে সে যেতে, পারবে সে তার স্বামীকে খুঁজে বার করতে, পারবে সে তাকে আবার সৎপথে আনতে। কেন পারবে না?

সতী বেহুলা পারেননি? সতী সাবিত্রী পারেননি? তাঁরা তো যমের

মুখ থেকে তাঁদের স্বামীদের ফিরিয়ে এনেছেন। আর সে যদি সতী হয়, সত্যিই সতী হয়, তবে পারবে না স্বামীকে তার অসৎ সঙ্গ থেকে ফিরিয়ে আনতে ? পারবে। হ্যাঁ পারবে।

তাছাড়া সে নন্দ বোষ্টমের কাছ থেকে তার একতারাটা আদায় করে নিয়েছে। নন্দ বোষ্টমের মতো একটা গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লাও সেলাই করেছে। যোগাড় করেছে তিলক আর তুলসীর মালা। একদিন দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে নন্দ বোষ্টমের মতো সেজে দেখে নিয়েছে নিজেকে একখানা আর্শিতে। না, মেয়ে বলে ধরাই যায় না তাকে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কী বলে কী ছুতো করে সে এবাড়ি থেকে বেরুবে ? কাউকে না বলে বেরিয়ে যাওয়া তো চলে না। তাতে বাবা মা-বোন সবাই ভাববে। গাঁয়ে কলংক রটবে। গাঁয়ের মানুষগুলোর মুখ তো হাঁ হয়েই আছে। একটা কিছু ছলছুতো পেলেই হয়।

শেষে হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো, আচ্ছা, এখান থেকে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গেলেই তো হয়, এখানকারই কাউকে সঙ্গে নিয়ে ? হ্যাঁ, গাঁয়ের লোকে জানবে বিন্দু শ্বশুরবাড়ি গেলো। তারপর কোথায় গেলো কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

আর শ্বশুরবাড়ি ? হুঃ! সেখানে তাকে মাথায় করে নিয়ে নাচতে কারোর বয়ে গেছে; বিদায় করতে পারলেই বাঁচবে সব। আর তাকে চিনতে পারবে কি না তারই বা ঠিক কি ?

অনেক ভেবে চিন্তে একদিন বিন্দু শেষপর্যন্ত মাকে গিয়ে ধরলো : মা, মনটা বড়োই খারাপ হয়েছে কদিন ধরে। কেবলই তোমার জামাইয়ের স্বপ্ন দেখছি। আর যতো সব অমঙ্গলের স্বপ্ন।—বলেই সেই সঙ্গে আসল কথাটাও পাড়লো : একবার ভাবছি, শ্বশুরবাড়িতে যাবো, খোঁজখবর পাবো সেখানে গেলে।

কথাটা শুনে বিরাজমণিও চিন্তিত হলেন। বললেন, তা তুই যাবি কেন কষ্ট করে ? তাছাড়া গেলেও তো তোকে তারা চিনবে না। হয়তো অপমান করবে। বরং তার চাইতে গোপীচরণকে পাঠাই—

—না মা—বিন্দু জেদ ধরলো : আমিই একবার ঘুরে আসি মা। অপমান যদি করে করবে। করবে তাদের বৌকে। সে অপমান তোমাদের বা আমার গায়ে লাগবে না, লাগবে তাদের বংশে।

তবু বিরাজমণি বললেন, সে তো বুঝি। তবে—

—আর আপত্তি করো না মা।—বিন্দু বললো, শুনেচি তোমাদের জামাই নাকি কলকাতায় থাকে। যদি ওখানে লোক পাই তো সেখানেই যাবার ইচ্ছে—

—সে কি রে? কলকাতায়? বিদেশ-বিভূঁই···।—বিরাজমণি আঁতকে উঠলেন।

বিন্দু তাড়াতাড়ি মাকে বোঝালো: না, না। তুমি ভেবো না। ভালো লোক যদি পাই তবেই সেখানে যাবো—

বিরাজমণি ভাবতে লাগলেন।

বিন্দু মা'র অবস্থা বুঝে বানানো দুঃস্বপ্নের কথা আরো একটু ফেনিয়ে তাঁর দুই কানে ভালো করে ভরে দিয়ে বললো, আমি যেতাম না মা। কিন্তু মন আমার বড্ড উতলা হয়েচে। আমার কিছু ভালো লাগচে না আর—

হুঁ, মেয়ের যে কিছু ভালো লাগছে না, কেমন যেন অস্থির, একটু যেন আনমনা সেটা বিরাজমণিও লক্ষ্য করেছেন। তবে স্বামীর অসুখ, বড়োমেয়ের আঁতুড় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিন্দুকে ডেকে কিছু জিগ্যেস করবার সময় পাননি, খেয়ালও হয়নি তাঁর।

অগত্যা বললেন বিরাজমণি: তা তোর বাবাকেও তো খবরটা দেওয়া দরকার।

বিন্দু হাঁ-হাঁ করে উঠলো: না, না। বাবাকে এখন এসব নিয়ে জ্বালাতন করো না। এখনো ভালো করে সেরে উঠেনি। শেষে—

কথাটা ঠিকই।

কাজেই বিরাজমণি একটু ভেবে বললেন, তা কার সঙ্গে কীভাবে যাবি তুই ভাবচিস?

বিন্দু বললো, ভাবচি হারানদাদা যদি তার গরুর গাড়িতে পেঁাছে দেয় শ্বশুরবাড়িতে তাতে ভালোই হবে। আর কোনো লোকের দরকার হবে না। তাছাড়া গাঁয়ের লোকেরাও জানবে বিন্দি শ্বশুরবাড়িতেই গেলো। নইলে মুখপোড়া গাঁয়ের লোকদের তো আর মুখের বাঁধন নেই।

বিরাজমণি বললেন, হ্যাঁ, সেটা মন্দ নয়। আর সেই সঙ্গে গোপীচরণও যাক না?

—না, দরকার কি?—বিন্দু বললো, বরং তার এখন বাড়ি থাকা দরকার এ সময়ে। বাবার কখন কি দরকার হয়। আর হারানদাদা যদি যায় তবে আর ভাবনা কি?

সুতরাং তাই ঠিক হলো।

বিন্দু তার বাবার কাছেই কদিন সময়টা কাটালো বেশি, কিন্তু কিছুই বললো না তাকে। সুযোগ-সুবিধে বুঝে পাড়া বেড়িয়ে মেয়েদেরও জানান দিলো, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে সে। কেউ প্রথমে বিশ্বাস করলো না, কেউ ঠাট্টা করলো, কেউ হিংসা করলো মনে-মনে।

শেষে একদিন মাকে প্রণাম করে, দিদিকে গলা জড়িয়ে আদর করে, নতুন বোনপোটির নরম দুটো গাল টিপে দিয়ে বিন্দু সজল চোখেই উঠলো গিয়ে হারান মণ্ডলের গরুর গাড়িতে।

গরুর গাড়ি গাঁয়ের পথ দিয়ে চলতে লাগলো। গরু দুটোর গলার ঘণ্টা বাজতে লাগলো টুং টাং টুং টাং। যেন জানাতে লাগলো সবাইকে : ওগো শোনো, লোহারাম বাড়ুজ্জের মেয়ে বিন্দি চলেছে শ্বশুরবাড়িতে।

বিন্দু যা ভেবেছিলো, তাই হলো।

সন্ধ্যে নাগাদ শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠোনে পা দিতেই তার শাশুড়ী আর বিধবা এক ননদ খেঁকিয়ে এলো : তুমি কে গো বাপু, এই ভরসন্ধেয় এসে দাঁড়ালে ?

বিন্দুর একগলা ঘোমটা। হাতে একটা বড়ো বোঁচকা। ঘোমটার ভেতর থেকেই ধীর এবং শান্ত গলায় বললো, আমি এ বাড়ির বৌ।

—বৌ।—দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন শাশুড়ী : ওরে আমার বৌ রে। তুমি কার বৌ ?

—এবাড়ির ছেলের।

—এবাড়ির ছেলে!—এবার দাঁত খিঁচোলো বিধবা ননদ : সে তো কলকেতায় থাকে।

বিন্দু তেমনি শান্ত গলায় ঘোমটার ভেতর থেকে বললো, আগে এখেনেই থাকতেন তিনি। বিয়ে করেছিলেন বল্লভপুরের লোহারাম বাড়ুজ্জের ছোটমেয়ে বিন্দুবাসিনীকে। দরকার হলে কুলীন কন্যেদের কুল-রক্ষের খাতা খুলে দেখতে পারেন।

—তোমার হুকুমে ?—তেড়ে উঠলেন শাশুড়ী।

—আর তুমি যে বাপু, ঐ বল্লভপুর না কি বললে, সেখানকার লোহারাম, না সোনারাম বাড়ুজ্জের মেয়ে তাই বা বুঝবো কেমন করে ?—বললো ননদ।

বিন্দু এবার ঘোমটাটা একটু উঠিয়ে বললো, সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের হারান মণ্ডল এয়েচে, তাকে জিগ্যেস করলেই জানা যাবে।

—আমাদের বয়ে গেচে।—ঝংকার দিয়ে উঠলেন শাশুড়ী।

ননদ সোজাসুজি বলেই দিলো: তুমি বাপু এখন যাও, যেখানকার মানুষ সেখানেই চলে যাও মানে-মানে।

বিন্দুও এখানে থাকতে আসেনি। সে-ও যাবার জন্যেই এসেছে এখানে। তবে হারান মণ্ডল চলে গেলে তবে। যাতে সে জানতে পারে, বিন্দি শ্বশুর-বাড়িতেই থেকে গেলো। আর তাকে বাইরে দাঁড় করিয়েই রেখেছে যাতে বাড়ির মধ্যের এই 'স্বাগতম বার্তা' তার কানে গিয়ে না পোঁছোয়।

বিন্দু এবার পোঁটলাটা মাটিতে নামিয়ে মাথা নীচু করে বললো, বেশ তো, যদি আপনারা বাড়ির বৌকে বাড়িছাড়া করতে চান তবে যেতেই হবে আমাকে। তবে আজকের রাতটা আমাকে থাকতে দিন। মেয়েমানুষ, এখন যাবো কোথায়? তবে আমি কথা দিচ্ছি, কাল ভোরেই আমি চলে যাবো।

শুনে মা মেয়ে দুজনেই আশ্বস্ত হলেন।

মা উঠোনের কোণে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, তবে উঠোনের কোণের ঐ ঘরে রাতটুকু থাকোগে বাপু।

মেয়ে বললো, আর ভোরে উঠে যাবার সময় বলে যেয়ো যেন। বিশ্বাস কি, যাবার সময় কিছু সরিয়ে নিয়ে গেলেই হলো।

বিন্দু হেসে বললো, আচ্ছা, বলেই যাবো।

শাশুড়ী বললেন, তা রাত্তিরে খাওয়ার কি করবে বাছা?

—সেজন্যে ভাববেন না মা।—বিন্দু যেন গদগদ হয়ে উঠলো: রাত্তিরটুকু থাকতে দিলেন, এই আমার ভাগ্যি। আমার সঙ্গে চিঁড়ে গুড় আছে, তাই দুটো দাঁতে কেটে রাতটা কাটিয়ে দেবো'খন।

—দ্যাখো, যা হয় করো!—মা-মেয়ে আর থাকলেন না সামনে। পাছে আবার কোনো ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়ে।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো বিন্দুও।

তার থাকবার ঘরের দাওয়ায় বোচকাটা রেখেই ছুটলো সে বাড়ির বাইরে। গিয়ে দেখে হারান মণ্ডল গরু দুটো খুলে দিয়ে গাড়িতে বসে গামছাটা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে।

বিন্দু এসে বললো, হারানদাদা, শাশুড়ীর দেখলাম খুব জ্বর। তাকে

নিয়ে বাড়ির সবাই ব্যস্ত। তা কে তোমার দেখাশোনা করবে আর কাকেই বা বলি, তাই ভাবচি—

হারান মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললো, সেজন্যে ভাবচো কেনে বিন্দে-দিদি? একটু পরেই তো চান্ উঠবে। দিব্যি বল্লভপুর চলে যেতে পারবনি ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায়। তুমি কিছু ভেবোনি।

—একটু খেয়েদেয়ে···। —বিন্দু লজ্জিতই হলো।

—আরে সেজন্যে ভাবনা কেনে? সকালে মাঠাকরুণ সঙ্গে যে গুড় মুড়ি দ্যাছলেন তাই এখনো আছে। তাই চাট্টি খেতে-খেতে চলে যাবো'খনে।

বিন্দু আর কথা বাড়ালো না।

হারান মণ্ডল গাড়িতে গরু দুটো জুতে নিয়ে বললো, তবে চলি বিন্দেদিদি।

হারান লাফিয়ে উঠে বসলো তার গাড়িতে।

পরদিন খুব ভোরেই উঠোনে দাঁড়িয়ে বিন্দু ডাক দিলো: জয় রাধে গোবিন্দ বলো। মাঠাকরুণ উঠেচেন নাকি?

বিধবা মা মেয়ে দুজনে এক ঘরেই শুয়েছিলেন, বাইরে ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন। এসে দেখেন উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বোষ্টম। চুড়ো করে চুল বাঁধা, নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, কাঁধে ঝুলি, হাতে একতারা আর মুখে মিষ্টি হাসি। বয়েসও বেশি নয়।

বিন্দু বললো হেসে, আমি যাচ্ছি এখন। যাবার সময় খবর দেবার কথা ছিলো তাই—

শাশুড়ী অবাক হয়ে বললেন, বুঝলাম না কথাটা!

—আজ্ঞে, আমি আপনাদের কাল রাতের বৌ!—বিন্দু হাসলো।

শুনে মুখিয়ে উঠলো ননদ: বৌ না বহুরূপী! কাল বৌ, আজ বোষ্টম!

বিন্দু আবার হাসলো: তা যা বলো। তবে বহুরূপী না বলে বউ-রূপী বলতে পারো। থাকতে যখন দিলে না, বউ তোমাদের এই রূপেই ধরলো।— পরে কাঁধের ঝুলিটা ফাঁক করে দেখিয়ে বললো, দেখবে নাকি এটা হাতড়ে একবার?

—মর্ মাগী! ভোর রাতে ঢং দেখাতে এলেন।—ঝটকা মেরে ঘরে ঢুকে গেলো ননদ।

সেই সঙ্গে মুখঝামটা দিয়ে শাশুড়ীও।

বিন্দু আর একবার হেসে বললো, জয় রাধে গোবিন্দ বলো!

বিন্দু তার বোষ্টমের সাজ ভালোভাবেই করেছিলো। সিঁথির সিঁদুর তুলে

ফেলতে সাহস হয়নি। চুল ঘুরিয়ে বেঁধে ঢাকা দিলো তাই সিঁদুরের দাগ। হাতের নোয়া আর শাঁখা হাতেই রইলো, তবে উঁচুতে আটকে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা, আর ঢাকা রইলো আলখাল্লার ঢোলাহাতার তলায়। সুগোল স্তনযুগলও চাপা পড়লো কাপড়ের শক্ত ফেটির পেষণে। ঝুলি থেকে ছোট্ট আর্শি বার করে দেখলো নিজেকে : হ্যাঁ, বোষ্টমই বটে। কিন্তু তবু ভয় গেলো না মন থেকে।

তাই বিন্দু আর দেরি করলো না। ভোরের আলো-অন্ধকারের পথে পা বাড়ালো সে। তখনও নীল আকাশে আঁকা রয়েছে ফ্যাকাশে চাঁদ।

বিন্দু পথে কোথাও দাঁড়ালো না। বেশ জোরেই হাঁটতে লাগলো সে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখতে লাগলো। ভয়-ভাবনা সংকোচ যেন তার পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। সে জড়তা ছিঁড়েও ছিঁড়ছে না। তবে ছিঁড়বে, ছিঁড়তেই হবে।

শ্বশুরবাড়ির গাঁ পার হয়ে মাঠ পার হয়ে ভূতখালির বিল পার হয়ে বিন্দু চললো, যতোটা চলা যায়, যতোটা এগোনো যায় ত্রিবেণীর ঘাটের পথে।

ত্রিবেণীর ঘাটে যাওয়ার পথের দিকটা সে কাল কথায়-কথায় হারান মণ্ডলের কাছে জেনে নিয়েছিলো তাই রক্ষে। তাই দিকভ্রষ্ট হলো না সে।

তবে আরো খানিক পথ গিয়েই থামতে হলো তাকে।

থামতে হলো দেওড়া গাঁয়ে। এক রাখাল ছেলের ডাকে।

রাখাল ছেলে কানাই তাকে নিয়ে এলো পুরুষ্বহীন আধ-অজ্ঞান মাঠে পড়ে-থাকা গোবিন্দ মিত্রের কাছে।

সব ব্যাপার দেখে আর শুনে বিন্দুর মনে হলো, এই লোকটাকেই যেন তার দরকার ছিলো।

ভগবান তাই বুঝি লোকটাকে ফেলে রেখেছেন তারই জন্যে, তারই আসার অপেক্ষায়।

বিন্দু ভাবলো, সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছে।

৫১

সতীনাথ নিজের গাঁ গৌরহাটিতে বাপ-পিতামহর ভিটে পরিষ্কার করিয়ে ঘর-দরজা মেরামত করিয়ে বসলো বটে, তবে কেন যেন মন তার বসলো না।

একটা সিংহ খাঁচায় বন্ধ হলে তার যা অবস্থা হয়, সতীনাথের অবস্থা হলো

অনেকটা সেইরকমই। ছোট্ট গ্রামখানিতে তার করবার মতো যেন কিছুই নেই, শুধু ফাঁকা মন নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

গাঁয়ের লোকগুলোরও যেন প্রাণ নেই। আর থাকলেও সেই প্রাণটুকু দেহের মধ্যে আটকে রাখবার জন্যেই যেটুকু হাত পা নাড়া। তার বেশি নয়।

মা মারা যাবার পর সতীনাথ সেই এসেছিলো মেসোমশায় শ্রীধর চাটুজ্জের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্যে, এবার এলো সে একলাই।

গাঁয়ের একজনকে বাড়িটা দেখাশোনা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীধর চাটুজ্জে। সেই লোকটাই ছিলো এতোদিন। পাহারা দিতো বাড়িটা। সত্যি কথায় সপরিবারে ভোগদখল করছিলো বাড়িটা। আর মনে-মনে ভাবতোও হয়তো, ছোকরা আর আসবে না মনে হয়।

কিন্তু সতীনাথ একদিন সত্যিই উপস্থিত হলো গৌরহাটিতে। লোকটা সতীনাথকে দেখে বিস্মিত হলো যেমন, বিষন্নও হলো। তবু মুখে তাকে সাদর স্বাগত জানালো। হয়তো মনকে প্রবোধও দিলো, কর্তা কুড়োরাম মুখুজ্জের ছেলে এটি, তার নিজের ভিটেতে থাকতে এসেছে, একে হাসিমুখে ঘরে তুলে নেওয়াই উচিত।

তাছাড়া বংশীবদন দেখলো, না, সতীনাথ ছেলেটা নেহাত খারাপ নয়। বরং এসেই বললো, বংশীদাদা, তুমি আছো, তাই আমাদের বাড়িঘরদোরগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে মাটিতে। আমি এই এলাম, কদিন আছি তাও জানিনে, আর একলা মানুষ. একখানা ঘরই আমার যথেষ্ট, কাজেই তুমি তোমার বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে যেমন আছো তেমনিই এখানে থাকো।

সতীনাথের এমন মিষ্টি কথায় বংশীবদন নিশ্চিন্তই হলো। প্রৌঢ় দুহাত তুলে সতীনাথকে আশীর্বাদ করে বললো, বাবাজী, তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে একটু ঠাঁই পেয়েচি এখেনে, তুমিও থাকতে দিলে, এতে তোমার মঙ্গলই হবে।

শুনে সতীনাথ হাসলো।

গ্রামের আরো অনেকের সঙ্গেও পরে দেখাসাক্ষাৎ হলো সতীনাথের। তারা প্রায় সকলেই সতীনাথকে সাদর আহবান জানানো দূরে থাক, কেবল জেরা করে-করে খবর বার করবার চেষ্টা করলো, সে কলকাতায় কেন গেছলো, কোথায় ছিলো, কেনই বা চলে এলো। সতীনাথ কলকাতা থেকে চলে আসার সঠিক কারণটা, মানে কিটি মেমসাহেবের প্রেমালিঙ্গনের ঘটনাটা বাদ দিয়ে আর সবই বললো খুলে এবং তাতে গাঁয়ের লোকেরা ধরে নিলো সতীনাথ

যেখানে-সেখানে থেকেছে, ম্লেচ্ছের সঙ্গে মিশেছে, আর নিশ্চয়ই অখাদ্য-কুখাদ্যও খেয়েছে। অর্থাৎ শহরে গিয়ে সে ব্রাহ্মণত্ব খুইয়ে এসেছে। তবে সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় সতীনাথের মুখের উপরে কিছু তারা বললো না। আর সতীনাথের ভাগ্য ভালো, তার বিরুদ্ধে তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থাও করলো না তারা। তবে দেখা গেলো, সতীনাথকে তারা এড়িয়ে এড়িয়েই চললো।

তা চলুক। সতীনাথের তাতে কিছু আসে যায় না।

তবে বড়োই একলা-একলা মনে হতে লাগলো সতীনাথের। একটু প্রাণ খুলে কথা বলবার মতো একটা লোক নেই গাঁয়ে। একটু কোথাও বসে গল্প-গুজব করবার মতো পর্যন্ত একটা জায়গা নেই।

নাঃ, ভালো লাগে না।

হ্যাঁ, এসেছিলেন গাঁয়ের গোপীকৃষ্ণ চাটুজ্জে। এসেছিলেন একটা মতলব নিয়ে। তাও গোপনেই এসেছিলেন একদিন সন্ধ্যায়, যাতে লোকে তাঁকে দেখতে না পায়।

এসে অনেকরকম ভণিতা করলেন। সতীনাথের স্বর্গত পিতা কুড়োরাম মুখুজ্জের সঙ্গে তাঁর কী ভীষণ ঘনিষ্ঠতা ছিলো, তা প্রায় প্রতি কথায় বলতে ভুললেন না। তিনি নাকি তাঁকে ছোটভাইয়ের মতোই দেখতেন। বিপদে-আপদে ছুটে যেতেন, তাঁর গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দিতেন না। আর কুড়োরামদাদা যতোদিন ছিলেন, তিনি ছিলেন পর্বতের আড়ালে। এখন তিনি একেবারে অসহায়। আর গাঁয়েও তো আর মানুষ নেই যে তার কাছে একটু গিয়ে দাঁড়াবেন। ইত্যাদি—

তারপর আসল কথাটা পাড়লেন: দ্যাখো বাবা সতীনাথ, তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ। তোমার মতো সুপাত্র এতোদিন অবিবাহিত থাকলে কুলীন কন্যাদের কুলরক্ষা করা দায় হবে যে!

সতীনাথ হেসে বললো, দেখুন, একজন কুলীন ব্রাহ্মণ যদি কুলরক্ষের ব্যাপারে মাথা না ঘামায়, তাতে কুলীন কন্যারা অকুলে পড়বে না। আমি ভবঘুরে মানুষ, কখন কোথায় আছি তার ঠিক নেই—কাজেই—

—কাজেই তো বাবাজী একটা বে-থা করে সংসারী হওয়া দরকার।—গোপীকৃষ্ণ চাটুজ্জে সতীনাথের শেষ কথাটা লুফে নিয়েই বললেন হেসে: তাছাড়া, এসময় মনটা একটু উড়ুউড়ুই হয়। এটা বয়েসের ধর্ম।

বলেই সতীনাথকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলতে লাগলেন, আমি বলছিলাম কি বাবাজী, আমার মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালোই, বিবাহের

বয়েসও হয়েচে, সংসারের কাজকর্ম সব জানে, সংসার ঘাড়ে নিতেও পারবে, অতএব তুমি যদি মত করো বাবা—

—আজ্ঞে, ক্ষমা করবেন।—সতীনাথ বললো, আমি এখনও এ বিষয়ে কোনো মনস্থির করিনি। তাছাড়া আমি আবার কলকাতায় যাবো ভাবচি।

শুনে গোপীকৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন: বুঝলাম বাবাজী, শহরের মোহে পড়েচো। সেখানকার রংচং তামাশা দেখে গাঁয়ে আর মন বসতে চাইচে না। তা বেশ, তা বেশ—

গোপীকৃষ্ণ চলে গেলেন হতাশ হয়েই।

সতীনাথও আর কথা বাড়ালো না।

তবে মনে-মনে ভাবলো সতীনাথ: আর এ গৌরহাটিতে থাকা নয়। এখানে থাকলে ঘরসংসারের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর বেরুনো যাবে না। তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। কলকাতায় রংচং তামাশা সে দেখেছে বটে, তবে সেই নতুন শহরে যে উৎসাহ উদ্দীপনা অগ্রগতি সে দেখে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে বড়ো কিছু করতে হলে সেখানেই যেতে হবে। অবশ্য আজ হোক, কাল হোক, যেদিন হোক।

দেশের কুসংস্কার অশিক্ষা কৌলীন্যপ্রথা সতীদাহ ইত্যাদি দূর করতে হলে দেশে থাকলে কিছুই হবে না। আর ফুলপুরেও তো দেখলো সে। একটা ভালো কাজ করতে গেলে কতো বাধা! কতোরকম কথা! কাজেই দেশের কুসংস্কার হটাতে হলে বাইরে থেকেই কুড়ুল চালাতে হবে, ভেতর থেকে হাত চালানোই যাবে না। না, যেতে হবে কলকাতায়, ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এই সব কুসংস্কারগুলোর দিকে। এই সব বন্ধ করবার জন্যে আইন যাতে হয় সেজন্যে ইংরেজের শরণাপন্ন হতে হবে। স্বাধীন ইংরেজ, সংস্কারমুক্ত ইংরেজই ভরসা।

সতীনাথ কলকাতায় থাকতে শুনেও এসেছে রামমোহন রায় নামে এক ভদ্রলোক তাঁর দেশ থেকে কলকাতায় এসে এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। সে কাগজেও পড়েছে এসব খবর। দরকার হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার, তাঁর দলে ভিড়ে তাঁকে সাহায্য করা দরকার। শ্রীরামপুরে মিশনারী সাহেবরাও এদেশের মঙ্গলের কথা ভাবছেন। তাঁদের দিয়েও অনেক উপকার হতে পারে।

আসল কথা, ইংরেজী যখন একটু-আধটু শেখা গেছে, তখন ঐ বিদ্যাটাকে

কাজে লাগানোই দরকার। দেশে শিক্ষাবিস্তারেরও বিশেষ দরকার। তবেই চোখ ফুটবে, মানুষ বুঝতে শিখবে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

সতীনাথ ভাবলো, না, গাঁয়ে বসে থাকলে এসব কিছুই হবে না। বিয়ে-থা করে বংশবৃদ্ধি করাই সার হবে।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আচ্ছা, আপাতত ত্রিবেণী গেলে কেমন হয়? জায়গাটায় বহু লোকের বাস। নানা গ্রাম থেকে বহু লোক ওখানে এসে থাকে। কেউ তীর্থ করতে, কেউ ব্যবসা করতে। আবার কেউ আসে গঙ্গাযাত্রায়। আসে কতো নতুন নতুন লোক। আসে কলকাতা থেকে, যায় কলকাতায়। অন্তত ওখানে থাকলে কলকাতার খবরাখবরও পাওয়া যাবে, খানিকটা যোগাযোগ রাখা যাবে। মানে, কলকাতার দিকে খানিকটা পা বাড়িয়ে রাখা হবে। তাছাড়া নানা লোকের নানা রকম হাবভাব চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। দেশের কাজ করতে গেলে দশের কাজ করতে গেলে দেশের লোকের হাবভাবও জানা দরকার বৈকি।

সতীনাথ তাই-ই ঠিক করলো।

ত্রিবেণীই যাবে সে। সেখানে যা হোক একটা কাজকর্মও জুটিয়ে নিতে পারবে। খাতা লেখা বা ইংরেজী দরখাস্ত লেখার কাজ করেও তো কিছু উপায় করা যেতে পারে।

কিছুদিন পরেই সতীনাথ একদিন বংশীবদনকে ডেকে বললো, বংশীদাদা, আমাকে তো আবার যেতে হচ্ছে।

—কোথায়?—বংশীবদন অবাক হলো।

—আপাতত ত্রিবেণী। সেখান থেকে কলকাতাতেও যেতে পারি।

—সে কি?—বংশীবদন মনে-মনে খুশি হলেও তার সারা মুখে বিষাদ আর বিচ্ছেদ-বেদনার তুলি বুলিয়ে বললো, এই তো সেদিন এলে, এর মধ্যেই যাবে কি গো?

—হ্যাঁ বংশীদাদা।—সতীনাথ বললো, যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। বিশেষ কাজ। তুমি যেমন ছিলে তেমনিই এখানে থাকো। বাপ-পিতাম'র ভিটের যেন পিদিম দেওয়া হয়, এইটুকুই আমার ইচ্ছে।

—সে তোমার বলতে হবে না।—বংশীবদন তাড়াতাড়ি বললো, আমি থাকতে তোমাদের সে সব ভাবতে হবে না। তবে কিনা—তুমি, মানে তুমি চলে যাচ্ছো, সেটা তো ঠিক ভালো হচ্ছে না।

সতীনাথ শুধু বললো, উপায় নেই বংশীদাদা।

তবে ছুট বললেই তো ছুট দেওয়া যায় না। সতীনাথ যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলো।

৫২

মাঠটার খানিক দূরে গিয়ে বেন্দা বোষ্টম-বেশিনী বিন্দুবাসিনী কানাইকে ডেকে বললো, কানাই, আর তোকে কষ্ট দেবো না রে। এবার তুই আমার একতারাটা দিয়ে ফিরে যা। আমি মাঠ পার হয়েই তোর মোষ পাঠিয়ে দিচ্চি।

কানাই জিগ্যেস করলো, তুমি পারবে তো ঠিক বাবাজী?

—হ্যাঁ রে পারবো।—বিন্দু হাসলো।

—তবে চলি।—কানাই একতারাটা বিন্দুর হাতে গছিয়ে দিয়ে তার নিজের গাঁয়ের দিকে হাঁটা দিলো।

বিন্দু যেন নিশ্চিন্তই হলো। যতো তাড়াতাড়ি ঐ কানাই আর তার গাঁয়ের লোকদের খোঁজখবরের বাইরে চলে যেতে পারে ততোই ভালো। নইলে নানা জেরা আর জিজ্ঞাসা—

বিন্দু চলতে চলতে জিগ্যেস করলো গোবিন্দকে: কোনো কষ্ট হচ্চে না তো?

কষ্ট হলেও গোবিন্দ বললো, না।

—আর এই মাঠটা পার হয়েই থামবো আমরা। কি বলো?—জিগ্যেস করলো বিন্দু।

—যা ইচ্ছে। নিজের যেন কোনো ইচ্ছেই নেই গোবিন্দর।

কিন্তু মাঠটা পার হয়েই থামা হলো না। কারণ বিন্দু মোষটাকে থামিয়েও একলা গোবিন্দকে তার পিঠ থেকে নামাতে সাহস করলো না। কানাই সঙ্গে থাকলেও না হয় কথা ছিলো। না, দরকার নেই। তাছাড়া কোথাও দুচারদিন লোকটার বিশ্রাম করাও দরকার।

—চলো, গাঁয়ের মধ্যেই চলো।—বিন্দু চিন্তিত হয়েই বললো।

গোবিন্দও ভাবিত হলো: গাঁয়ে?

—উপায় কি?

—কি বলবে?

—সে তখন যা হয় ভেবে বলবো।

বিন্দু গাঁয়ের প্রথম যে গৃহস্থের বাড়িটা পেলো, তার সামনেই দাঁড় করালো মোষ।

সেটা একটা জোলারবাড়ি। তাঁতী তার বাইরের চালাঘরে তাঁত বুনছিলো, এমন সময় মোষে-চড়া একটা লোক আর এক সুদর্শন বোষ্টমকে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে সে বেশ অবাকই হলো। তাঁত চালানো বন্ধ হয়ে গেলো তার।

বিন্দু তার মুখ-চোখে ভাবনার ভাব দেখিয়ে লোকটাকে বললো, জয় রাধে! কত্তা, বড়ো বিপদে পড়েচি।

শুনে মধুতাঁতী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে। আর বাইরে এসে দাঁড়ালো তার কয়েকটা ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে।

—কী হয়েচে বাবাজী?—মধু জিগ্যেস করলো।

বিন্দু বললো, আর বলো না কত্তা। আমি বোষ্টম মানুষ। খেয়ালমতো নেচে গেয়ে বেড়াই, কিন্তু রাধারানী আমার পায়েও বেড়ি দিতে চান।

—কেন, কী হলো?

—এই দ্যাখো না, বেরিয়েছিলাম ভিক্ষেয়। দেখি এক ঝোপের ধারে এই লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

—কেন? কেন?

—বলো না গো মশায় কেন?—বলেই বিন্দু নিজেই বললো, বোধহয় ভিরমি খাওয়ার রোগ আছে!

গোবিন্দ শুনে হাঁফ ছাড়লো।

কিন্তু মধুতাঁতীর হঠাৎ নজর পড়লো, গোবিন্দর ফেরতাদেওয়া কাপড়ে একটু একটু রক্তের দাগ। তাড়াতাড়ি দেখিয়ে বললো, কিন্তু কাপড়ে যে রক্তের দাগ!

—হা আমার পোড়াকপাল!—বিন্দু নিজের কপাল চাপড়ে বললো, কানা মেয়ের নানা রোগ কিনা! অশ্শো।

মধুতাঁতীর প্রশ্নে গোবিন্দর বুকখানা ধড়াস করে উঠেই বিন্দুর সাফাই শুনে মনে হলো একখানা ভারি পাথর যেন তার বুক থেকে সরে গেলো। গোবিন্দও তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে মুখবিকৃতি করে বললো, অর্শ।

বিন্দু এবার মৃদু হেসে বললো, কত্তা আমার জন্যে ধর্লাচনে, তবে এই বাবুটিকে যদি দুচারদিনের জন্যে তোমার বাড়িতে একটু আশ্রয় দাও তবে একটু ভালো হয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে যেতে পারে।

মধু একটু ভেবে বললো, তা আমার কোনো আপত্তি নেই। অতিথি, তার মানুষ। তবে কিনা আমার এই ভাঙা বাড়িতে—

শুনেই বিন্দু মধুর মুখে যেন থাবা মেরে থামিয়ে দিয়ে বললো, রাধে বলো। তুমিও যেমন কত্তা। ভিক্ষের চাল আবার কাঁড়া না আঁকাড়া? একটু আশ্রয় দিচ্চো, এই না কতো!

মধুতাঁতী একেই অল্পবয়েসের সুন্দর চেহারার বোষ্টমটিকে দেখে মুগ্ধই হয়েছিলো, তার উপর তার মিষ্টি গলার মিষ্টি কথা শুনে যেন গলে গেলো সে। বললো, তবে বাবুটিকে নামানো যাক।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের দুচারজন লোকও সেখানে জড়ো হয়ে গেছে।

মধু তাদেরই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে খুব সাবধানে মোষটাকে বসিয়ে তার পিঠ থেকে গোবিন্দকে নামিয়ে সযত্নে বয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো তার বাইরের ঘরখানায় মাদুরপাতা তক্তপোশের উপরে। মাথার তলায় তেল-চিটচিটে বালিশও গুঁজে দিলো একটা।

বিন্দু বললো, বাঁচালে কত্তা। বাবুটাকে এক রাখাল তার মোষে চাপিয়ে দিয়েছিলো তাই আনতে পারলাম। এখন আর আমার ভাবনা নেই। তবে মোষটাকে মাঠের ধারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসিগে, ওটা চলে যাক। রাখালটা নইলে খুঁজে বেড়াবে।

বিন্দু মোষটার গলার দড়ি ধরে মাঠের ধারে এসে ছেড়ে দিলো তাকে। তারপর ফিরে এলো সে মধুতাঁতীর বাড়িতে।

বিন্দু আসতেই মধুতাঁতী বললো, তুমিও বাবাজী আমার এখানেই কটা দিন থেকে যাও। ঐ বাবুর ঘরেই থেকো। রান্নার ব্যবস্থা করে দেবো, নিজেই দুটো ফুটিয়ে নিয়ো, বাবুটাকেও দিয়ো। আমরা আবার জেতে তাঁতী কিনা—

মধুতাঁতীর কথা শুনে বিন্দুর তো চক্ষুস্থির। খাওয়ার না হয় ব্যবস্থা হলো, কিন্তু শোওয়া? ঐ বাবুর ঘরে! এক পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘরে!—ভাবতে গিয়েই মনে মনে হেসে ফেললো বিন্দু: পুরুষ! ওর সে পাট তো নেই। তবে আর ভয়টা কি?...কিন্তু...বিন্দু ভাবলো, পুরুষমানুষ তো! গায়ে তো জোর আছে। যদি মাঝরাত্রে গলা টিপে ধরে!—ভেবেই আবার ধমক দিলো নিজেকে: ধ্যেৎ, লোকটার তো নড়বারই ক্ষমতা নেই। ওকে আবার ভয় কিসের?...আর পরে যা হয় দেখা যাবে। কথায় আছে, লোকে খেতে পেলে শুতে চায়। আর এই তাঁতী নিজের থেকেই যখন খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, তখন আপাতত তার ব্যবস্থাটাই মেনে নেওয়া ভালো।

বিন্দু বললো, কত্তা, তোমার দয়ার শরীল। তুমি যে ব্যবস্থা করবে, সেই আমাদের ভালো।—আর শেষে যোগ দিলো: জয় রাধে!

তা মধুতাঁতী ভালো ব্যবস্থাই করলো।

খাওয়া-দাওয়ার আলাদা সব ব্যবস্থা করে দিলো। বিন্দু নিজের হাতে সব রেঁধে গোবিন্দকে দিলো, নিজেও খেলো।

তাছাড়া মধুতাঁতী একসময় গাঁয়ের হরি কোবরেজকে ডেকে গোবিন্দর অর্শ রোগের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করলো।

কোবরেজকে দেখে তো মনে মনে আঁতকে উঠলো গোবিন্দ। বিন্দুও। তবু আপত্তি করতে পারলো না কেউই। মধুতাঁতী ভালোর জন্যেই কোবরেজকে আনিয়েছে, কাজেই আপত্তি করা ভালো দেখায় না। তাতে সন্দেহ করতেও পারে।

হরি কোবরেজ গোবিন্দকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার মলদ্বার পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, রোগটা অনেকদিনেরই বটে। সারতেও দেরি হবে। আর রক্তটা বন্ধ হয়ে গেছে, লক্ষণটা ভালোই। তবে পেটটা খোলসা রাখতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলেই আবার রক্তপাত হবে। তা, আমার যে ওষুধ আছে তা ধন্বন্তরী। নিয়মমতো খেলে এ রোগ সেরে যেতে বাধ্য।—আরো মাথা নাড়িয়ে বললেন, একটা পুলটিশ দেবো সেটা মলদ্বারে দিয়ে রাখতে হবে। তাতে যন্ত্রণাটা কমে যাবে।

পরীক্ষা করে কোবরেজ মশায় চলে গেলেন। যাবার সময় মধুতাঁতীকে বলে গেলেন, ওরে, তোর মাঠাকরুণের জন্যে একজোড়া কলকা-পাড় ভালো শাড়ি দিস তো। আর একসময় এসে ওষুধটা নিয়ে যাস।

—আচ্ছা কোবরেজ মশায়—মধুতাঁতী হাতজোড় করেই বললো।

বিন্দু সব দেখে শুনে মনেমনেই হাসলো: কোথায় অসুখ আর কোথায় চিকিৎসা। মধুকে বললো, জয় রাধে, তোমার ভালো হোক কত্তা।

আর ঘরে গোবিন্দ শুয়ে-শুয়ে ভাবলো, হায়রে, একেই বলে বুঝি পশ্চাতে লাগা। কিন্তু উপায় নেই। আসল রোগের কথা বলবারও যো নেই, এমনই অসুখ। কাজেই চোখকান বুজে সব সহ্য করতেই হবে। তাছাড়া এরা তো ভালো ভেবেই এসব করছে।

কিন্তু কী হবে তার অতো ভালোয়।—গোবিন্দ শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলো: যা হবার, সে তো হয়েই গেছে। এর চাইতে সর্বময় চৌধুরী যদি তার গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিতো তবে সেই যেন ছিলো ভালো।···কুলীন—

—কুলীনের অহংকার করেছিলাম, তারই ফল। ওঃ, কী ভীষণ শাস্তি! কী ভয়ানক প্রতিহিংসা! নিষ্ঠুর, পিশাচ!

এখন কী করা যায়? কোথায় যাওয়া যায়? মানিকপুরে নিজের গাঁয়ে? না, না। বরং আত্মহত্যা করা ভালো।…জলে ডুবে মরলে সব জ্বালা মেটে। উঃ, এখনো তেমনি জ্বালা! পা নাড়ানোই দায়!

আর ডুববোই বা কী করে? সাঁতার জানে যে সে। সাঁতার জানা থাকলে ডোবাই যাবে না। গলায় পাথর বেঁধে? কলসী বেঁধে? একপেট জল খেয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে?…না না, ভাবাও যায় না।

আচ্ছা, গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝুললে হয়তো হয়। কিন্তু এ অবস্থায় উঠবে কী করে? তাছাড়া সেও তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে জিব বার করে চোখ উলটে মরা। না না, ভাবতেও ভয় করে।

হঠাৎ মনে হলো গোবিন্দর, সাপে কামড়ালে বরং ভালো হতো। অবশ্য বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে হতো। তা হোক। যন্ত্রণা তো ভোগ করছেই। আরো না হয় একটু—

হ্যাঁ, সাপে কামড়ালেই ভালোই হতো! যদি এখন কোনো সাপ আসে।

না, বরং বিন্দু ঘরে এলো মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে।

—কেমন আছো গো বাবু?

—ভালো।

—একটু এবার ঘুমোবার চেষ্টা করো।—বলেই বিন্দু আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু ঘুমোতে বললেই কি ঘুম আসে? গোবিন্দ শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ একবার মনে হলো, কাটা জায়গাটায় আবার যন্ত্রণা করছে। টনটন করছে। আস্তে আস্তে ডানহাতখানা সে কাটা জায়গাটার কাছে নিয়ে গেলো। ন্যাকড়া জড়ানো। বোধহয় ঐ বদু সর্দারই বেঁধে দিয়ে গেছে। হারামজাদা! বাবুর হুকুমমতো কাজ করেছে! পেছন থেকে বাঘের মতো ছুটে এসে তার ঘাড়ে পড়লো। না, পারা গেলো না তার সঙ্গে। লাঠি মেরে চিত করে ফেলে বুকের উপর ঘুরে বসে ছোরাখানা দিয়ে…

তারপর আর জানে না সে। মাথাটা ঘুরে গেছলো। অজ্ঞান হয়ে গেছলো সে। বদু সর্দার ছোরাখানা তার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিলো না কেন?

দয়া করে বুকে বসিয়ে দিলো না কেন ? বোধহয় সেরকম হুকুম ছিলো না ঐ নরপিশাচের।

কুলীনের গর্ব-খর্ব করা হলো, প্রাণে মারলো না! পাছে তার মেয়ে বিধবা হয়, মাছ-ভাত না খেতে পায়, শাড়ি-গয়না না পরতে পারে। ওঃ, কী ভীষণ চক্রান্ত! তাই ষষ্ঠীপুজোতেই ধুমধাম! অন্নপ্রাশন পর্যন্তও আর ধৈর্য ধরলো না! লোকজন ডাকিয়ে জানান দিলো—নাতি তার কুলীনের ছেলে! কুলীনের মোহটুকু আছে ঠিক! আদ্যরসের ঘর হবে! গর্ব করবে বুক ফুলিয়ে! চামার!

বিন্দুও ভাবছিলো। দুপুরে কাছেই একটা বটগাছতলায় বসে বসে ভাবছিলো ঃ লোকটা নিশ্চয়ই কারোর কোনো ক্ষতি করেছিলো। হয়তো কারোর বউয়ের বা মেয়ের ধর্মনষ্ট করতে গেছলো বা করেছিলো, তাই তার ঐ দশা করেছে। নইলে ওকে প্রাণে না মেরে ঐ দুষ্কর্ম্মো করলো কেন ? লোকটা বোধহয় ভালো নয়। পুরুষের সব চাইতে বড়ো শাস্তিটাই হয়েছে লোকটার— হয়েছেও তার পাপের ফলেই। তবু মনটা কি শুধরেছে ? লালসার আগুন মনে হয়তো ঠিকই আছে। আর তাতেই জ্বলে মরবে লোকটা। এবার নিজের মনেই হাসলো বিন্দু ঃ অশশো হয়েচে! অশশো না হাতি!

কিন্তু এভাবে সামলে চলা তো মুশকিল হলো। কখন বুঝতে পেরে যায় ঠিক নেই।···অবশ্য বুঝেও লাভ নেই। মেয়েমানুষের ক্ষতি করবার ক্ষমতা ভগবান কেড়ে নিয়েছেন। তবু, লোকটার গায়ে তো শক্তি আছে! এখন না হয় দুর্বল, যখন শরীরে শক্তি পাবে, তখন ? যদি গলা টিপে ধরে, যদি হঠাৎ জড়িয়ে ধরে!

তাতে লাভ ? তাতে লাভ কি হবে ওর ? হিংসে। হিংসেয় যদি মেরে ফেলে। হাতের কাছে একটা মেয়েমানুষকে পেয়েও তাকে ভোগ করতে না পারার আক্রোশে যদি মেরে ফেলে! কিংবা, কিংবা অপমান করে, গায়ে হাত দেয়!

নাঃ!—বিন্দু ভাবতে লাগলো, নাঃ। কাজটা ভালো হয়নি। ঝোঁকের মাথায় তাকে সঙ্গে আনা ঠিক হয়নি। কানাইয়ের কাছে রেখে এলেই হতো! ···একে নিজে কী করবে তার ঠিক নেই, তার উপর আর এক বোঝা! বোঝা নয়, ঝামেলা! আপদ! ভয়ের কারণ। তাছাড়া এখন দু-চার দিন আটকে থাকতেও হচ্ছে।

কী করবে ? পালিয়ে যাবে ? সরে পড়বে ? ওর যা হয় হবে। সে

নিয়ে তার মাথাব্যথার কিছু নেই। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, অযথা সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকা! অথচ একলা থাকলে সে দু'একদিনের মধ্যেই ত্রিবেণী পৌঁছে যেতে পারতো। তারপর কলকাতায় পৌঁছে হয়তো খুঁজে নিতে পারতো তার স্বামীর বাসা। তার স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতো।

কিন্তু, কিন্তু দরকারও তো হতে পারে লোকটাকে। এখানে এখন কোনো দরকার নেই হয়তো। কিন্তু কলকেতায়? সেখানে শহরে গিয়ে, মেয়েমানুষ সে, কী করবে? তখন তো একটি পুরুষমানুষেরই দরকার। অন্তত গোঁফ-দাড়ি সমেত একটা জোয়ান লোক যে সঙ্গে আছে সেটাও তো কম ভরসার কথা নয়।

বিন্দু ভাবলো: যা থাকে বরাতে। দেখাই যাক না কী হয়। লোকের মধ্যেই তো থাকবে, কিছু করতে সাহস করবে না। আর সেরকম দেখলেই চেঁচাবে সে। ওর সব ব্যাপার ফাঁস করে দেবে। সব কথা খুলে বলবে। নিশ্চয় লোকে তার দিকেই হবে।

কিংবা ভালোর জন্যেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে। নইলে তো দেখা হবার কথা নয়! আর এমন একটা খোজা মানুষের সঙ্গেও দেখা হবার কথা ছিলো না। ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই।

যাক, দেখা যাক, কতদূর কী হয়।

এখন পরমগুরু পতিটিকে খুঁজে বার করতে পারলেই হয়। তবেই সব কষ্ট সার্থক।

ভালো কথা, তার কলকেতার ঠিকানাটা ঠিক আছে তো? গোপীচরণকে দিয়ে একটুকরো তুলোট কাগজে ঠিকানাটা লিখিয়ে নিয়েছে সে।

কোমরে বাঁধা গেঁজেটা একবার টিপে দেখলো বিন্দু। হ্যাঁ, গেঁজেটা ঠিকই আছে। তার মধ্যে কয়েকটা টাকা আর কাগজটাও ঠিক আছে নিশ্চয়ই।

বিন্দু মধুতাঁতীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলো মধুতাঁতী বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে তার খল-নুড়ি আর মোড়ক।

মধু বললো, গোঁসাইভাই চলো, কোবরেজ মশায়ের ওষুধটা খাইয়ে দিইগে, আর পুলটিশটাও গরম করে এনেচি, লাগিয়ে দেওয়া যাক।

শুনেই বিন্দু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলো। আবার পরে হাসলোও সে মনে মনে। কী রোগের কী ওষুধই দেওয়া হবে! রোগটা রাজযক্ষ্মা, চিকিচ্ছে হচ্ছে বাতের। অথচ উপায় নেই। তাই বললো, চলো।

শুধু তাই নয়, তাড়াতাড়ি মধুতাতীর হাত থেকে খল-নুড়িটা টেনে নিয়ে বললো, আমি বরং ওষুধটা খাইয়ে দিই, তুমি পুলটিশটা লাগিয়ে দাও। তুমিই পারবে ঠিকমতো দিতে।

তাই হলো।

তবে গোবিন্দ কয়েকবার আপত্তি করলো : না, দরকার নেই আমার ওষুধে। এমনিই সেরে যাবে।

বিন্দু হাসতে লাগলো মনে মনে।

কিন্তু মধুতাতী ছাড়লো না। আর ছাড়বেই বা কেন ? হরি কোবরেজকে ডেকে এনে সে রোগীকে দেখিয়েছে, তাকে শাড়ি দিয়ে ওষুধ এনেছে, আর এখন বাবু বলে কিনা, খাবে না। নইলে রোগ সারবে কি করে ? আর তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

মধুতাতী গোবিন্দকে বুঝিয়ে বললো, আপনি খেয়ে নেন ওষুধটুকুন, আর আমি পুলটিশটা লাগিয়ে দিই, দ্যাখবেন আরাম পাবেন। আমাদের হরি কোবরেজের ওষুধ সত্যিই ভালো। যেন কথা কয়।

বিন্দু দেখলো আর দেরি করা উচিত নয়। বললো, নাও খেয়ে নাও বাবু। আবার তো উঠে দাঁড়াতে হবে, না এখেনে পড়ে থাকবে ?

বলেই ওষুধটা খাইয়ে দিলো বিন্দু। গোবিন্দ চিত হয়ে শুয়েছিলো, বিন্দু বললো, কত্তা, একে পাশ ফিরিয়ে দিলে পুলটিশটা লাগানোর সুবিধে হবে।

—হ্যাঁ, সেই ভালো।—মধু গোবিন্দকে পাশ ফিরিয়ে দিলো।

বিন্দু বললো, তুমি কত্তা পুলটিশটা লাগাও, আমি ততক্ষণ খল-নুড়িটা ধুয়ে আনিগে। জয় রাধে।

বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো তাড়াতাড়ি।

গোবিন্দ চুপ করেই পড়ে রইলো। মনে মনে ভাবলো, হায়, এতোও ছিলো কপালে!

বিকেলে মধুতাতী হেসে বললো, গোঁসাইভাই, তোমার গলার স্বর যখন এতো মিঠে, তখন গানও নিশ্চয়ই তেমনিই মিঠে। একটা গান গেয়ে শোনাও না ভাই। বাড়ির মেয়ে-বৌদেরও শোনবার ইচ্ছে।

বিন্দু হাসলো : জয় রাধে গোবিন্দ বলো। আমাকে গান গাইতে বলচো বটে, গাইবো, তবে নতুন অভ্যেস, হয়তো ভালো লাগবে না।

মধু উৎসাহ পেয়ে বললো, সে যেমন হোক, তুমি গাও গোঁসাইভাই।

বিন্দুর আগেই একটু-আধটু গান গাইবার অভ্যেস ছিলো, কখনো গুনগুনে স্বরে, কখনো বা গলা ছেড়ে। নন্দ বোষ্টম বা কোনো বোষ্টম বা বোষ্টমী এলে তাদের গান অথবা রামায়ণ গান বা তরজা গান সে সুযোগ পেলেই শুনতো, চট করে একবার শুনে তুলে ফেলতে পারতোও নিজের গলায়। বিশেষ করে বোষ্টম সেজে যখন বেরোবার ঠিক করলো, তখন দু'চারখানা গান সে ভালোভাবেই তালিম দিয়ে নিয়েছিলো।

কাজেই বিন্দু অপ্রস্তুত না হয়ে মধুতাঁতীর বাড়ির ভেতরের উঠোনে গিয়ে বসলো। হাতের একতারাটায় টুংটাং আওয়াজ তুলে মিষ্টিমধুর গলায় গাইতে লাগলো—

গোকুল নগরে আমার বন্ধুরে
সব লোকে ভালোবাসে।
হাম অভাগিনী, আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হইল মোরে,
আপন বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী, হাম অভাগিনী
নহিল দোসর জমা।
রসিক নাগর, গুরুজন বৈরী
এ বড়ো মুরখপনা॥

বিন্দুর গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো। মধুর অনুরোধে বিন্দু আরো দু'তিনখানা গান গাইলো। যে লোকটা আশ্রয় দিলো, তার কথা রাখাই উচিত। বিন্দু আপত্তি করলো না। গাইলো।

বাইরের ঘর থেকে গোবিন্দও শুয়ে শুয়ে শুনলো বিন্দুর গান। আহা কী চমৎকার গলা! কী মিষ্টি গলা! ঠিক মনে হচ্ছে কোনো কিন্নরকণ্ঠী যেন গান গাইছে। গোবিন্দ ভাবলো: সত্যি, বেন্দা বোষ্টমকে দেখতে অনেকটা মেয়েমানুষের মতোই। ভগবান যেন ভুল করে ওকে মেয়েমানুষ গড়তে গড়তে পুরুষমানুষ করে গড়ে ফেলেছেন।

রাত্রেই হলো বিপদ।

খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে গোবিন্দর ঘরে গিয়ে শোওয়া বিন্দুর পক্ষে

কিছুতেই সম্ভবপর হলো না। নিজের পুরুষের বেশ হলে কী হবে, মনটা তো মেয়েমানুষেরই। ঐ লোকটা অক্ষম বা দুর্বল হলে কী হবে, গোঁফ-দাড়িওলা একটা পুরুষমানুষ তো! তার সঙ্গে এক ঘরে শোয়া! ভাবতেই বিন্দুর সারা শরীর শিউরে উঠলো।

অথচ বাইরে সে পুরুষের খোলস পরে রয়েছে। কাজেই মধুতাঁতীর বাড়ির মধ্যেও যে শুতে যাবে তারও উপায় নেই।

একবার বিন্দু গোবিন্দর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, ঘরের রেড়ির তেলের আলোটা মিটমিট করে জ্বলছে। তক্তপোশে গোবিন্দ শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে একটু নড়ছে আর 'উ-আঃ' করছে।

বিন্দু বাইরে থেকেই জিগ্যেস করলো, কী গো বাবু, ঘুমোচ্ছো নাকি?

—না।—গোবিন্দ ছোট্ট উত্তর দিলো।

—কেন, ঘুম হচ্ছে না?

—না।

—একটু চেষ্টা করো ঘুমোতে।

—করচি তো।

বিন্দু এবার বললো, আমি বাইরে বারান্দায় শুচ্ছি। বুঝলে?

—কেন?

—ঘরে বড্ডো গরম।

গোবিন্দ কোনো উত্তর দিলো না।

বিন্দু বললো, রাত্তিরে কষ্ট হলে জোরে ডেকো।

—হুঁ।

বিন্দু বাইরের বারান্দায় এসে বসলো। শুক্লপক্ষ। তাই চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাইরের আঙিনায়। চারপাশের গাছপালাগুলো নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিন্দু গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো: এই আধ-অন্ধকারে নিঝুম রাত্রে নির্জন খোলা জায়গায় একলা সে বাইরে শোবে কী করে? এমনভাবে বাইরে শোয়া তো তার অভ্যেস নেই। এখন উপায়। মধুতাঁতী তো ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু ভালো ব্যবস্থাও যে সব সময় ভালো ব্যবস্থা হয় না তা তাকে বোঝানোও তো যাবে না।

এমন সময় বিন্দুর নজরে পড়লো, মধুতাঁতীর সেই তাঁতের চালাঘরটার:

দিকে। উঠে সে এগিয়ে গেলো সেই দিকে। দেখে, ঘরে তাঁত খাটানো, কোণে সুতো জড়ানো লাটাই কতকগুলো।

বিন্দু লক্ষ্য করে দেখলো, তাঁতটার আড়ালে শুয়ে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না। বেশ একটু আড়াল দেওয়া জায়গা। সে আর দ্বিধা না করে সেইখানেই শোবার ব্যবস্থা করে নিলো।

সারাটা দিন বিন্দুর বেশ কষ্ট গেছে। হেঁটেছেও অনেকটা পথ। পথে প্রথম পা দিয়ে বেশ ভালো অভিজ্ঞতাই হয়েছে তার।

বিন্দু গুড়িসুড়ি মেরে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লো। বাইরে থেকে মনেই হলো না কেউ শুয়ে আছে। যেন পড়ে আছে কোনো কিছুর বোঁচকা একটা।

ক্লান্তিতে ঘুমলো বিন্দু, তবে না ঘুমোনোর মতোই। প্রায়ই চমকে চমকে জেগে উঠলো সে। তার কানে আসতে লাগলো একটানা ঝিঁঝিপোকার ডাক। অদূরে তালগাছে পাতায় হাওয়া লাগার খড়খড় শব্দ। আর প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক ঃ হুক্কা হুয়া, হুয়া হুয়া—

তার উপরে মশার উপদ্রব। আর, ভাবনা দুশ্চিন্তা—

তবে রাত্রে একটা দেশী কুকুর তার পায়ের কাছে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে রইলো। তবু ভালো।

কোনোরকমে ভয়াল রাতটা কাটিয়ে বিন্দু উঠে পড়লো। তখনো চারদিকে আবছা অন্ধকার। রাতের জ্যোৎস্না ফ্যাকাশে। আকাশের চাঁদও ম্লান।

বিন্দু উঠে এদিক-ওদিক দেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে কাছেই পুকুরে ডুব দিয়ে কাপড়-জামা কেচে নিলো। পরলো শুকনো জামা-কাপড়। চুল আঁচড়ে চুড়ো বাঁধলো, আঁকলো নাকে রসকলি।

তার অনেক পরেই গাঁয়ে শুরু হলো লোক চলাচল। চাষীরা লাঙল বলদ নিয়ে মাঠে নামলো। মধু তাঁতী বাইরে এসে দাঁড়াতেই বিন্দু হেসে বললো, জয় রাধে গোবিন্দ বলো।

—জয় রাধে গোবিন্দ।—মধু তাঁতী হেসে জিগ্যেস করলো, রাত্তিরে গোঁসাইভায়ের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি তো?

—না না।—বিন্দু বললো।

—আর বাবুটি?

—একটু ছটফট করেচে, তবে ঘুমিয়েচে।

সত্যিই গোবিন্দ যন্ত্রণার জন্যে মাঝে মাঝে ছটফট করেছিলো, তবে ঘুমিয়েওছিলো।

এমনি করেই তিনদিন তিনরাত কাটালো বিন্দু মধুতাঁতীর বাড়িতে। কাটাতে হলো ঐ বাবুটির জন্যে। বিন্দু যতোই ভাবলো এ কদিনে ততোই দেখলো, বাবুটিকে সঙ্গে রাখাই দরকার। এখানে যেমন করে হোক চলে গেলেও কলকাতা শহরে তার দরকার হবেই হয়তো। বিশেষ করে স্বামীর ঠিকানাটা যখন সঠিক জানা নেই। আর স্বামীর নামও সে মুখে আনতে পারবে না।

অবশ্য গোবিন্দও এ কদিনে সুস্থ হলো। যন্ত্রণাও কমলো যেন। নিজে থেকে উঠে বসতে পারলো, হাঁটতেও পারলো আস্তে আস্তে।

বিন্দু আশ্বস্ত হলো।

তবে চিন্তিতও হলো সে। বাবুটির কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থাকতে হবে। লোকটার বোধহয় স্বভাবচরিত্র ভালো নয়। নইলে কখনো অমন দশা হয়! এমন কিছু করেছিলো যার জন্যে ঐ শাস্তি।—সেই পুরোনো চিন্তা।

মধুতাঁতীর বাড়িতে আরো দুদিন দুরাত্রি কাটাতে হলো বিন্দুকে। কাটাতে হলো গোবিন্দর জন্যেই। গোবিন্দ দুতিন দিন পরে উঠে অল্প অল্প হাঁটলেও পথ চলার মতো হাঁটবার শক্তি বা সাহস তখনও হয়নি দেখা গেলো।

মধুতাঁতী বললো, গোঁসাইভাই, তাড়াতাড়ি কি? বাবুটি আর দুদিন পরেই হাঁটতে পারবে। আর হরি কোবরেজের ওষুধ যখন পড়েচ তখন না সেরে উপায় আছে?

অগত্যা থাকতেই হলো বিন্দুকে।

তবে যাবার আগের দিন দুপুরবেলায় বিন্দু আগের সেই আমগাছটার তলায় এসে বসলো। ভাবতে বসলো বল্লভপুরের কথা, তার বাবা মা দিদি দিদির ছেলেটার কথা। গোপীচরণের কথাও।···তারপরেই কোনসময় ভাবনা বল্লভপুর থেকে লাফ দিয়ে পড়লো গিয়ে অচেনা অদেখা কলকাতায়। সেখানে কোনো এক ধনী বাবুর বাড়িতে, তাঁর বৈঠকখানায়। মনের দৃষ্টিতে দেখতে পেলো সে, মানিক মুখুজ্জে, স্বামী তার সেই বৈঠকখানায় বসে গেলাস গেলাস মদ খাচ্ছে। আর তার সামনে নাচছে একটা সুন্দরী বাঈজী।

—গোঁসাইভাই!

ডাক শুনেই চমকে উঠলো বিন্দু। চেয়ে দেখলো গোবিন্দ তার পেছনে দাঁড়িয়ে।

গোবিন্দই বললো, অতো কি ভাবচো গোঁসাইভাই?

বিন্দু হেসে বললো, ভাবনার কি আর অন্ত আছে?

গোবিন্দ সামনেই ঘাসের উপর বসে বললো, তোমাদেরও ভাবনা ?

—কেন নয় ?—বিন্দু বললো, ভগবানের ভাবনা না হয়, পেটের ভাবনা তো করতে হয়। এতোদিন না হয় মধুতাঁতী বসিয়ে খাওয়ালো, এর পর কী হবে কে জানে।

গোবিন্দ বললো, আমরা তো কাল যাবো ?

—ইচ্ছে তো তাই।—বিন্দু বললো।

—আমাকেও কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে গোঁসাইভাই।—গোবিন্দ বললো।

বিন্দু চোখ কপালে তুলে বললো, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় ঘুরবে ? এতদিন তুমি অসুখে পড়েছিলে, তাই আটকে ছিলাম। তাছাড়া মধুতাঁতীও ছাড়লো না।

—আমিও ছাড়ছিনে।—গোবিন্দ বললো, তুমি যেখানে যাবে গোঁসাইভাই, আমি সেখানেই যাবো।

বিন্দু হাসলো : জাহান্নমে গেলেও ?

—সে জায়গা তো আমারই চেনা গো। —গোবিন্দ ম্লান হাসলো : আসল কথাটা কি জানো গোঁসাইভাই, এখন ছাড়বে কি ? তুমি আমাকে বেঁধে ফেলেচো যে।

বিন্দু চোখ কপালে তুলে বললো, সেকি। কোথায় বাঁধলাম, কখন বাঁধলাম তোমাকে ?

গোবিন্দ বললো, কখন বাঁধলে আর বাঁধা পড়লাম তা হয়তো তুমিও জানো না, আমিও জানিনে।

বিন্দু বললো, না বাপু, আমি ওসব বাঁধাবাঁধির মধ্যে নেই। আমি পথ-চলা মানুষ, পথে একটা আধমরা মানুষ দেখলাম, তাই তুলে আনলাম, এই পর্যন্ত।—আরো গম্ভীর হয়ে বললো, এখন তোমার যেদিকে চোখ যায় যেতে পারো। আমাকে জড়াও কেন ?

গোবিন্দ কিন্তু বিন্দুর দিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে জিগ্যেস করে বসলো, আচ্ছা গোঁসাইভাই, তোমার কে আছে ? কোন গাঁয়ে বাড়ি ? বয়েসও তো বেশি নয়, চেহারাও তো কাঁচ-কাঁচ। এমন পথে-পথে ঘুরে বেড়াও কেন ?

এবার হেসে উঠলো বিন্দু : বাবা রে, এতোগুলো জেরা ? কিন্তু জেরা তো আমারই করবার কথা। অমন করে মাঠেই বা পড়ে ছিলে কেন ? কাপড়ে রক্তই বা কিসের ?

শুনেই চমকে উঠলো গোবিন্দ। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, কেন, অর্শ ? তুমি তো জানোই। কোবরেজই তো চিকিচ্ছে করে সারালো। আর খুব বেশি রকম রক্ত পড়ায় অজ্ঞান হয়ে গেছলাম।

বিন্দু শুধু বললো, ও। তা এখন নিজের গাঁয়ে ফিরে যাওয়াই তো ভালো।

—আমার গাঁ-ই নেই!—ম্লান হাসলো গোবিন্দ: আমিও ভবঘুরে, তোমারই মতো।

—তাই নাকি?—বিন্দু হাসলো: তা সাজনগোজনের তো বাহার দেখলাম খুব। জামায় সোনার বোতাম, হাতে সোনার আংটি। যেন জামাইবাবুটি।

গোবিন্দ আবার ম্লান হাসলো: ঐটুকুই আমার শখ। মানে, ফাঁকা হাঁড়ির শব্দ। ভেতরে কিছু নেই, বাইরের ভোলটাই বেশি।

—তা ভোলটা যে বদলাতে হবে।—বলেই কথাটা ঘুরিয়ে নিলো বিন্দু: মানে, যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও।

—তাই চাই।—গোবিন্দ বললো, তোমার দয়ামায়াটুকু হাতছাড়া করতে রাজি নই।

—বটে! তবে কিন্তু ঐ বাবুসাজার খেয়াল ছেড়ে বাবাজী সাজতে হবে আমার মতো!

—তাতে অরাজি নই। তবে তোমাকে ছাড়তে রাজি নই বন্ধু।

শুনে বিন্দু হাসলো: এই বেন্দা শেষে বন্ধু!—একটু ভেবে বললো, বান্দা হলেই মানাতো ভালো!

গোবিন্দ বললো, ও কথা বলতে নেই।

বিন্দু চোখমুখ ঘুরিয়ে বললো, আসল কথাটা যা বললাম বুঝলে তো?

—কি?

—আমার সঙ্গ নিলে বাপু ঐ ফিনফিনে ধুতি পরা আর চলবে না। বুঝলে মশায়? ঐ ধুতি দুখান করে ছিঁড়ে পরতে হবে এখন থেকে।

—তাই হবে।

—বাবা, একেবারে পোষা জীব যেন!—বিন্দু হাসলো: তবে জামাটাই বা গায়ে থাকে কেন? ওটাও এবার খোলা হোক।

—দেখি।—গোবিন্দ খুলে ফেললো তার জামা। বোতাম আংটিও খুলে ফেলে বিন্দুকে বললো, তোমার কাছেই রাখো এগুলো, তোমার ঝুলিতে।

বিন্দু বললো, বটে, আমার ঝুলিতে রাখি আর শেষে চুরির দায়ে ধরা পড়ি! খুব বুদ্ধি দিচ্ছো তো!

—তা আমার কাছে থাকলেও তো—

—তাহলে ঐ মধুতাতীকে দিয়ে দাও।

—কিন্তু পরে তো কাজে লাগতে পারে।

—ও।—হাসলো বিন্দুঃ কোথায় তুমি ভবঘুরে গো? দিব্যি তো সংসারী দেখচি!

গোবিন্দও হাসলো ঃ তোমাকে দেখে বোধহয়।

কিন্তু বলার পরই গোবিন্দই গম্ভীর হয়ে গেলো।

কথাটা শুনে কিন্তু চমকে উঠলো বিন্দুও। পরে হেসে বললো, কথাটা তো ভালো নয়।

গোবিন্দ বললো, কথাটা ভালো কি মন্দ জানিনে। তবে গোঁসাইভাই, তোমাকে দেখে পর্যন্ত আমার কি মনে হচ্চে জানো?

—কি?

—এমন দয়ার শরীর, এমন নরমসরম ভাব, এমন মিষ্টি কথা—এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত মেয়েমানুষের মতো। তাই ভাবছিলাম, ভগবান হয়তো তোমাকে মেয়েমানুষ করে গড়তে গিয়ে ভুলে পুরুষমানুষ করে ফেলেচেন।

—তা হবে!—বিন্দু তার মানসিক চাঞ্চল্য মনের মধ্যেই চেপে বললো, ভগবানও তাহলে ভুল করেন বলচো?

—তাই তো মনে হচ্চে!

এবার মুখে হাসি টেনে এনে বিন্দু বললো, যাক, মশায়কে যে ভগবান পুরুষমানুষ করতে গিয়ে মেয়েমানুষ করেননি, তবুও রক্ষে!

কথাটা শুনেই গোবিন্দর বুকটার মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। শুধু বললো, হুঁ।

হ্যাঁ। ভগবান কিছু করেননি, করেছে মানুষে। তাকে করেছে মেয়েমানুষ নয়, মেয়েমানুষেরও অধম। পুরুষ তো নয়, নপুংসক।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো গোবিন্দ।

বিন্দু তা লক্ষ্য করলো, তবে গোবিন্দর অলক্ষ্যে।

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো বিন্দুও। পরে বললো, এখন ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করোগে। কাল তো আবার হাঁটা আছে।

গোবিন্দ ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো ঃ অদ্ভুত ঐ বেন্দা বোষ্টম। দেখতে শুনতে ভালোই। সত্যিই, ভগবান যেন ভুল করেই ওকে পুরুষমানুষ করেছে। ঐ আলখাল্লা খুলে ওকে শাড়ি পরালে, গয়না পরালে, মাথার চুল

খুলে দিলে কে বলবে ও মেয়েমানুষ নয়। হাত-পায়ের গড়নও কেমন নরম। ঠিক মেয়েমানুষের মতোই। সত্যিই, ও যদি মেয়েমানুষ হতো।

হতো হতো।—গোবিন্দর বুকখানা যেন টনটন করতে লাগলো। তাতে তার কি? বেল পাকলে কাকের কি? হায় হায়, জীবনটাই তার নষ্ট হয়ে গেলো।

৫৩

পরদিন খুব ভোরেই রওনা দিলো বিন্দু আর গোবিন্দ।

মধুতাঁতীর কাছে বিদায় নেবার সময় বিন্দুর চোখদুটো ছলছল করেই উঠলো। বললো, তাঁতীদাদা,তোমার এ উপকার কখনো ভুলবো না।

মধুতাঁতীও কাঁপা গলায় বললো, আর আমি যে গোঁসাইভাইকে পেলাম, বাবুটিকে পেলাম সে কি আমার কম ভাগ্যি। তোমাদের পায়ের ধুলোয় আমার পুব্বপুরুষের এই ভিটে পবিত্তর হলো।

গোবিন্দ বললো, ভাই, তোমাদের অনেক কষ্ট দিলাম।

মধুতাঁতী হাসলো : আপনি ভদ্দরনোক, আপনিই এখেনে এসে কষ্ট পেয়ে গেলেন। এখন ভাবচি, এ শরীলে হেঁটে তিবেনী পয্যন্ত যেতে পারলে হয়। বললাম একটা গরুর গাড়ি বা পালকি—

—না ভাই, পারবো আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে।—গোবিন্দ বললো।

মধুতাঁতী বলেছিলো একটা গরুর গাড়ি বা পালকির ব্যবস্থা করবে কি না। গোবিন্দই রাজি হয়নি। কারণ, মধুকে বলে তার জানা এক পোদ্দারের কাছে নিজের আংটি আর বোতাম কটা বেচে যে কটা টাকা পেয়েছিলো তা আর বিলাসিতা করে খরচ করতে চায় না। বিন্দু অবশ্য বলেছিলো, দেখো বাপু নিজের শরীরটা বোঝো। তেমন মনে হয় তো তাঁতীদাদা যা বলচে সেই ব্যবস্থাই করো।

তবুও গোবিন্দ বলেছে, না, দরকার নেই।

তবে মধু বিন্দুর ঝুলিতে অন্তত দুদিনের মতো চিঁড়ে মুড়ি পাটালি আর বাতাসা ভরে দিতে ভোলেনি।

তা গোবিন্দ প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে পারলো। তবে আস্তে আস্তে। পরনে তার ফিনফিনে কাপড়খানা দুপাট করে পরা। খালি গা। পাঞ্জাবিটা পাকিয়ে মাথায় বাঁধা।

পথে বিন্দু তেমন কোনো কথাবার্তা বললো না। সে ভাবতে লাগলো কলকাতার কথা। সেখানে গিয়ে স্বামীকে সে কীভাবে খুঁজে বার করবে, তারই কথা।

আর, গোবিন্দও অন্যমনস্ক। কোথায় চলেছে সে? কেনই বা চলেছে? কী হবে গিয়ে—ইত্যাদি নানা ধরনের ভাবনা। অথচ চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা তো চলে না, চলতেই হবে। চলছে সকলেই। এগিয়ে চলছে। কেউ চলছে মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে, জোর কদমে। আর কেউ চলছে মাথা নীচু করে, দ্বিধাভরা মনে, ধীরে ধীরে। গোবিন্দও চলতে লাগলো— অলক্ষ্যের পথে, মাথা নীচু করে, মরমে মরে গিয়ে। একটা জীবন্ত নপুংসক মাংসপিন্ড এগিয়ে চললো শিখাময়ী একটুকরো আগুনের পাশে পাশে। আর, আগুনের তাপ লাগলো গোবিন্দর মাংসপিন্ডেও। তাতে জ্বালা ধরলো দেহে—কিন্তু তার চাইতেও জ্বালা বুঝি মনে।

একসময় গোবিন্দ জিগ্যেস করলো, গোঁসাইভাই?

—কি?—বিন্দু হাতের একতারাটা টুংটুং করলো।

—কোথায় যাচ্চি আমরা?

—ধরো জাহান্নমে।

গোবিন্দ ম্লান হাসলো: বলেচি তো সে জায়গাটা আমার জানা আছে। তবে তোমার সঙ্গে সেখানে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।—পরে একটু থেমে বললো, আর, আর যাবার ক্ষমতাও নেই।

বিন্দু মনে মনে বুঝলো কথাটার মানে। তবু না-বোঝার ভাণ করে বললো, পুরুষের জন্যে তো জাহান্নমের দরজা সব সময়েই খোলা।

গোবিন্দ সে কথার কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করেই পথ চলতে লাগলো। বিন্দু বুঝলো, কথাটা বাবুটির প্রাণে গিয়ে বিঁধেছে। তাই তাড়াতাড়ি বললো, যদি বলি কলকাতায় যাচ্চি?

—কলকাতায়?

—হুঁ।

—সে তো শহর!

—হ্যাঁগো, শহুরে হতেই চলেচি।—বিন্দু হাসলো: আর এই গেঁয়ো বৈরেগী হয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতে ইচ্ছে নেই। আর যদি ভিক্ষেই করতে হয়, শহরে গিয়ে ভিক্ষে করলে দুটো পয়সা হাতে আসবে। শুনিচি, ওখানে বাবুদের সব দরাজ হাত।

গোবিন্দ কথার কোনো উত্তর দিলো না।

—কী? চুপ করে রইলে যে!

—না, কিছু না—গোবিন্দ বললো।

বিন্দু বললো, তুমিও শহরে একটা কাজ ঠিক করে নিয়ো।

গোবিন্দ শুধু বললো, হুঁ।

বিন্দু বললো এবার, আমরা ত্রিবেণীর ঘাটের দিকে ঠিক যাচ্চি তো?

—মনে তো হচ্চে।

বিন্দু বললো, দুপুরে একটু বিশ্রাম করেই আবার হাঁটা দিতে হবে। পারবে তো?

—হ্যাঁ।

—মানে, আজই ত্রিবেণীর ঘাটে পেঁাছোনোর দরকার।

খানিক হাঁটার পরই একটি লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কাছাকাছি কোনো গাঁয়েরই লোক হবে।

লোকটাই জিগ্যেস করলো, আপনারা নতুন লোক বলেই মনে হচ্চে?

—হ্যাঁ।—বিন্দু বললো, আমাদের ত্রিবেণীর দিকে যাবার ইচ্ছে। কতদূর পথ জানা আছে?

লোকটা বললো, এই মাঠ পার হলেই মগরা। মগরা থেকে ত্রিবেণী খুব বেশি দূর নয়। জোর পায়ে হাঁটলে বিকেল নাগাদ পেঁাছোনো যাবে।

বিন্দু জিগ্যেস করলো, মশায়ের নিবাস?

—এই কাছেই হালসা গাঁয়ে।—বলেই লোকটা প্রশ্ন করলো গোবিন্দকে: আপনিও কি গোঁসাইয়ের সঙ্গে ত্রিবেণী যাচ্চেন?

—হ্যাঁ।—গোবিন্দ ছোট্ট উত্তর দিলো।

বিন্দু হেসে বললো, পথে দেখা। শুনলাম, ইনিও ত্রিবেণী যাবেন, তাই একসঙ্গেই চলেছি গল্প করতে করতে।

—তা বেশ।—লোকটি হেসে বললো, আচ্ছা, চলি গোঁসাই।

আরো খানিকটা হাঁটবার পর একটা বড়ো পুকুরের ধারে আসতেই বিন্দু বললো, বেলা বেড়েচে, এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক। গাছপালাও আছে, মধুতীর দেওয়া চিঁড়ে পাটালি খেয়ে ছায়ায় শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করাও যাবে, কী বলো?

গোবিন্দ বললো, ভালোই তো।

বিন্দু জিগ্যেস করলো, হাঁটতে কষ্ট হয়নি তো?

—না।

—অশ্বশের যনতন্নাটা?

—কম।

শুনে বিন্দু মনে মনে হাসলো: হুঁ। যন্ত্রণা তো পশ্চাতে নয়, সামনে। আর এখন দেহের চাইতে মনে। তবু যদি জানতো সঙ্গে চলেছে একটি···

ভাবতেই চমকে উঠে বিন্দু। নিজের দেহের দিকে একবার তীক্ষ্ম নজর বুলিয়ে নিলো। না, ধরবার উপায় নেই।

—নাও, বসো এই গাছতলায়।—বিন্দু একতারাটায় একটা ঝংকার দিয়ে নামিয়ে রেখে বসলো নিজেও।

তারপর পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে চিঁড়ে পাটালি ভাগ করে নিয়ে খাবার পর বিন্দু গোবিন্দকে বললো, একটু গড়িয়ে নাও বরং। দেখি আমিও একটু···

বলেই বিন্দু বেশ খানিকটা সরে গিয়ে একটা গাছতলায় চাদর বিছিয়ে কাত হয়ে শুলো।

গোবিন্দও শুলো ঘাসের উপরেই। বিশ্রাম তারই বেশি দরকার।

ঐ শোয়া পর্যন্তই। চোখের পাতাও বোজা, তবে ঘুম হলো না কারুরই।

—গোঁসাইভাই।

গোবিন্দই হঠাৎ ডাকলো।

বিন্দু কিন্তু মটকা মেরে পড়ে রইলো। কথার কোনো উত্তর দিলো না।

—ও গোঁসাইভাই।—আবার ডাক।

—উঁ?—এবার উত্তর দিতে হলো।

—আমার ঘুম আসচে না।

—কেন?

—কেবল মনে হচ্চে, যদি সাপ পোকামাকড় আসে।

—ও, প্রাণের ভয় তো খুব দেখচি।—বিন্দু বললো, তাহলে আর আমার সঙ্গে ঘোরা কেন?

—ঘুরচি তোমার ভরসায়।

—বটে!—বিন্দু বললো, একটা আধধুমসো মিনসেকে আমি কি ভরসা দেবো?

গোবিন্দ বললো, জানোই তো, মানুষ ডোববার ভয়ে হাতের কাছে কুটোটুকু পেলেও তা আঁকড়ে ধরে।

—কিন্তু তাতে তো কাজ হয় না।

—হয় বৈকি। সে কুটো তো লোকটার ভাগ্যে কাঠও হতে পারে।

বিন্দু হেসে বললো, তাহলে জেনে রাখো, এক্ষেত্রে এটি কুটোও নয়, কাঠও নয়। বরং একটা পরগাছা লতা।

কথাটা ভালোই লাগলো গোবিন্দর। উঠে বসে বললো, সত্যিই একটা লতা। তবে পরগাছা নয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানো লতানে ফুলের গাছ।

—বটে, কবিত্ব হচ্ছে।—বিন্দু ধমক দিলো।

—জানো?— গোবিন্দ বললো, ভগবান যদি ভুল না করে সত্যিই তোমাকে মেয়েমানুষ করে গড়তেন তবে তুমি হতে আমার বোষ্টমী, আর—আর আমি হতাম তোমার—

হঠাৎ থেমে গেলো গোবিন্দ।

—কী? থামলে যে?

—না, কিছু না।

বিন্দু বললো, তুমি বোষ্টম হলে মানাতো ভালো, না?—বলেই হেসে উঠলো সে: তবে ঐ বাইরে থেকেই—

শুনেই চমকে উঠলো গোবিন্দ।

বিন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো, এবার যাওয়া যাক।

মগরাতে পেঁছেও বিন্দু দেরি করলো না সেখানে।

একে আস্তে আস্তে হাঁটা, কাজেই মগরা পেঁছুতেই বিকেল হয়ে গেলো। ত্রিবেণী পেঁছোতে রাত হয়ে যাবে। অতএব আর দেরি করা উচিত নয়। তাছাড়া জায়গাটা ব্যবসার জায়গা। দোকানপাট গদি কাছারী অনেক কিছুই আছে। লোকজনও বেশ। কাজেই এতো লোকের মাঝে না থাকাই উচিত।

বিন্দু তাই মগরায় না থেমে বরং আরো একটু এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে বসলো কিছুক্ষণ। ঝুলি থেকে আরো কিছু চিঁড়ে পাটালি বার করে খেলো দুজনে।

গোবিন্দও অবশ্য বিন্দুর মতেই মত দিলো।

লোকজন তারও যেন আর ভালো লাগছে না। বরং পুরুষমানুষগুলোকে দেখে তার সর্বাঙ্গ কেমন যেন রি-রি করে উঠলো। একটা চাপা হিংসা তার মনকে দখল করে বসলো: লোকগুলো কেমন কাজকর্ম করছে, সংসারধর্ম

করছে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করছে। রাত্রে স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গিনী করে দেহের খিদেও মেটাচ্ছে। আর সে? সে?

আর বিন্দু মনে মনে ভাবলো ঃ সঙ্গের বাবুটিকে এখেনে বেশিক্ষণ রাখাটা ঠিক নয়। হয়তো এখেনেই থেকে যেতে চাইবে। হয়তো কোনো কাজের চেষ্টা করবে এখেনেই। তাহলে তাকে একলাই আবার রওনা হতে হবে। তার এতো কষ্ট সব বৃথাই যাবে। না, একে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যেতেই হবে। বড়ো শহর। একটা পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকা বিশেষ দরকারই। অন্তত যেকদিন স্বামীকে না খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু গোবিন্দ বললো, গোঁসাইভাই, আর যে হাঁটতে পারিনে। কী করা যায়?

শুনে বিন্দু একটু ভাবিতই হলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই দেখা গেলো একটা রোগা পাতলা লোক একটা ছোট ঘোড়ায় চড়ে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দেখেই বিন্দু তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে বললো, ও ভাই শুনচো?

ডাক শুনে লোকটা ঘোড়া থেকে নামলো। বললো, কি?

বিন্দু গোবিন্দকে দেখিয়ে বললো, আমরা ত্রিবেণী যাবো। তবে আমার সঙ্গের এই লোকটা সবে রোগ থেকে উঠেচে, তাই দুর্বল। তোমার ঘোড়টায় যদি লোকটাকে নিয়ে যাও তো কিছু দিতেও রাজি আছি।

গোবিন্দও রাজি, ঘাড় নেড়ে জানালো।

লোকটা বললো, আমিও তো তিবেণীতেই যাচ্চি। তবে সেক্ষেত্রে আমাকে হেঁটে যেতে হবে। কাজেই—

তা শেষপর্যন্ত কিছু প্রাপ্তিযোগ দেখে আর বিন্দুর মিষ্টি মুখখানা দেখে রাজি হয়ে গেলো লোকটা এবং গোবিন্দকে সে-ই প্রায় টেনে ওঠালো তার ঘোড়ার পিঠে।

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরে চললো, বিন্দু চললো একতারাটা টুংটাং করতে করতে ঘোড়ার পাশে-পাশে।

কিন্তু লোকটা চলতে চলতে বিন্দুর সঙ্গে যেন একটু বেশিরকম গল্প শুরু করে দিলো ঃ বলি, কচি-গোঁসাইয়ের বাড়ি কোথায়, কোথা থেকে আসা হচ্চে, সঙ্গের লোকটিই বা কে, তিবেণীই বা যাওয়া হচ্চে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্দু সত্যি-মিথ্যে দিয়ে ছোটছোট জবাব দিতে লাগলো। শেষে একসময় একটু রাগ দেখিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে এতো বকবক করতে পারিনে বাপু!

বিন্দুর হাতের একতারার টুংটুঙ্ধ্বনিও গেলো বন্ধ হয়ে।

গোবিন্দ বললো, এতো কথায় কাজ কি ভাই? পথটুকু পেঁাছে দিয়ে তুমিও খালাস হও, আমরাও।

কিন্তু লোকটার মুখের লাগামে, দেখা গেলো, টান পড়লো না। বরং আরো ঢিলে হলো। বললো, আহা কাঁচ-গোঁসাই, রাগ করো কেন ভাই? মুখ বুজে পথ চলবো? তাই একটু গল্প করচি। তা ভাই, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চেহারাটা যেমন সুন্দর, গলাটাও তো তেমনি মিষ্টি। একটা গান গেয়ে শোনাও না ভাই?

বিন্দু বললো, গলায় কদিন ধরে খুব ব্যথা। ঢোঁক গিলতেই কষ্ট হয় তা তোমাকে গান শোনাবো কি?

লোকটা বললো, তবে থাক ভাই, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে।

লোকটা চুপ করলো।

বিন্দু বাঁচলো। গোবিন্দও আশ্বস্ত হলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার শুরু হলো জেরা: হ্যাঁ ভাই কাঁচ-গোঁসাই, তোমরা তিবেণী পর্য্যন্তই যাবে, না আরো দূরে?

—ঠিক নেই কিছু।—ছোট্ট জবাব দিলো বিন্দু।

—তিবেণীতে থাকবে কোথায়?

—তারও ঠিক নেই।

—কদিন থাকবে?

—তাও বলতে পারচিনে।

লোকটা কথার ফাঁকে-ফাঁকে বারেবারেই বিন্দুকে দেখছিলো। একবার বললো, তুমি পেছিয়ে পড়চো যে ভাই! আমার কাছে এদিকে এসো না!

বিন্দু বললো, আমি ঠিক চলচি। তুমি যেমন চলচো চলো।

লোকটা আবার আরম্ভ করলো: চলতে কষ্ট হয় তো ঘোড়ার পিঠে তুমিও ওঠো না। উঠবে?

—না। দরকার নেই।—বিন্দু মনে মনে ভাবলো: এ আর এক বিপদ হলো দেখচি।

তবে রক্ষে, একটু পরেই সন্ধ্যে নাগাদ তারা এসে পড়লো ত্রিবেণীতে।

ত্রিবেণী তখনও বেশ সরগরম। বাজারহাট দোকানপত্র সব খোলা। রাস্তায় লোকজনেরও বেশ আনাগোনা। কেনা-বেচাও চলছে।

গঙ্গার ধারে এসে দেখলো বোট বজরা পানসি সব ঘাটে বাঁধা। যাত্রী

বোঝাই হয়ে নৌকোও আসছে, ভিড়ছে এসে ঘাটে। তবেই জাত মান কলকাতায় যাবার জন্যে কোনো নৌকো নেই, মাঝিরাও যাত্রীর জন্যে ভ..
নয়।

অতএব ঘোড়ার লোকটাকে গোবিন্দ কিছু পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় করতে গেলো। কিন্তু লোকটা হাত পেতে পয়সা নিয়েও দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানেই।

গোবিন্দ বললো, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

—এমনি।

বিন্দু বললো, এখন যেতে পারো। আমরা একটু বিশ্রাম করবো।

লোকটা বললো, আমিও তো থাকবো এখেনেই। তা একসঙ্গেই রান্না খাওয়া করলে হতো না?

—না।—বেশ জোর গলাতেই বললো বিন্দু।

—আচ্ছা, তবে চলি।—লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটেই চলে গেলো।

লোকটার কথাবার্তা ধরনধারণ দেখে বিন্দু ভয়ই পেয়েছিলো। তবে লোকটা চলে যেতে নিশ্চিন্ত হলো সে।

বিন্দু আর গোবিন্দ কাছেই একটা গাছতলায় এসে বসলো।

বিন্দু বললো, কিছু চাল ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যাক।

—তাই হোক।—গোবিন্দরও খিদে পেয়েছিলো।

গোবিন্দ কাছেই একটা দোকান থেকে চাল ডাল তেল নুন আলু পটল আর একটা মাটির হাঁড়ি কিনে আনলো। তারপর গাছতলাতেই মাটিতে উনুন তৈরী করে কাঠকুটো জ্বালিয়ে বিন্দু চড়িয়ে দিলো রান্না। গোবিন্দ ঘাসের উপরে শুয়ে রইলো।

রান্নাবাড়া আরো অনেকেই করছিলো। কাল যারা নৌকোয় এদিক-ওদিক যাবে আজ তাদের অনেকেই ত্রিবেণী এসে পেঁছেছে। কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ পালকিতে, কেউ বা হেঁটে। তারাও রাত্রে কিছু খেয়ে নেবার জন্যে উনুন জ্বালিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া সারতে একটু রাতই হলো। দোকানের অনেক ঝাঁপই তখন বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচলও গেছে কমে। অবশ্য খাবারের দোকানগুলোয় তখনও টিমটিম করে জ্বলছে রেড়ির তেলের আলো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুরগুলো।

বিন্দু বললো, গোঁসাইভাই, এসো এখেনেই আমরা দুজনে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।

বিন্দু জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে বললো, এখানে নয়। দেখি অন্য কোনোখানে—

অথচ অনেকেই খোলা জায়গায় শুয়ে আছে। মেয়েরাও দল বেঁধে শুয়ে আছে মুড়িসুড়ি দিয়ে।

কিন্তু বিন্দু? পুরুষের বেশে না পারে মেয়েদের কাছে শুতে, আর পুরুষের কাছে শোবার কথা তো ভাবতেই পারে না সে। তাছাড়া ঘোড়ার ঐ লোকটার কথাও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি একেবারে। কাজেই শোবার জায়গা খোঁজবার গরজটা তারই বেশি।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে একটা বন্ধ দোকানের দাওয়া দেখিয়ে বিন্দু গোবিন্দকে বললো, তুমি এখেনে শোও।

—আর তুমি?—গোবিন্দ জিগ্যেস করলো।

বিন্দু বললো, আমিও শোবো'খন এখেনেই।—বলেই বিন্দু একটু সরে গোবিন্দর পায়ের দিকে বসলো।

গোবিন্দ জিগ্যেস করলো, শোবে না গোঁসাইভাই?

—না।—বিন্দু বললো, ঘুম এলে শোবো'খন। এখন এখেনে একটু বসি। তুমি বরং ঘুমোও।

খাওয়াদাওয়ার পর গোবিন্দর ঘুমই এসেছিলো। বললো, তবে আমি ঘুমোই। তুমি আমার এই পাশের জায়গাটায় শুয়ো।

—আচ্ছা।—বলে বিন্দু তেমনিই বসে রইলো।

বসে রইলো বেশ খানিকক্ষণ। রাত পোহালেই কাল কলকাতায় রওনা হবে। তারপর···তারপর দেখা যাক। এখন রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে হয়। কয়েকবার ঐ ঘোড়ার লোকটার মুখও ভেসে উঠলো বিন্দুর মনে। চিমড়েপোড়া লোকটার কথাবার্তা ভালো নয়, চাহুনিও। তাছাড়া বড্ড গায়ে-পড়া। মেয়েমানুষ বলে সন্দেহ করেছে নাকি তাকে? না, তা হয়তো নয়। ওমনিই স্বভাব হয়তো লোকটার।

একবার চেয়ে দেখলো বিন্দু গোবিন্দর দিকে। ভালো করে নজর করে দেখলো : ঘুমুচ্চে বাবুটা। হুঁঃ, এখন আর বাবু বলে চেনা যায় না। খালি গা। পরনে দোপাট করে ধুতিটা পরা। বোষ্টম হয়েছে। হুঁঃ।

বিন্দু হাসলো মনে মনে, তবে নিশ্চিন্তও হলো।

এবং পরে একসময় ঢুলুনিও এলো তার। জাত মান

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলো, দাওয়ার এক কোণে কতকগুলো কাঠ জড়ো করা। বিন্দু উঠে গিয়ে তারই আড়ালে লম্বাটে জায়গাটায় নিজের শোবার জায়গা করে নিলো।

তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত বিন্দু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো নিজেই জানে না।

৫৪

হঠাৎ একসময় ঘুম ভেঙে গেলো বিন্দুর।

পাশ ফিরে শুয়ে ছিলো বিন্দু, একসময় মনে হলো, কী যেন তার পেছনে এসে শুলো। রাস্তার কুকুর নাকি? কিন্তু একটা পুরুষের হাত প্রায় তখনি তার গায়ে এসে পড়লো।

—কে? কে?—বলেই ধড়মড় করে বিন্দু উঠতে যেতেই হাতখানা তার আলখাল্লার গলার দিকটা চেপে ধরলো। আর তারই টানে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেলো জামার বেশ খানিকটা।

—বাবু, বাবু, ও বাবু!—বিন্দু হুড়মুড় করে উঠে কাছেই গোবিন্দর প্রায় ঘাড়ে এসে পড়লো। গোবিন্দও চমকে জেগে উঠলো।

হ্যাঁ, একটা লোকই তো!

লোকটা বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিলো কিন্তু গোবিন্দ তার আগেই একটা কাঠের চেলা হাতের কাছে পেয়েই ছুঁড়ে মারলো সেটা তাকে লক্ষ্য করে। একটা শব্দ শোনা গেলো: উঃ, বাপরে!

সেই ঘোড়ার লোকটা! চিনতে ভুল হলো না গোবিন্দর। বিন্দরও।

কিন্তু আধ-অন্ধকারে গোবিন্দ চমকে উঠলো বিন্দুর নতুন রূপ দেখে, তার স্বরূপ দেখে। মাথায় একরাশ চুল পিঠে ছড়ানো। আর, আর—ছেঁড়া আলখাল্লাটার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার সুগোল স্তনের খানিকটা। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে বিন্দু!

—তুমি—তুমি মেয়েমানুষ?—গোবিন্দ অবাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেঁদে ফেললো বিন্দু।

—কিন্তু—কিন্তু, কেন?—গোবিন্দ আরো স্পষ্ট হলো: মানে—মানে বোষ্টম সেজেছিলে কেন?

বিন্দু বললো, একলা বেরিয়েছিলাম সোয়ামীর খোঁজে।

বিন্দুর মা। কোথায় ?

—কলকাতায়।

—ঠিকানা জানো ?

—একটু একটু। এখন তুমিই ভরসা।

—হুঁ।—গোবিন্দ ভাবলো ঃ তাকেই ভরসা! সেও তো পুরুষ। না, পুরুষ নয়। ভাগ্য ভালো মেয়েটার, সে আর পুরুষ নয়। যদি সে আজ পূর্ণাঙ্গ পুরুষই হতো—তবে, তবে ?

ওঃ! একটা সুখাদ্য ফল তার হাতের মধ্যেই। অথচ—অক্ষম, অক্ষম—

গোবিন্দ দুহাতে তার মাথা টিপে ধরে ভাবলো, কেন, কেন ঐ বেন্দা বোষ্টম মেয়েমানুষ হয়ে দেখা দিলো তার চোখের সামনে? কেন, কেন? তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্যে! ভগবান এ কী শাস্তি!

—কী, চুপ করে রইলে যে ?—বিন্দু ভয় পেয়ে জিগ্যেস করলো।

—এ্যাঁ, কি বলচো ?—চমক ভাঙলো গোবিন্দর।

—চলো, এখানে আর নয়।

—কোথায় যাবে ?

বিন্দু বললো, রাত বোধহয় আর বেশি নেই। চলো ঘাটের ধারে গিয়ে বসিগে। ওখানে লোকজনের মধ্যেই থাকা ভালো।

গোবিন্দ ম্লান মুখে জিগ্যেস করলো, কিন্তু আমাকে, আমাকে তোমার ভয় করবে না ?

—না।

—না ? কেন ?—জানতে উৎসুক হলো গোবিন্দ।

বিন্দু উঠে দাঁড়িয়ে আলখাল্লার ছেঁড়া জায়গাটায় গিঁট দিতে দিতে বললো, আমি লোক চিনি।

বিন্দু আর দেরি করলো না। চুলগুলো আবার চুড়ো করে বেঁধে সাজটা ঠিক করে নিয়ে বিন্দু গোবিন্দর সঙ্গে হেঁটে এসে বসলো নৌকোর ঘাটের কাছে। আশেপাশে এখানে ওখানে সবাই ঘুমুচ্ছে। তবু জায়গাটায় মানুষ আছে।

বিন্দু কলকাতায় যাবার প্রথম নৌকোর অপেক্ষায় বসে রইলো। চুপচাপ। গোবিন্দর সঙ্গেও কোনো কথা নেই।

তারপর মাঝিরা হাঁক দিতেই গোবিন্দ আর বিন্দু কলকাতায় যাবার প্রথম নৌকোটায় উঠে বসলো।

শুধু একবার বললো বিন্দু, ভাগ্যিস সঙ্গে ছিলে বাবু, তাই জাত মান বাঁচলো।

গোবিন্দ বললো, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে, তাই হয়তো ভগবান বাঁচালেন।—পরে একটু থেমে বললো, তবে আমাকে না বাঁচালেই পারতে।

—আমি বাঁচাবার কে?—বিন্দু বললো, আমার দরকারের জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে বাবু। এখন কলকাতায় তুমিই ভরসা।

গোবিন্দ শুধু বললো, ভগবান ভরসা।

৫৫

পরদিন পূর্বদিকেই যথারীতি সূর্য উদয় হলো।

সে সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠলো। সে সূর্যের আলো এসে ঢুকলো গানাবাবুর বিরাট প্রাসাদের সেই সুসজ্জিত ঘরে।

কিন্তু সে আলো যেন বাসনাময়ীর জন্যে নয়।

বাসনাময়ী চারদিক অন্ধকার দেখলো। জ্ঞান ফিরে পেতেই বাসনাময়ী বুঝলো সে তার সর্বস্ব খুইয়েছে।

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলো।

ধনীর এই বিরাট প্রাসাদখানায় একমাত্র সর্বহারা নিঃস্ব বুঝি সে-ই।

গানাবাবু তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। নাসিকায় রীতিমতো গর্জন। পরম পরিতৃপ্ত। নিশ্চিন্ত। একটা ভোজের পর অবসাদ।

বাসনাময়ী একবার চেয়ে দেখলো গানাবাবুর দিকে। দেখেই তার সর্বশরীর ঘৃণায় রাগে অপমানে যেন রি-রি করে উঠলো। নারীমাংসলোলুপ জন্তুটা তার শিকারটাকে আকণ্ঠ উদরসাৎ করে এখন যেন পরিশ্রান্ত।

বাসনাময়ী চোখ ফিরিয়ে নিলো। তার সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করছে। প্রায়-নগ্ন সে, শাড়িখানাকে কোনোরকমে জড়িয়ে নরম গদিপাতা সর্বনাশা পালংক থেকে তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালো সে। গত রাত্রের সাজসজ্জা তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। শৌখিন রাক্ষসটার তরিবৎ করে ভোজ খাওয়ার উপকরণ সব। পাগলের মতো সে দুহাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুলে ফেললো সাজসজ্জা অলংকার। মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো সেসব। তার কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু দরকার নেই।

শেষে বাসনাময়ী নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলো দুহাতে: হে ভগবান, এ কী করলে, এ তুমি কী করলে।

চোখের জল গড়াতে লাগলো তার দুগাল বেয়ে। অস্থির হয়ে সে ঘুরতে লাগলো ঘরময়। দামী আসবাবপত্রে ঠোক্কর খেতে লাগলো, তবু সে যন্ত্রণা যেন কিছুই নয়।

শেষে বন্ধ দরজাটার দিকে নজর গেলো তার।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজাটায় ধাক্কা দিতে লাগলো। ঘরখানার মধ্যে তার দম যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজাটা খুলে গেলো। কে যেন খুলে দিলো। আর বাসনাময়ী একপা বেরুতেই আগের দিনের দাসীটা তার হাতখানা চেপে ধরলো ঃ এসো কলঘরে, চলো, হাত মুখ ধোও।

—না।—ঝটকা দিয়ে উঠলো বাসনাময়ী।

দাসী হেসে বললো, আর না কেন?

আর 'না' করে কোনো লাভ নেই, সেকথা বাসনাময়ীও জানে বৈকি। কোনো কিছু হারাবার আগেই হারাবার ভয়টুকু থাকে, শেষে সেটা হারিয়ে গেলে আর কি হারাবার ভয়?

বাসনাময়ী সব হারিয়ে বসে আছে। আর কিসের ভয়?

কিন্তু অভয়ও তো নেই।

বাসনাময়ী দেখলো, তার চারদিকে স্বামী পুত্র সংসার সমাজ কেউ অভয় তো দিচ্ছেই না বরং চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, তুই পতিতা, তুই কুলটা, তুই ভ্রষ্টা।

বাসনাময়ী বুঝলো, ঐ রাক্ষসটার উচ্ছিষ্ট সে। তার ভোজ্য হয়ে তার ভোগ্য হয়েই কাটাতে হবে এই সোনার খাঁচার মধ্যে।

কিন্তু সোনার খাঁচাও ভাগ্যে থাকা চাই।

বাসনাময়ী দেহ দিয়েও মন পেলো না গানাবাবুর।

বাসনাময়ীর উপরে তাঁর খিদে মিটে গেলো কয়েক রাত্রের পরেই। মুখে অরুচি দেখা দিলো। একই জিনিস কার রোজ-রোজ খেতে ইচ্ছে করে! সামনে সাজানো রুপোর বাটিতে মাংসের ঝোলে একটু আঙুল ডুবিয়ে চাখা গেলো, ব্যাস! আসলে জিনিসটা হাতের মধ্যে না পাওয়া পর্যন্তই হ্যাংলাপনা! পেলে পরেই হেলাফেলা।

নতুন মেয়েমানুষের স্বাদ পাবার জন্যে গানাবাবুর লালসার জিব আবার লকলক করতে লাগলো। জানতে পেরে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরাও লেগে গেলো বাবুর নতুন শিকারের আয়োজনে।

বাবুর এই মুখ-বদলাবার আগ্রহে অনুচরবর্গেরও রীতিমত উৎসাহ ! একে বকশিস, তার উপর বাবুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাবার লোভ আর লালসা।

কয়েকদিন পরে একদিন দাসীই জানালো বাসনাময়ীকে ঃ কাল থেকে তোমার অন্য ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েচে।

এবং তাকে নিয়ে গিয়ে যে ঘরখানা দেখানো হলো, বাসনাময়ী দেখলো, সে ঘরখানা বেশ ছোটই, আসবাবপত্রও বেশি নেই, তেমন সাজানোও নয়।

অনেকটা যেন তারই মতো। অপমানে সংকুচিত নিঃসহায় নিঃস্ব।

বাসনাময়ী জিগ্যেস করলো, হঠাৎ এ ঘরে যে ?

—আমি তার কি জানি!—দাসী জানালো।

কিন্তু দাসী ভালো করেই জানে, কাল একটি নতুন পাখি ধরা পড়েছে বাবুর সোনার খাঁচায়! আর পাহারা দিতে হবে তাকেই।

শুধু তাই নয়, সে সন্ধ্যায় কেউ এলো না বাসনাময়ীকে সাজাতে, কেউ এলো না তাকে নিয়ে যেতে গানাবাবুর সেই নারীমেধ যজ্ঞের ঘরখানায়।

বাসনাময়ী প্রথমে অবাক হলো, পরে কৌতূহলী হলো। শেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। যাক, বাঁচা গেলো। হয়তো রাক্ষসটার খিদে মিটেছে। অন্তত, তাকে আর চায় না। হয়তো তারই মতো অন্য কাউকে···

কিন্তু সে ? সে এখন কী করবে ? কোথায় যাবে ? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে হবে হয়তো। কিংবা এ বাড়িতেই কাটাতে হবে বাকি জীবনটা ? এই সব ভয়ংকর দেওয়ালগুলোর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আজীবন ? আর যদি আত্মহত্যা করতে পারা যায় তবেই বাঁচা গেলো।

আত্মহত্যা!—বাসনাময়ীর মনে পড়লো ঃ ঐ নীরোদাসুন্দরীর মতো আত্মহত্যা ? গলায় ফাঁস দিয়ে ? নাকি, কাপড়ে আগুন লাগিয়ে ?···নীরদাসুন্দরীর বীভৎস মুখখানা তার চোখের সামনে আবার যেন ভেসে উঠলো।

বাসনাময়ী ছোট্ট ঘরখানার একটা ছোট্ট খাটের উপর শুয়ে কড়ি-বরগার দিকে চেয়ে-চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো। নীরোদাসুন্দরীর মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠতেই ভয়ে সে তার দুচোখ বন্ধ করে ফেললো ঃ উঃ! দেখচে কেমন কটমট করে!

বাসনাময়ী আরো দেখলো পরে, তার খাওয়াদাওয়ারও আর সে জুত নেই। যেটুকু না দিলে নয় তাই অন্য একটা দাসী এসে তার সামনে থালায় করে ধরে দিয়ে যায়। আর পোড়া পেটের দায়ে সেটুকু খুঁটে খেতেও হয় বাসনাময়ীকে।

এমনি করেই বেশ কটা দিন কেটে গেলো ।

বাসনাময়ী ক্রমেই যেন ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো গানাবাবুর বিরাট প্রাসাদের এই নিভৃত নির্জন কোণটার সঙ্গে। তার কানে আসে প্রহরে-প্রহরে ঘড়ির ঘণ্টা, সন্ধ্যায় অদ্ভুত গানের সুর, বাঈজীর নাচের ঘুঙুরের আওয়াজ ।

আর সকাল দুপুর রাত্রে নিয়মমতো 'ছোলা বুটে'র বরাদ্দ লোহার খাঁচার পাখিটার জন্যে ।

তবে একদিন সেই প্রথম দিনের দাসী এসে হাজির হলো বাসনাময়ীর সামনে নতুন খবর নিয়ে। তার হাতে নতুন জামা শাড়ি। বললো, ওঠো গো ঠাকরুণ, এগুলো সব পরে নাও। বাবুর বাগানবাড়িতে বেড়াতে যেতে হবে।

৫৬

বিন্দু আর গোবিন্দ ত্রিবেণী হয়ে নৌকোয় কলকাতায় চলে যাবার কয়েক-দিন পরেই ত্রিবেণীতে এসে বসলো সতীনাথ ।

বাড়ি ঘরদোরের ভার বংশীর উপরেই দিয়ে এলো। সঙ্গে আনলো সামান্য কিছু জামা-কাপড় বিছানা আর কয়েকটা টাকা ।

চেষ্টাচরিত্র করে ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে একখানা ঘরও পেলো সতীনাথ। বাড়িটা একটি ব্যবসায়ীর। ধানের ব্যবসা তার। নৌকো করে ধান চালান দেয় কলকাতায়। সতীনাথ ভাবলো, ভালোই হলো। কলকাতার খবরাখবর পাওয়ার সুবিধেই হবে ।

আর ব্যবসায়ী নিমাইচরণ বণিক ভাবলেন, লোকটা ইংরেজী জানে, কাজেই তার ছেলেদুটোর পেটের মধ্যে যদি একটু-আধটু ইংরেজী ভাষা হ্যাট-ম্যাট-ক্যাট ঢুকিয়ে দিতে পারে কোনোরকমে তাহলে ভবিষ্যতে তার ব্যবসার দিকে ভালোই হবে। ইংরেজের রাজত্ব যখন তখন তাদের ভাষাটা একটু রপ্ত করা দরকার বৈকি ।

তাই সতীনাথ থাকবার জন্যে শুধু একখানা ঘরই পেলো না, মাস মাহিনাও ধার্য হলো পাঁচ টাকা করে। সতীনাথ নিজে রেঁধে খাওয়ারই ব্যবস্থা করলো। ক্রমে সতীনাথ ত্রিবেণীতে পরিচিত হলো: মাস্টার ।

ত্রিবেণী বেশ একটা বড়োই গঞ্জ। লোকজনের বসতিও মন্দ নয়। অনেক গোলা গদি আড়ত হোটেল দোকানপাট। লোকের হাতে পয়সাও আছে। তাছাড়া ত্রিবেণীতে যেমন মদ আর মেয়েমানুষের অভাব নেই,

তেমনি সাধু সন্ন্যাসী আর মন্দির মঠেরও প্রাচুর্য কম নেই। যার যেমন মতি-গতি সে সেই পথেই এগুতে পারে, বাধা নেই। বিশেষ করে লোকের হাতেও যখন পয়সার অভাব নেই তেমন।

তাই গঞ্জেই হাতের কাছে একটা ইংরেজী মাস্টারকে পেয়ে অনেকেরই বাসনা হলো তাদের ছেলেদের মগজেও ঐ বিদ্যে একটু-আধটু ঢুকিয়ে দেবার। তাই ক্রমেই সতীনাথের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগলো। শেষে একটা বড়ো চালাঘরেরও ব্যবস্থা করতে হলো তাকে।

সতীনাথ ছাত্রদের শুধু কটা ইংরেজী বুলি শিখিয়েই ক্ষান্ত হলো না। ইংরেজদের আদবকায়দা শিক্ষাদীক্ষার গল্পও বলতে লাগলো সে ছাত্রদের কাছে। বিশেষ করে দেশের মিথ্যা কুসংস্কারগুলো কীভাবে মানুষের ক্ষতি করছে গল্পচ্ছলে তাদের বোঝাতে লাগলো সতীনাথ। অন্যায় বহুবিবাহ ভয়াবহ সতীদাহপ্রথার ব্যাপারগুলো অবাক হয়ে শুনতে লাগলো ছাত্ররা তাদের মাস্টর-এর কাছে।

অর্থাৎ সতীনাথ তার মনের মতো কাজ পেলো খুঁজে। বুঝলো ঠিক পথেই চলছে সে। কথায় আছে, কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁশ-ট্যাঁশ। এই সব কাঁচা কচিদের সজাগ করে তুলতে হবে। এরাই জাতির ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ। যদি দেশের কিছু ভালো করতে পারে, এরাই পারবে।

তাছাড়া সতীনাথ নৌকোর মাঝিদের দিয়ে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর থেকে সংবাদপত্র আনাতে লাগলো। বিশেষ করে শ্রীরামপুর থেকে খৃীষ্টান মিশনারীদের প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন', ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'। সেগুলো সতীনাথ তার ছাত্রদের কাছে পড়ে শোনাতে লাগলো। তাদের শোনালো হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক সীমা, দেশের বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার বিবরণ, বাংলাদেশের বৃক্ষলতার কথা, নতুন বাষ্পীয় পোতের বিবরণ, বিখ্যাত পণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুর খবর, দেশীয় লোকের নানারকমের পরোপকারের কথা—আরো কত কি।

আর বিকেলবেলায় সতীনাথ একলা গিয়ে বসতো গঙ্গার তীরে এক নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে। বসে বসে গঙ্গার সোনালী ঢেউয়ের খেলা দেখতো, পালতোলা নৌকোর চলাচল দেখতো আর মনে মনে ভাবতো—এই মা গঙ্গা আসছেন কতদূর থেকে। সেই হিমালয় থেকে। তারপর কতো দেশকে উর্বর করে সমৃদ্ধ করে এসেছেন এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে। মিশেছেন যমুনা সরস্বতীর সঙ্গে তারপর আবার এগিয়ে চলেছেন শ্রীরামপুরের দিকে। তাঁর পূর্বতীরেই

দেখা দিচ্ছে জ্ঞানের আলো। তারপর আরো বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা দক্ষিণ দিকে—দাক্ষিণ্যে তাঁর দুকূল প্লাবিত। শেষে সেই সুতোনুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরে—শিক্ষা-অশিক্ষা, পাপ-পুণ্য, ত্যাগ-লালসা, শাসন-শোষনের মহাতীর্থে। অবশেষে মিশে গেছেন মহাসাগরের সঙ্গে। বুঝি এগিয়ে গেছেন বিদেশী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বরণ করে আনবার জন্যে। সে সভ্যতার জোয়ারে সারা বাংলা শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হতে চলেছে—ক্রমেই হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে সতীনাথ তন্ময় হয়ে যায়। মন তার কখন যেন ভেসে যায় শ্রীরামপুরের শহরে, সুতোনুটি কলকাতার পথে পথে।

না, দেশকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা সে যেমন করেই হোক। জাত মান ধর্ম যদি ত্যাগ করতে হয়, সে-ও ভালো। সে মানুষের জন্যেই তৈরী। দেশের জন্যেও। দেশের কাছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ। এই দেশেরই তো ছেলে সে। এই বাংলা মায়েরই তো ছেলে সে। মাকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে হবে। হ্যাঁ, করতেই হবে।

—বাবু, আপনি এখানে বসে?

সতীনাথ চমকে চেয়ে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে গোপীচরণ। বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জের সেই হাতকাটা গোমস্তা। দেখলো, তার একটা হাতেই অনেকগুলো জিনিস।

—আপনি?—সতীনাথ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গোপীচরণ। কত্তা গঙ্গাযাত্রায় এসেছিলেন, আজ দুপুরে তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেচে।

—সে কি!—সতীনাথ উঠে দাঁড়ালো: লোহারাম বাঁড়ুজ্জে দেহত্যাগ করেচেন? কেন, তিনি তো সেরেই উঠেছিলেন শুনেছিলাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—গোপীচরণ বললো, কত্তা ভালোই হচ্চিলেন। তবে কিছুদিন পরে আবার বুকে সর্দিকাশি দেখা দেয়। সেই সঙ্গে জ্বরও। কোবরেজমশায় নাড়ি টিপে বুক পরীক্ষা করে বললেন, আর আশা নেই। তাই তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করাতে আনা হয়েছিলো।

সতীনাথ বললো, কোথায় তিনি?

গোপীচরণ বললো, ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে বড়ো বটগাছটার নীচেয়।

সতীনাথ বললো, তা আমি তো কিছুই জানতে পারিনি। কদিন আগে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে?

—এই দু'দিন হলো—গোপীচরণ বললো, তা কত্তা খুব তাড়াতাড়ি পাট হয়েচেন। ভাগ্যবান মানুষ!

—হুঁ।—সতীনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, ওঁকে এই বৃদ্ধবয়সে এই কষ্টটা না দিলেই হতো না? না, নিজের ভিটেতে মারা গেলে স্বর্গের পথটা বন্ধ হয়ে যেতো তাঁর?

শুনে গোপীচরণ বললো, সে সব জ্ঞান কি আমাদের আছে? গিন্নীমার ইচ্ছে, কত্তারও। সেজন্যেই তো। তাছাড়া—

গোপীচরণ থামলো।

—তাছাড়া কি?—সতীনাথ উৎসুক হলো জানতে।

গোপীচরণ বললো তাছাড়া গিন্নীমা 'সতী' হবেন বলেচেন।

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সতীনাথ বিরক্ত হয়েই বললো, আপনারা কি জানেন না ইংরেজের রাজত্বে এসব বে-আইনী হতে চলেচে? তাছাড়া কাউকে এভাবে জোর করে পুড়িয়ে মারা পাপ।

এবার গোপীচরণ অবাক হলো : জোর করে কি মশায়? গিন্নীমা নিজের ইচ্ছেতেই সতী হচ্চেন। এমন কি আমাদের ছোটঠাকরুণও তাই শুনে সতী হবার জন্যে বায়না ধরেচেন!

—ছোটঠাকরুণ কে?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো।

—সে আর বলবেন না!—গোপীচরণ বললো, কত্তা বুড়োবয়েসে ব্রাহ্মণের এক কাঁচ কুলীনকন্যার কুলরক্ষা করে বাড়িতেই এনে রেখেছিলেন!

সতীনাথ অবাক হয়ে বললো, তা মেয়েটির বুঝি কেউ ছিলো না?

—আজ্ঞে সে অনেক কথা—গোপীচরণ বললো, ছোটঠাকরুণের বাপ হচ্চেন ফুলপুরের শ্রীধর চাটুজ্জে মশায়—

—এ্যাঁ! বলেন কি?—সতীনাথ আঁতকে উঠলো।

দেখে গোপীচরণও আশ্চর্য হলো : আপনি অমন করে উঠলেন যে?

সতীনাথ বললো, শ্রীধর চাটুজ্জে আমার মেসোমশায় যে!

—তাই নাকি?—গোপীচরণ বললো, তবে তো আপনি এঁদের আত্মীয়ই। তবে কিনা—গোপীচরণ একটু থেমে বললো, কিছু মনে করবেন না, শ্রীধর চাটুজ্জে কোনোদিনই তাঁর এই মেয়ের খবরাখবর নেননি। এবং মেয়েটি তাঁর, যেমন কুলীনদের হয়ে থাকে, মামার বাড়িতেই মানুষ হয় মানিকপুরের

বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে। আমি সে বাড়িতে কত্তার সঙ্গে গেছলামও। সেখানে গিয়ে শুনলাম বেণীমাধবের স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন। তাঁর বাক্যি-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ছোটঠাকরুণের মা গলায় দাঁড় দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আর মেয়েটিকে বিদেয় করবার জন্যেই আমাদের বুড়ো কত্তার হাতে সঁপে দিয়ে বেশ কিছু টাকাও আমাদের কত্তার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন ঐ বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জে।

গোপীচরণের কাছে সব শুনে সতীনাথ রাগে ঘৃণায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে আর যেন কথা বেরুলো না। ছি ছিঃ, এরা মানুষ, না পিশাচ! একটা কচি মেয়েকে শ্মশানের মড়ার হাতে গছিয়ে দিতে লজ্জা করলো না? বিবেকে একটু বাধলো না? বলিহারি যাই বৃদ্ধ লোহারাম বাঁড়ুজ্জেকেও। একটা নাতনি কেন, নাতনিরও নাতনির বয়সী মেয়েকেও বিয়ে করতে সাধ যায়? কামুক, কুলাঙ্গার! আর মেসোমশায়? তিনিও? তাঁকে তো সৎ বলেই জানতো সতীনাথ। মেয়ে বৌকে যদি না পুষতে পারা যায় তবে বিয়ে করা কেন? কুলরক্ষা করতে, না, মজা লুটতে!···এই ধর্ম? হিন্দুধর্ম! এমন ধর্ম থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি?

ব্রাহ্মণসন্তান সতীনাথের মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো।

গোপীচরণ দেখলো, সতীনাথ রাগের চোটে আর কথা বলছে না। গুম হয়ে আছে। রাগটা কাদের উপর, তাও বুঝতে তার দেরি হলো না। তাই বললো, তা মানিকপুরের বেণীমাধব বাঁড়ুজ্জেও শাস্তি পেয়েচেন। মাহেশে স্নানযাত্রা দেখতে গিয়ে তাঁর সেই মুখরা স্ত্রী নাকি কার সঙ্গে পালিয়ে গেচে। বুদ্ধের যুবতী ভার্যাদের ঐরকমই রীতি! বলেই গোপীচরণের খেয়াল হলো, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। তার অতিবৃদ্ধ কর্তার তো একেবারে কিশোরী ভার্যা। আবার ভার্যাটি এই ভদ্রলোকের দূরসম্পর্কের আত্মীয়াও। তাই তাড়াতাড়ি গোপীচরণ বললো, অবশ্য আমাদের ছোটঠাকরুণের কথাই আলাদা। রূপেও যেমন, গুণেও তেমনি।

সতীনাথ সেকথা কানে না তুলে বললো, চলুন, আপনার কর্তাকে একবার দেখে আসিগে।

—চলুন।—গোপীচরণ সতীনাথকে নিয়ে চললো।

পথে যেতে যেতে সতীনাথের হঠাৎ খেয়াল হতেই জিগ্যেস করলো, আচ্ছা, বাঁড়ুজ্জেমশায় তাঁর জামাইয়ের খবরটা পেয়েছিলেন?

গোপীচরণ বললো, ঠিক বলতে পারিনে। তবে গিন্নীমা জেনেছিলেন এবং বিন্দু দিদিমণি খুব কান্নাকাটি করায় তিনি তাকে আমাদের হারান মণ্ডলের গরুর গাড়িতে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়েও দিয়েচেন।

—সেখানে গিয়ে কি সুবিধে হবে ?

—তা ঠিক বলতে পারিনে।—গোপীচরণ বললো, হয়তো শ্বশুরবাড়ি থেকে কাউকে নিয়ে কলকাতাতেও যেতে পারে। আমাদের বিন্দু দিদিমণি সেদিক দিয়ে খুব শক্ত।

শুনে সতীনাথ যেন নিজের মনেই বললো, কলকাতায় গিয়ে কোনো লাভ হবে না বলেই মনে হয়। লোকটার মদ-মেয়েমানুষের উপর ঝোঁক কিনা। তা দেখুন যদি নিজের অদৃষ্ট ফেরাতে পারেন।

গোপীচরণের সঙ্গে কিছুদূর এসেই সতীনাথ দেখতে পেলো একটা বড়ো বটগাছের কাছে গঙ্গার জলে মাথা দিয়ে লোহারাম বাঁড়ুজ্জে শেষনিদ্রায় নিদ্রীত। তাঁর আশেপাশে গাঁয়েরই কয়েকজন লোক।

তাদের মুখেই সতীনাথ শুনলো, লোহারাম বাড়ুজ্জের শেষ অবস্থা দেখেই তারা তাঁকে বাঁশের মাচায় করে নিয়ে এসেছে ত্রিবেণীর ঘাটে। ভেবেছিলো পথেই মারা যাবেন কত্তামশায়, সজ্ঞানে আর গঙ্গালাভ করা হবে না। তবে ভাগ্যবান পুরুষ, তাই সজ্ঞানেই গঙ্গার তীরে এসে পেঁছুলেন তো বটেই—বরং দেখা গেলো অবস্থা বুঝি একটু ভালোর দিকেই। দেখে সবাই চিন্তিত হয়েই পড়লো। এভাবে ভালোর দিকে যাওয়াটা তো ভালো নয়। গঙ্গাযাত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষেধ আছে শাস্তরে। তাতে সংসারের অমঙ্গল হয়। কাজেই কাল বিকেল থেকেই কত্তামশায়কে বারেবারে বুকে পিঠে তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করাতে হয়েছে সারারাত ধরে। তাছাড়া হরদম টক দই কলা ডাবের জল চিনির জল সব খাওয়াতে হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি পাট হন। শেষে মা গঙ্গা মুখ তুলে চাইলেন, এই কিছুক্ষণ আগে কত্তামশায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেচেন।

—মানে বেঁচে গেচেন, আপনাদেরও বাঁচিয়েচেন।—সতীনাথ ঠোঁট চেপে বললো।

একজন তার জবাব দিলো : তা আর কী করা যাবে ? শাস্তরে যা আছে তা তো মানতেই হবে। কত্তাকে নইলে দানোয় পাবে যে।

কর্তা লোহারাম বাঁড়ুজ্জেকে দানোয় না পেলেও মারা যাবার আগে যে আরো তিনটি স্ত্রীরত্ন পেয়েছিলেন, সে খবরটা গোপীচরণ যে কারণেই হোক সতীনাথকে বলেনি, তবে কথাটা সতীনাথের কানেও এলো।

একজন বললো, কত্তার ভাগ্য ভালো। গঙ্গাযাত্রায় আসার সঙ্গেসঙ্গেই এক ব্রাহ্মণ খবর পেয়ে তাঁর তিনটে আইবুড়ো মেয়েকে আর একজন পুরুতকে সঙ্গে এনে মালাবদলের কাজটা সেরে গেচেন। মেয়ে তিনটের, যাহোক আইবুড়ো নাম ঘুচলো।

শুনে সতীনাথ অবাক হয়ে গেলো। এসব কী ব্যাপার! এটা সভ্য জগৎ, না অসভ্য জংলী হয়ে বনে বাস করছে সব! না, বনেও বোধহয় এ বীভৎসতা নেই।

এমন সময় দেখা গেলো পালকি থেকে নামছেন লোহারামের স্ত্রী বিরাজমণি আর ছোট্ট বৌ একটি—স্বর্ণমঞ্জরী।

বিরাজমণি পালকি থেকে নেমেই কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গিয়ে পড়লেন মৃত স্বামীর বুকের উপর। স্বর্ণমঞ্জরীও।

সতীনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

দেখতে লাগলো আরো অনেকেই। গঙ্গার ধারে ক্রমেই বেশ ভিড় জমে উঠলো।

পরে কখন যেন মুখেমুখে প্রচার হয়ে গেলো ও'রা এসেছেন সতী হবার জন্যে। কথাটা পাঁচ কান হতেই আরো ভিড় জমতে লাগলো।

দেখা গেলো, গোপীচরণ সব তদারক করতে খুবই ব্যস্ত। সতীনাথ গোপীচরণকে একবার সুবিধেমতো ধরে বললো, আপনি সতীদাহের ব্যাপারটা বন্ধ করুন। এটা ফাঁকা দেশাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোপীচরণ নির্লিপ্ত গলায় বললো, মাঠাকরুণ তো নিজেই উপস্থিত, আপনি গিয়ে ও'কেই বুঝিয়ে বলুন না?

—বেশ।—সতীনাথ যেন কোমর বাঁধলো, লজ্জা করে আর লাভ নেই।

গোপীচরণ না দাঁড়িয়ে চিতার জন্যে কাঠ ঘি, শেষকৃত্যের জন্যে পুজোর জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে লাগলো। পুরুতও এসে গেলো একটু পরেই। আর এলো ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে বাজনদাররা।

কান্নার আবেগটা একটু কমলে বিরাজমণি চুপ করে স্বামীর পায়ের কাছে তাঁর একখানা পা ধরে বসেছিলেন, পাশে স্বর্ণমঞ্জরী। বিরাজমণি সজলনয়নে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন স্বামীর মুখের দিকে।

সতীনাথ ধীরপায়ে এগিয়ে গেলো বিরাজমণির দিকে। কাছে এসে মৃদু গলায় বললো, দেখুন. আমার নাম সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস গৌরহাটি। আপনার ঐ সপত্নীর পিতা ফুলপুরের শ্রীধর চাটুজ্জে মশায় আমার

মেসোমশায় । আপনাদের স্বামী আমার পূর্বপরিচিত । বল্লভপুরে আপনাদের বাড়িতে আমি এক রাত্রি অবস্থান করেছি, অন্নগ্রহণও করেছি । আজ আমি আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত—

বিরাজমণি সব পরিচয় শুনে সতীনাথের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। স্বর্ণমঞ্জরীও— । তবে সতীনাথকে দেখেই সে আবার চোখ নামিয়ে নিলো । হ্যাঁ, ভদ্রলোককে দেখেছে সে আগে ।

বিরাজমণি বললেন, আপনি তবে আমার এই ছোটবোনটির জ্ঞাতিভাই, কাজেই আমারও ভাই, ছোটভাই । আপনাকে আর 'আপনি' বলবো না । বলো কি বলবে ?

সতীনাথ বললো, শুনলাম, আপনারা আপনাদের স্বামীর সঙ্গে সতী হতে এসেচেন ।

—ঠিকই শুনেচো ।—বিরাজমণি বললেন, তবে আমারই শুধু সতী হবার ইচ্চে । সন্নকে অনেক বারণ করেচি, বুঝিয়েচি অনেক, কিন্তু কিছুতেই শুনলো না, এলো আমার সঙ্গে ।

সতীনাথ বললো, কিন্তু এভাবে সতী হয়ে কী লাভ ?

বিরাজমণি বললেন, ভাই, এসব ধম্মের কথা, শাস্তরের কথা । স্বামীর সঙ্গে যেতে পারা ভাগ্যের কথা । শাঁখা সিঁদুর পরে স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে ভাই ?

সতীনাথ বললো, এটা দেশাচার ছাড়া কিছুই নয় ।

—সেটাও তো মানতে হবে ভাই ।—বিরাজমণি বললেন ।

সতীনাথ বললো, জানেন কি, অনেকে সতী হতে গিয়ে শেষে ভয় পেয়ে চিতা থেকে পালাবার চেষ্টা করায় জোর করে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েচে । আর অনেকে সমাজে আর স্থান পায়নি ।

—তাও জানি ভাই ।

কতকগুলি লোক কাছেই দাঁড়িয়ে বিরাজমণির সঙ্গে সতীনাথের কথাবার্তা শুনছিলো, তাদের মধ্যে এবার দুতিনজন আপত্তি জানালো ঃ আপনি কেন ওঁদের ভয় দেখাচ্চেন ?

সতীনাথ বললো, আমি ভয় দেখাইনি । যা ঘটে থাকে, তাই বলেচি শুধু ।

—কিন্তু এসব বলবার কি অধিকার আছে আপনার ?

—শুনলেনই তো এঁরা আমার পূর্বপরিচিত, তাই—

—না, আপনি যান এখান থেকে ।

—আপনাদের কথায় নয়।—সতীনাথ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো : আপনারা জানেন কি, ঐ ভদ্রমহিলা মৃতের প্রথমা স্ত্রী, কাজেই তিনি তবুও সতী হতে পারেন, কিন্তু ঐ বালিকাটির সতী হওয়ার ব্যাপারে শাস্ত্রেও বাধা আছে।

—কে বলেচে? আপনি বলচেন?

—শাস্ত্র বলচে।—সতীনাথ বললো, কোনো স্ত্রীলোকের শিশুসন্তান থাকলে, গর্ভবতী ঋতুমতী বা নাবালিকা হলে সে সতী হবার যোগ্য নয়।

শুনেই বিরাজমণি বললেন, বলো তো ভাই, বুঝিয়ে বলো তো এই মেয়েটাকে।—পরে স্বর্ণকে বললেন, শুনলি তো, এখন তোর এই বয়েসে সতী হওয়া শাস্তরেই মানা।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললো, কিন্তু পরাশর সংহিতায় কি আছে জানেন? মানুষের গায়ে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, যে স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে সতী হয়, সে স্ত্রীলোক সাড়ে তিন কোটি বছর সগগোবাস করে।

—আপনি দেখেচেন?—সতীনাথ প্রশ্ন করলো।

—না দেখিনি, কারণ ইহজগতেই আছি কিনা।—লোকটা বললো, তবে শাস্তরে যখন আছে—

—এ শাস্ত্র তো মানুষেরই তৈরি।

—নইলে কি বনমানুষ তৈরি করবে ভেবেচেন?

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো সবাই।

একজন সতীনাথকে দেখিয়ে বললো, লোকটা খিণ্টান নাকি?

—ব্রাহ্মণ। মুখুজ্জে ব্রাহ্মণ।—নিজের পৈতে তুলে দেখালো সতীনাথ।

—তবে ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার।

—না, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। —জবাব দিলো সতীনাথ।

অর্থাৎ পরিবেশ বেশ গরম হয়েই উঠেছিলো, এমনসময় লোকের মুখে শোনা গেলো—'সাহেব সাহেব'।

ভিড়ের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলো।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বজরা থেকে নামলেন। সঙ্গে খাতা হাতে মুন্সী, চেয়ার কাঁধে আরদালি, আর জন চারেক বন্দুক কাঁধে সেপাই। সতী হবার খবর পেয়ে হুগলী থেকে আসছেন তিনি।

এসে উপস্থিত হলেন বিরাজমণির কাছেই।

আরদালি চেয়ার পেতে দিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বসলেন।

গোপীচরণ লোকজন নিয়ে চিতা সাজাবার তদারক করছিলো, তাড়াতাড়ি

সেও এসে দাঁড়ালো। সতীনাথ তেমনিই দাঁড়িয়েছিলো। সে সাহেবকে দেখে বললো, গুড ইভনিং স্যার।

একজন গ্রাম্য নেটিভ লোকের মুখে ইংরেজী শুনে সাহেব বললেন, আপুনি ইংরাজী জানে?

—হ্যাঁ সাহেব, আমি কলকাতায় এক সাহেবের কাছে অনেকদিনই ছিলাম।

—টোবে টো ভালোই হইল!—সাহেব বললেন, হামার কোটা না বুঝিলে ইহাডের বুঝাইয়া ডিবে। রাইট?

—ইয়েস স্যার!

সাহেব এবার বিরাজমণিকে বললেন, আপুনি সাটি হইটে বাসনা করিটেছেন?

—হ্যাঁ সাহেব।—বিরাজমণি বললেন।

সাহেব বললেন; আপুনি কি জানেন, এই সাটি প্রটা উঠাইয়া ডিবার জন্য আণ্ডোলন হইটেছে ক্যালকাটায়—রাজঢানিটে?

—ইজ ইট স্যার?—সোৎসাহে জিগ্যেস করলো সতীনাথ।

—ইয়েস।—সাহেব বললেন, গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে বাবু রামমোহন রায়, দোয়ারকানাঠ টেগোর, প্রসান্নাকুমার টেগোর, মৃট্যুনজয় ভিড্যালংকার অ্যাণ্ড আদার্স আলোচনা করিটেছেন।

সাহেবের কথা শেষ হতেই বিরাজমণি বললেন, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমি অতোশতো বুঝিনে সাহেব! আমাদের ধম্মে আছে সোয়ামীর সঙ্গে চিতায় উঠতে পারা ভাগ্যের কথা। আমার শাশুড়ী দিদিশাশুড়ী মা ঠাকুমা সবাই সোয়ামীর সঙ্গে ড্যাং-ড্যাং করে সগগে যেতে পারলেন, আর আমি পারবো না কোন দুঃখে?

সাহেব বিরাজমণির একটা কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। সতীনাথকে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট ডাজ শী মীন বাই ড্যাং-ড্যাং?

সতীনাথ বললো, শী মীনস—বোল্ডলি।

—আই সি।—সাহেব বিরাজমণিকে আবার জিগ্যেস করলেন, আগুনের মডে যাইটে আপুনার ভোয় করিবে না?

—না।

—জ্বলন্ত চিটা হইটে অনেকে পলাইয়া আসে।

—জানি।

—আপুনাকে কেহ সাটি হইবার প্ররোচনা ডিয়াছে কি?

—না।

—আপনি নিজের ইচ্ছায় সাটি হইটেছেন?

—হ্যাঁ।

—এখনো বুঝিয়া ডেখুন। আমি আপনাকে রক্ষা করিটে পারি।

—দরকার হবে না সাহেব।

—টোবে ঠিক আছে।—সাহেব বললেন, কারণ আপনাদের চর্মে হাট ডিটে কুইন ভিক্টোরিয়ার বারণ আছে।

সাহেব এবার স্বর্ণমঞ্জরীকে দেখিয়ে বললেন, ঐটি আপনার ডটার—আই মীন, কন্যা আছে?

—না। আমার সতীন।

—হোয়াট। শী ইজ অলসো এ সাটি?

সতীনাথ বুঝিয়ে দিলো: শী ইজ অলসো অ্যানাদার ওয়াইফ অব দি ডেড ওল্ড ম্যান।

—হোয়াট ননসেন্স।—সাহেব আশ্চর্য হলেন: একটা বুড়া লোকের এটো ছোটা ওয়াইফ?

—হ্যাঁ স্যার, কুলীনদের মধ্যে হয়ে থাকে।

—মাই গ্যাড।—সাহেব বললেন, কিন্তু, দ্যাট গার্ল ক্যানট বী এ সাটি। ও টো সাটি হইটে পারিবে না। ও টো নাবালিকা আছে—মাইনর।

বিরাজমোহিনী বললেন, আমিও ওকে বারণ করেচি। ও শুনতে চায় না।

সাহেব তখন স্বর্ণমঞ্জরীকে ডেকে বললেন, মাই সুইট গার্ল, টুমি টো সাটি হইবে না।

স্বর্ণমঞ্জরী মুখ খুললো: হ্যাঁ হবো।

—না, হইবে না।

—হ্যাঁ হবো।—স্বর্ণমঞ্জরী জেদ করলো: তুমি আমায় সোয়ামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে নাকি?

—হ্যাঁ, যাইবে।—সাহেব বললেন, এটা বেআইনী আছে।

—ইস আর কি, আমি চেঁচাবো না!

এতক্ষণে সতীনাথ স্বর্ণমঞ্জরীর সঙ্গে কথা বললো। বললো, স্বামীর সঙ্গে প্রথম স্ত্রী সহমরণে গেলেই চলে। আর কোনো স্ত্রীর না গেলেও ক্ষতি নেই। শাস্ত্রে আছে—

—আপনি জানেন ঠিক?

—জানি।—সতীনাথ জোর গলায় বললো, মহানির্বাণতন্ত্রে আছে—মোহাদ্ভর্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী। মানে, মোহ-বশতঃ যে স্ত্রী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সে নরকগামিনী হয়।

বিরাজমণি বোঝালেন : দেখলি তো, শাস্তর-জানা ছেলে। না জেনেই কি বলছে? দেখলিনে, সাহেবের সঙ্গে কীরকম ইংরিজীতে কথা বললো?

হ্যাঁ ভদ্দরলোকটা জানে বোধহয়। সাহেবের সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে স্বর্ণ।

দেখেছে আরো অনেকেই। আগে সতীনাথের সঙ্গে যারা তর্ক করছিলো, তারাও রকমসকম দেখে একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলো। খাস সাহেবের সঙ্গে হুটপট করে কথা কওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আর ঠিক-ঠিকই বলছিলো বোধহয়, কেননা সাহেব তো চটে উঠলো না।

গোপীচরণও এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো। এবার সাহস করে সাহেবকে জিগ্যেস করলো, স্যার, চিতা?

—ইয়েস।—সাহেব বললেন, ডেড ম্যানের সহিট টাহার বড়ো স্ত্রী যাইবে। দ্যাট এলডার্লি লেডি।

তাই হলো।

দুজনকে একসঙ্গে দাহ করবার মতো চিতা তৈরি হতে লাগলো। সাহেবের নির্দেশে মুন্সী খাতা খুলে মৃতের নাম ধাম বয়েস পেশা ইত্যাদি বিবরণ লিখে নিলো।

কয়েকজন লোহারামের মরদেহকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র পরিয়ে দিলো। অনেক স্ত্রীলোকও ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছিলো। বিরাজমণি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের কাছেই, স্বর্ণকে পাশে নিয়ে। স্ত্রীলোকেরা এবার বিরাজমণিকে নিয়ে পড়লো। সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগলো, তাঁর সিঁথি থেকে সিঁদুর নিয়ে নিজেদের সিঁথিতে পরতে লাগলো। কে যেন পালকি থেকে নতুন লালপেড়ে শাড়ি ফুলের মালা চন্দন সিঁদুর নিয়ে এসে বিরাজমণির হাতে দিলো।

একটু পরে বিরাজমণি স্বর্ণকে নিয়ে সতীনাথের কাছে এগিয়ে এলেন। স্বর্ণকে বললেন, তুই এর কাছে দাঁড়া।—আর সতীনাথকে বললেন, তুমি ভাই একে একটু দেখো। আমার তো এবার যাবার সময় হলো।

সতীনাথ কিছু না বলে প্রণাম করলো বিরাজমণিকে, দেখাদেখি স্বর্ণমঞ্জরীও করলো।

বিরাজমণি তাদের আশীর্বাদ করে জিনিসগুলো নিয়ে গঙ্গার ধারে গেলেন। অনেক মেয়েও তাঁর সঙ্গে চললো। বিরাজমণি গঙ্গাস্নান করে পরনের শাড়িটা বদলে নতুন শাড়ি পরলেন। দুতিনজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী বিরাজমণির চুল আঁচড়ে দিলেন, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপে দিলেন। বিরাজমণিও উপস্থিত সধবাদের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দিলেন। এয়োতির চিহ্ন। সতীর সিঁদুর পরতে পারলে আর বিধবা হবার ভয় থাকে না। তাই বিরাজমণির হাতে সিঁদুর পরবার জন্যে মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো।

পরে ব্রাহ্মণীরা বিরাজমণির কপালে চন্দন লেপে দিলেন, গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। বিরাজমণির সারা অঙ্গে এক দিব্যরূপ দেখা দিলো।

ততক্ষণে লোহারামকে চিতায় শোয়ানো হয়েছে। তাঁর গলাতেও ফুলের মালা, কপালে চন্দনের প্রলেপ। মাথার কাছে পুরুতঠাকুর ডালায় চাল কলা পান সুপুরি সিন্দি হলুদ কপূর্র চন্দন ধূপ নারকেল ইত্যাদি সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

বিরাজমণি ধীরে ধীরে স্বামীর চিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পুরুতমশায় মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। পরে লোহারামের পুত্রসন্তান কেউ না থাকায়, আর থাকলেও উপস্থিত না থাকায় বিরাজমণিই স্বামীর মুখাগ্নি করলেন।

ক্রমে বিরাট চিতা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

এবার বিরাজমণি পুরুতমশায়ের নির্দেশমতো পূর্বমুখী হয়ে কুশ তিল আর জল হাতে দিনক্ষণ নামে গোত্র বলে সংকল্প পাঠ করলেন। পরে পুরুত-মশায় পড়াতে লাগলেন: অষ্টৌলোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্নাকাশ ভূমি জল হৃদয়াবস্থিতান্তর্যামি পুরুষ যম দিন রাত্রি সন্ধ্যা ধর্মাযূয়ং সাক্ষিণো ভবতা জ্বলচ্চিতারোহণেন ভর্তৃশরীরানুগমনমহং করিষ্যে।—হে অষ্টলোকপাল, চন্দ্র বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়-অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি সন্ধ্যা, ধর্ম—তোমরা সাক্ষী হও, আমি জ্বলন্ত চিতা আরোহণ দ্বারা পতিশরীরের অনুগমন করিতেছি।—এই বলে বিরাজমণি মন্ত্রপাঠ করে জ্বলন্ত চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। পরে সমবেত সবাইকে প্রণাম জানিয়ে ধীরস্থিরভাবে জ্বলন্ত চিতায় স্বামীর বাঁ পাশে গিয়ে শুলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসি সশব্দে বাজতে লাগলো। শুরু হলো মানুষের হৈ হৈ গোলমাল ছুটোছুটি।

এতক্ষণ স্বর্ণমঞ্জরী সতীনাথের পাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সব

দেখছিলো। আর সে থাকতে না পেরে 'ও দিদিমা গো' বলেই একবার ডুকরে কেঁদে উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো সতীনাথের পায়ের উপর।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি স্বর্ণমঞ্জরীকে পাঁজাকোলা করে তুলে ভিড়ের বাইরে ফাঁকায় এনে একটা গাছতলায় শুইয়ে ছুটে গেলো গঙ্গার ধারে। নিজের কাপড় ভিজিয়ে সেই জল নিংড়ে দিতে লাগলো স্বর্ণর চোখে মুখে কপালে।

তার কানে এসে বাজতে লাগলো ঢোলকাঁসির শব্দ। মানুষের গলার চিৎকার। হৈ হৈ।

আর সন্ধ্যার আকাশ চিতার আগুনে লাল হয়ে উঠলো।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দলবল নিয়ে উঠলেন গিয়ে তাঁর বজরায়।

৫৭

সতীনাথ আরো দুতিনবার জল এনে ভিজিয়ে দিলো স্বর্ণমঞ্জরীর মাথা গলা কপাল। কাপড়ের কোণ দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো তাকে।

এমন সময় খুঁজতে খুঁজতে গোপীচরণ এসে পড়লো সেখানেঃ আপনি এখেনে?

—হ্যাঁ।—সতীনাথ বললো, অজ্ঞান হয়ে পড়েচে, তাই ফাঁকায় এনে চোখে মুখে জল দিলাম। বেচারা!

গোপীচরণ কী যেন ভেবে বললোঃ হুঁ।

সতীনাথ বললো, এখন কী করা যায় একে নিয়ে? লোহারাম বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে এখন থাকলো কে?

গোপীচরণ অন্যমনস্ক হয়েই বললো, তাঁর বড়ো মেয়ে ইন্দুমতী আর তার সেই ছেলেটি, আপনি ও বাড়িতে থাকবার সময়েই যে জন্মেছিলো।

—আর আপনিও নিশ্চয়ই থাকবেন দেখাশোনা করবার জন্যে?—সতীনাথ জিগ্যেস করলো।

—বাধ্য হয়েই থাকতে হবে।—গোপীচরণ বললো, আর গিন্নীঠাকরুণও বলে গেচেন সেই কথাই।

সতীনাথ বললো, হ্যাঁ, এ অসময়ে ও বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। জমিজমা সম্পত্তি দেখাশোনা করবার দরকারও তো!...কিন্তু ভাবচি, এই মেয়েটির কী হবে?

—আমিও তো তাই ভাবছি।—গোপীচরণ বললো, সতী হতে এসে গাঁয়ে ফিরে গেলে লোকে না ওকে গাঁ থেকে বার করে দেয়।

—বলেন কি!—সতীনাথ ভাবিত হলো।

—হ্যাঁ বাবু। গাঁয়ে কী আর মানুষ আছে!

সতীনাথ একটু ভেবে বললো, আচ্ছা, এখানে যদি কোন সৎ গৃহস্থের বাড়িতে একে রাখা যায়? অবশ্য খরচপত্র আমিই দেবো। সেরকম ভালো পরিবার আমার জানাও আছে।

কিন্তু তাঁরাও কি এমন সতী-না-হওয়া অলক্ষুণে মেয়েছেলেকে বাড়িতে রাখতে চাইবেন!—গোপীচরণ বললো।

—আচ্ছা, তাহলে একে কলকাতায়, মানে আমি কলকাতায় যাবো ভাবছি। সেখানে গিয়ে যদি কোনো ভদ্র পরিবারে থাকে—

সতীনাথের কথাটা শুনে গোপীচরণ ভালো করেই দেখে নিলো তাকে। দেখলো চেয়ে পাশে অসাড় অজ্ঞান রূপবতী কিশোরী স্বর্ণমঞ্জরীকে। এতো ভালো করে আগে সে কোনোদিনই দেখেনি। তারপরেই তার চোখে ভেসে উঠলো ভরাযৌবনা ইন্দু। তার ছেলে। খোকন। আর, আর কর্তামশায়ের সম্পত্তি! অগাধ সম্পত্তি, জমিজমা! বিন্দুও চলে গেছে। যা মেয়ে! হয়তো সোজা কলকাতাতেই যাবে, আর আসবে না ফিরে। অর্থাৎ রাজকন্যা আর পুরো রাজত্বই হাতের মধ্যে।

গোমস্তা গোপীচরণ বেশ ভালো করে হিসাব কষে দেখলো। একদিকে ঐ সমাজে পতিতা রূপসী কিশোরী, আর তাকে নিয়ে নানা সমস্যা! আর অন্যদিকে ভরাযৌবনা নারী, নিজের ছেলে, অঢেল সম্পত্তি। আর ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত।

গোপীচরণ বেশ তাড়াতাড়িই মনস্থির করে ফেললো। বললো, তা আপনার প্রস্তাব ভালোই। তবে কথা হচ্ছে, উপস্থিত লোকেরা বাধা দিতে পারে। কাজেই তা যদি মনে করেন, তবে আর দেরি না করে আপনি একে নিয়ে আজ এখুনি কলকেতায় যাবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। লোকেরা এখন সবাই চিতার ওখানেই জড়ো হয়ে আছে। তাছাড়া এখন বেশ অন্ধকারও!

সতীনাথ দেখলো, কথাটা মন্দ নয়। আরো ভাবলো, আর ভাববারও সময় নেই। তাছাড়া স্বর্ণর জ্ঞান ফিরে এলে ঐ হয়তো আর যেতে চাইবে না। চেঁচাবে, আপত্তি করবে। আর, আর একটা আধফোটা ফুল অকালেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

—না, আর দেরি নয়। আচ্ছা, চলি।—সতীনাথ গোপীচরণকে বললো।

গোপীচরণ যেন হালকা হলো। বললো, আচ্ছা।

চলে গেলো সে চিতার কাছে।

সতীনাথ স্বর্ণমঞ্জরীকে কাঁধে তুলে নিয়ে গঙ্গার পাড় থেকে নেমে গেলো নীচের গঙ্গার কূলে, এগিয়ে চললো গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে। একটু যেতেই মনে হলো যেন একটা নৌকো বাঁধা আছে। হ্যাঁ, একটা নৌকোই।

সতীনাথ একটু এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো। না, এভাবে কাঁধে করে একটা মেয়েকে নিয়ে মাঝির সামনে দাঁড়ালে সে-ও তো হইচই করতে পারে। বরং—

এমন সময় সতীনাথের কাঁধেই নড়ে উঠলো স্বর্ণ।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি স্বর্ণকে মাটিতে নামালো। দেখলো স্বর্ণর জ্ঞান হয়েছে। বললো, আমি কোথায়? কে তুমি?

—আমি সতীনাথ।

স্বর্ণমঞ্জরী দেখলো, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকই।

—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চো? কেন নিয়ে যাচ্চো?

সতীনাথ এবার মিথ্যে কথাই বললো, তুমি সতী হওনি বলে লোকেরা তোমাকে মেরে ফেলতে এসেছিলো। সাহেব তাদের আটকে দিয়ে বললো, তুমি একে নিয়ে চলে যাও কোথাও। তাই নিয়ে যাচ্চি—

—কোথায়?

—চলো তো।—পরে জিগ্যেস করলো সতীনাথ: বল্লভপুরে যাবে?

—না।—স্বর্ণ বললো, সেখানেও লোকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আর দিদিমাও নেই—

—তবে চলো তোমাকে ভালো জায়গাতেই নিয়ে যাবো।—সতীনাথ আরো বললো, তোমার দিদিমা? তুমি ওঁকে দিদিমা বলতে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তিনিই তো আমার কাছেই রেখে গেলেন তোমাকে। বললেন, দেখো একে! শোনোনি?

—শুনিচি।

সতীনাথ এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি ঐ নৌকোর মাঝির সঙ্গে কথা বলে আসি।

বলেই সতীনাথ নৌকোর কাছে গিয়ে মাঝিকে ডাক দিলো। বেরিয়ে এলো মাঝি ছইয়ের ভেতর থেকে।

সতীনাথ বললো, আমি আর আমার স্ত্রী কলকাতায় যেতে চাই—

মাঝি বললো, এখন এই রাত্তিরে কলকেতায় তো যেতে পারবোনি বাবু। পথে অনেক বিপদ।

হঠাৎ কী মনে হলো সতীনাথের। বললো, বেশ তবে শ্রীরামপুরে চলো। সে তো কাছেই—

মাঝি একটু ভেবে বললো, যেতে পারি। তবে একটা টাকা লাগবে বাবু।

সতীনাথ নিজের ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখলো, টাকা দুইতিন মতো হবে। ভাগ্যিস সে বেরুবার সময় টাকা কটা নিয়েই বেরিয়েছিলো। বললো, তাই হবে। এই উপকারটুকু করো মাঝি।

মাঝি নৌকো থেকে বললো, আসেন তবে।

সতীনাথ এসে স্বর্ণকে নিয়ে নৌকোয় ওঠালো, পরে নিজে উঠতে যাবে, এমন সময় সে আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলো হাতকাটা গোপীচরণ নৌকোর দিকেই এগিয়ে আসছে, আর তার পেছনে আসছে ছেলে-কোলে একটি স্ত্রীলোক।

—কী ব্যাপার?

ইন্দু আর তার ছেলে নাকি? কিন্তু হঠাৎ এখানে? এ সময়ে? বাধা দিতে এলো নাকি গোপীচরণ?

স্বর্ণও দেখছিলো অবাক হয়ে। তবে তারা একটু কাছে আসতেই স্বর্ণও চেঁচিয়ে উঠলো: কালিদাসী? তুই? খোকনকে নিয়ে—কী ব্যাপার?

স্বর্ণ হুড়মুড় করে নৌকো থেকে নেমে পড়লো।

গোপীচরণ কালিদাসীকে দেখিয়ে বললো, এ ছোটঠাকরুণের খোঁজ করছিলো তাই নিয়ে এলাম এদের।

স্বর্ণ কালিদাসীর কোল থেকে নিজের কোলে টেনে নিলো খোকনকে।

কালিদাসী বললো, কী ভাগ্যি, তোমাকে পেলাম দিদিমণি। বাবু তো পাগল হয়ে গেচেন। একেবারে বদ্ধ পাগল। খোকনকে প্রায় মারতে যান। পরশু তো ওর গলা টিপে ধরেছিলেন, বলে, মেরেই ফেলবো। আমি তাড়াতাড়ি কোনোরকমে ছাড়িয়ে এনে তখনই গরুর গাড়িতে চলে আসি বল্লভপুরে। সেখানে দিদিমণির কাছে সব শুনে ঐ গাড়িতেই ছুটে এসেচি ত্রিবেণীতে।

এখন যা হয় করো বাপু। তুমিই বলেছিলে দরকার বুঝলে ওকে দিয়ে যেতে তোমার কাছে। তাই এলাম ছুটে।

স্বর্ণ বললো খোকনকে চুমু খেয়ে ঃ ভালোই করেচিস। আমি একে নিয়ে যাচ্চি। মানুষ করতে হবে তো! তুই কিন্তু মামাকে দেখিস।

—তা তো দেখতেই হবে। অমন অবস্থায় আর ছেড়ে যাবো কোথায়?—তারপর জিগ্যেস করলো ঃ তা তুমি চললে কোথায়?

—কলকাতায়।

সতীনাথ বললো, হ্যাঁ, ওকে মানুষ করতে হবে। ওরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের ভরসা।—স্বর্ণকে বললো, চলো ওঠো। আর দেরি নয়। আচ্ছা চলি!—আবার বিদায় নিলো গোপীচরণের কাছে।

সতীনাথ নৌকোয় উঠলেই নৌকো ছেড়ে দিলো মাঝি। কালিদাসীর দুচোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়লো।

গোপীচরণ আর দাঁড়ালো না। কালিদাসীকে বললো, এসো আমার সঙ্গে।

৫৮

গঙ্গায় তখন ভাঁটা।

কাজেই নৌকো তরতর করে এগিয়ে চললো গঙ্গার পশ্চিম তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে শ্রীরামপুর মুখো।

ছইয়ের মধ্যে খোকনকে কোলে নিয়ে বসেছিলো স্বর্ণ।

চুল এলোমেলো। সিঁথিতে তখনও সিঁদুর। চোখদুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে আছে। পরনে কাল থেকে পরা নীলাম্বরী শাড়ি। হাতে চুড়ি নোয়া শাঁখা। আলতায় পা রাঙানো। খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে।

সতীনাথ জিগ্যেস করলো, তোমার নাম কি?

—সন্ন।—বললো স্বর্ণ।

—পুরো নামটা কি?

—সন্নমনজরি।

—বাঃ, বেশ নাম তো!—বলেই বললো সতীনাথ ঃ আমরা কোথায় যাচ্চি জানো তো?

—কলকেতায় ?

—না, শ্রীরামপুরে ঃ

স্বর্ণ কিছু জিগ্যেস করলো না। তার দিদিমা যখন ভদ্রলোকটাকে বিশ্বাস করে তার ভার দিয়ে গেছে, তখন তার আর ভাববার কি আছে? বিশেষ করে লোকেদের হাত থেকেও ভদ্রলোক তাকে বাঁচিয়েছে।

সতীনাথ জিগ্যেস করলো ঃ তুমি আমার কাছেই থাকবে তো?

—আর কোথায় যাবো?

—তুমি লেখাপড়া শিখবে?

—খুব তো শক্ত?

—না, শক্ত নয়।

—তবে শিখবো।—বলেই বললো স্বর্ণ ঃ আমার এই ভাইটাকেও শেখাতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই। ওরাই তো আমাদের ভরসা।—সতীনাথ জিগ্যেস করলো ঃ ওটি তোমার কিরকম ভাই?

—মামাতো ভাই।—স্বর্ণ বললো, মামা-ই আমাকে মানুষ করেচে, আমার বিয়ে দিয়েচে। মামা-মামীরা মাহেশে গেছলো চানযাত্রা দেখতে। সেখানে মামী হারিয়ে যাওয়ায় মামা পাগলের মতো হয়ে গেছলো, এখন তো শুনলাম—

—হুঁ। শুনলাম তাই।—বলেই সতীনাথ এবার আর এক প্রশ্ন করে বসলো ঃ তুমি তো এখন বিধবা। তা সারা জীবন এইভাবে কাটাতে পারবে?

—পারতেই হবে।

—কেন হবে?

—সবাই তো কাটায়। মাছ খায় না, শাঁখা-সিঁদুর পরে না, থান কাপড় পরে।

—কিন্তু এতো কম বয়েসে?

—ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই।

সতীনাথ বললো, বন্ধু লোহারাম বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে না হতো তবে নিশ্চয়ই তোমার এ দশা হতো না।

—বলা যায় না।—স্বর্ণ বললো ঃ মানুষের আয়ুর কথা বলা যায়? অল্প-বয়েসের সোয়ামী কি কারোর মারা যায় না?

শুনে অবাক হলো সতীনাথ। বুঝলো, মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

বললো, সত্যিই, ঠিক বলেচো তুমি।

স্বর্ণ সে কথার জবাব না দিয়ে বললো, শিরামপুরে গিয়ে আমাকে একখানা থান ধুতি কিনে দেবেন, পরবো। আর শাঁখা ভেঙে সিঁদুর তুলে ফেলে গঙ্গায় চান করতে হবে।

সতীনাথ বললো, গঙ্গায় না হয় স্নান করো! তবে শাঁখা সিঁদুর যেমন আছে তেমনিই থাক।

—কেন?—অবাক হলো স্বর্ণ।

—নইলে বিশ্রী দেখাবে তোমাকে।

—তা দেখাকগে। আমার আর সাজবার কি দরকার?

সতীনাথ হঠাৎ জিগ্যেস করে বসলো, আচ্ছা স্বর্ণ, আবার তো তোমার বিয়ে হতে পারে—

—ছি, ছি, কী যে বলেন!—স্বর্ণ জিব কাটলো: অমন কথা মুখে আনতে নেই। বিধবার আবার বিয়ে হয় নাকি?

—হয়।—সতীনাথ বললো, খ্রীষ্টানদের মধ্যে হয়, মুসলমানদেরও।

—আমি তো আর খিষ্টান বা মুসুলমানও নই।

—তা খ্রীষ্টান হলেই বা ক্ষতি কি?—সতীনাথ সোৎসাহেই বললো, যে হিন্দুধর্ম জলজ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে, মেয়েমানুষকে আজীবন দুঃখ সইতে বলে, পুরুষরা দশ-বিশটা বিয়ে করলেও মেয়েদের মুখ বুজে থাকতে বলে—এমন ধর্মে বিশ্বাস করো?

স্বর্ণ সহজ গলায় বললো, করি বৈকি। হিন্দুর মেয়ে তো!

শুনে সতীনাথ কেমন যেন নিভে গেলো। বললো, আচ্ছা, কথাটা আমার ভেবে দেখো।

—দেখবো।—স্বর্ণ আশ্বাস দিলো: এখন আপনি একটু ঘুমোন।

ঘুমোবে কি সতীনাথ, তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। বুঝি লোহারাম বাঁড়ুজ্জের চিতার আগুন। একটা লোক মরে গেলো, তার সঙ্গে আরো দশটাকে পুড়িয়ে মারতে হবে? এভাবে পুড়িয়ে মারবার জন্যেই কি দশ-বিশটা বিয়ে করা? বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন দেবীবর, তোমরা কি আর-জন্মে রাক্ষস ছিলে? তাই বুঝি মেয়েমানুষদের চিবিয়ে খাবার জন্যে এদেশে এলে? সাহেব বললেন, শিগগীর নাকি সতীপ্রথা বেআইনী হবে। তাই হোক। একটু তাড়াতাড়ি হোক। সেইসঙ্গে বেআইনী হোক এই কুলীনপ্রথা। আর, আর চালু হোক বিধবা বিয়ে।

সতীনাথ, স্বর্ণমঞ্জরী আর তার ছোট ভাইটির দিকে চেয়ে দেখলো।

ভাবলো, এখন তার ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব। এখন সে শুধু একা নয়, আর দুজনের ভাবনাও তার উপর। আর শুধু পেটে খাওয়া আর পরনের ভাবনাও নয়, তাদের মানুষ করে তোলার দায়িত্বও তারই উপর।

স্বর্ণকে আবার নতুন করে বাঁচাতে হবে। শিশুটিকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে।

কিন্তু এখন প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠবে?

একটু ভাবতেই খেয়াল হলো তার : শ্রীরামপুরে খৃষ্টান মিশনেই ওঠা যাক। সমাচার দর্পণে সে দেখেছে তার সম্পাদক যশোয়া মার্শম্যান সাহেবের স্কুল আছে ছেলেদের জন্যে। তাঁর স্ত্রী হ্যানা মার্শম্যানও মেয়েদের শিক্ষার জন্যে স্কুল করেছেন। সেখানে ভর্তি করে দেবে এদের। আর, আর যদি মার্শম্যান সাহেব দয়া করে তাকে একটা চাকরি দেন ঐ সমাচার দর্পণে কিংবা তাদের স্কুলে তবে তো কথাই নেই!

সতীনাথ আরো ভাবলো, যদি সমাচার দর্পণে কোনো কাজ পায়, যে কোনো কাজ পায়, তবেই তার সব আশা পূর্ণ হবে। সাহেবকে মনের কথা খুলে বলবে সে।

বাবু রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছেন। শিগগীর হয়তো ঐ প্রথা বেআইনী হয়ে যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছেই শুনেছে সে।

কিন্তু এই বহুবিবাহ প্রথা? এটাও বন্ধ করতে হবে। যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে। সমাচার দর্পণে লেখালেখি করতে হবে। জনসমাজে প্রচার করতে হবে। এই প্রথার দোষ-ত্রুটি মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে হবে। দরকার হলে সে আবার কলকাতায় গিয়ে এবার রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করবে।

আইন করতে হবে, কোনো পুরুষমানুষ একটার বেশি বিয়ে করতে পারবে না। করলেই আইনের চোখে সে অপরাধী হবে। তবে হ্যাঁ, স্ত্রী যদি মারা যায়, দুরারোগ্য রোগে ভোগে, বা পাগল হয়ে যায় বা—সতীনাথ ভাবতে লাগলো—বা ভ্রষ্টা হয়ে যায়, অথবা বন্ধ্যা হয় কিংবা পালিয়ে যায়, তবে, কেবল তবেই সে পুরুষ আবার বিয়ে করতে পারবে।

আর অমন কচি মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না। সাবালিকা হলে তবে বিয়ে। ঐ সব গৌরীদান ফৌরীদান চলবে না। সব বাজে!

আর? আর, বিধবা বিবাহ? হ্যাঁ, সেটাও চলা দরকার। হিন্দুধর্মে

সেটাও চালু হওয়া দরকার। তবে সব একসঙ্গে নয়। আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে এগোতে হবে। আগে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আগে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবে, তবেই সব হবে, সব সোজা হয়ে যাবে। নইলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে। মুসলমানের রাজত্বে যেমন হিন্দুধর্মের অত্যাচারে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে, তেমনি এই ইংরেজের রাজত্বেও অনেকেই হবে খ্রীষ্টান। উপায় কি? আগে নিজের মান, জ্ঞান, পরে ধর্ম।

ধর্ম! হিন্দুধর্ম! কতকগুলো স্বার্থপর মানুষের তৈরি কলকাঠি। গোঁড়া বামুনদের চোখরাঙানি।

ভাবতে ভাবতে সতীনাথ একসময় নিজের পৈতেটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো। দারুণ আক্রোশে টেনে ধরলো সেটা। জোরে টানলো—আরো জোরে টান। শেষপর্যন্ত পট করে ছিঁড়ে গেলো পৈতেটা।

সতীনাথের দাঁত কড়মড় করতে লাগলো। ছেঁড়া পৈতেটা নিজের হাতের মধ্যে চটকাতে লাগলো। নিষ্ঠুর অত্যাচারী গোঁড়া হিন্দুধর্মটাকে বুঝি সে তার সবল মুঠোর মধ্যে ভরে পিষতে লাগলো।

হে হিন্দুধর্ম। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার দেওয়া পাথর বেঁধে ঐ কচি মেয়েটাকে ডুবতে দেবো না। ওকে টেনে তুলতেই হবে, বাঁচাতেই হবে। তোমার চোখরাঙানিতে আমিও নতজানু হবো না। বুক ফুলিয়ে চলবো। মানুষের মতো মানুষ হবো। আর যদি পারি ঐ ছেলেটাকে, ছোট ছেলেটাকে শিখিয়ে যাবো, অন্যায়কে অন্যায় বলতে ভয় পেয়ো না। কুসংস্কারকে মাথা পেতে নিয়ো না। চোখ খুলে জগৎকে দেখো। বোঝো। বিচার করো। আর অত্যাচারিত অবহেলিত যারা তাদের হাত ধরে টেনে তোলো।

সতীনাথ পাকানো পৈতের দলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো গঙ্গায়।

শ্রান্ত স্বর্ণমঞ্জরী তখন তার ভাইটিকে কোলের মধ্যে নিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

—বাবু, শ্রীরামপুর তো এসে গেলো। তা এই রাত্তিরে ডাঙায় নামা হবে, না, নৌকোতেই থাকবেন?

মাঝির ডাকে চমক ভাঙলো সতীনাথের। বললো, অ্যাঁ? হ্যাঁ, সঙ্গে ছোট ছেলে, তাছাড়া নতুন জায়গা। রাতবেরাতে আর কোথায় যাবো? তোমার নৌকোতেই থাকা যাক।

—তাই থাকেন।—মাঝি বললো, আমি তো রওনা হবো কাল জোয়ার এলে। আর ত্রিবেণী যাবার লোক যদি দু'একটা পাই তো ভালোই হবে।

খানিক পরেই নৌকো এসে ভিড়লো শ্রীরামপুরের ঘাটে।

মাঝি নৌকো বাঁধলো ঘাটের ধারেই।

এবং পূবের আকাশ পরিষ্কার হতেই শ্রীরামপুরের গির্জায় বেজে উঠলো গির্জার ঘণ্টা : ঢং ঢং—ঢংঢং—

যেন ডেকে বলছে : কে তুমি? পাপী? তাপী? দুঃখী? আতুর? অবহেলিত? অত্যাচারিত? এসো তুমি এইখানে। ঈশ্বরের পুত্র তোমাদেরই জন্যে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর রক্তে তোমাদের সব পাপ তাপ দুঃখ দুর্দশা ধুয়ে যাক। এসো তুমি।

সতীনাথ খোকনকে কোলে নিয়ে স্বর্ণমঞ্জরীর হাতখানা ধরে বললো, চলো যাই।

নৌকো থেকে নেমে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো।

কিন্তু ওরা কেউই জানলো না, জোয়ারের জলে একটা মৃতদেহ রিষড়া থেকে ভাসতে ভাসতে এসে কাল থেকে ঐ ঘাটের নৌকোটার কাছেই একটা বাঁশের সঙ্গে আটকে আছে।

বাসনাময়ীর মৃতদেহ।

বাসনাময়ীর মরদেহ কি স্বর্ণর কাছে তার অপরাধের জন্যে মার্জনা চাইতে এসেছিলো? আর সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও? তার খোকনকে বুকে তুলে নেবার জন্যে? কে জানে।

৫৯

গানাবাবুর দু'তিনজন মোসাহেব বজরা নিয়েই বেরিয়েছিলো রিষড়ার গঙ্গার ধারে বাবুর বাগানে গিয়ে স্ফূর্তি করবার জন্যে।

গানাবাবু নিজে যাননি। কারণ, আর একটি নতুন মেয়েমানুষ ভোজ্য হিসেবে তৈরি ছিলো তাঁর প্রাসাদে। কাজেই নারীমাংসের নতুন আস্বাদন পাবার লোভে ঐ দলে তিনি যোগ দিলেন না ইচ্ছে করেই।

শুধু তাই নয়, বাসনাময়ীর পুরোন মাংস তিনি দিয়ে দিলেন তাঁর পোষা

কুকুরগুলোকে। তাঁর বজরা নিয়ে রিষড়ার বাগানে একটু স্ফূর্তি করবারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

বাবুর প্রসাদ ভাগ করে খাবার জন্যে বাসনাময়ীকে নিয়ে উঠলো সবাই বজরায়। দলের দলপতি মানিক মুখুজ্জের উৎসাহটাই সব চাইতে বেশি।

হবে না? মাহেশের স্নানযাত্রায় এই ভরাযৌবনা নারী-রত্নটিকে সে-ই তো হস্তগত করে বাবুর পায়ে অর্ঘ দিয়েছিলো। আর সেই থেকে মনে মনে লোভও ছিলো ঐ পরম বস্তুটির উপর। তবে সাহসে কুলোয়নি। তাই বজরায় সুযোগ পেয়ে বাসনাময়ীর গালদুটো টিপে দিয়েই সে সেবার দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছিলো। আর আজ বাবুর কৃপায় হাতের মধ্যে সেই মহামূল্য জিনিসটা পেয়ে হলো রীতিমতোই উৎসাহী।

রাতের অন্ধকারে কড়া পাহারায় বন্ধ পালকিতে বাসনাময়ীর মুখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো বজরায়।

বজরার মধ্যে ঢুকে বাসনাময়ী গানাবাবুকে দেখতে পেলো না। তবে দেখলো, সেজেগুজে দু-তিনজন বাবু ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে মদের আসর বসিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ রসস্থ।

বাসনাময়ী তাদের একজনকে চিনতে ভুল করলো না। মাহেশের সেই রামহরি না কে! সেই বদমায়েসটা!

বদমায়েসটাই এগিয়ে এসে বাসনাময়ীর মুখের বাঁধনটা খুলে দিয়ে তার হাতটা ধরে ফরাশে বসালো: এসো বসো প্রাণেশ্বরী।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বললো, আমার হৃদয়েশ্বরী!

তৃতীয়জন কী বলবে একটু ভেবে নিয়ে হাত মুখ চোখ ঘুরিয়ে বললো, আমার, আমার হৃদয়বল্লভী!

শুনে দ্বিতীয়জন ধমক দিলো: দূর হতভাগা! হৃদয়বল্লভ হয়, বল্লভী আবার হয় নাকি? দেখছিস না মাইরি, ওটা মেয়েছেলে, পুরোদস্তুর মেয়েছেলে! তাই না ভাই?

বাসনাময়ী কোনো উত্তর দিলো না। তবে তৃতীয়জন তেড়ে উঠলো: কেন, কেন হবে না হৃদয়বল্লভী? হ্যাঁ ভাই মানকে, যদি রাধাবল্লভী হতে পারে, তবে হৃদয়বল্লভী হবে না কেন?

মানিক বললো, তবে একে রাধাবল্লভী বলেই ডাক।

শুনেই তৃতীয়জন এগিয়ে এসে বাসনাময়ীর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো, ভাই রাধাবল্লভী। রা—ধা। রাধিকে! আমি তোমার কেষ্টঠাকুর, বুঝলে?

—আমরা সবাই তোমার কেষ্টঠাকুর।—দ্বিতীয়জন শুধরে দিলো।

বাসনাময়ী ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ করে বসলো।

মানিক আর এক ঢোঁক মদ গিলে নতুন এক সমস্যা খাড়া করলো ঃ কিন্তু রাধাবল্লভী তো নোনতা। আমাদের এ মাল কি নোনতা বলতে চাস?

দ্বিতীয়জন সায় দিলো ঃ ঠিকই তো! তবে, তবে এর নাম দেওয়া যাক রাজভোগ!

বলেই সে নিজের রসিকতায় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আলুথালু নাচতে লাগলো দুহাত উঁচিয়ে ঃ আমার রাজভোগ রে, রাজভোগ!

কিন্তু ততক্ষণে তৃতীয়জনের মুখ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেছে। মহা চিন্তিত সে। শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, হলো না।

দ্বিতীয়জন নাচ থামিয়ে বললো, কী হলো না?

তৃতীয় বললো, ও নাম ঠিক হলো না।

—কেনে?—দ্বিতীয়জন মুখবিকৃতি করলো।

—কেনে আবার?—তৃতীয়জন মুখ বেঁকিয়ে বললো, রাজার তো ভোগ করা হয়ে গেচে!

—ঠিক তো!—দ্বিতীয়জন ধপাস করে পড়লো ফরাশে।

মানিক চোখ ঘুরিয়ে বললো, তবে বলা যাক—প্রজাভোগ!

শুনেই 'বা ভাই বা ভাই' বলে আর দুজন চিৎকার করে উঠলো। আর দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা গলায় বেসুরো গেয়ে উঠলো ঃ

প্রজাভোগ খাবো মোরা
ভোগের থালা সামনে আছে।
মরি মরি সখি আমার,
এগিয়ে এসো আমার কাছে!

আবার শব্দ উঠলো ঃ বা ভাই, বা ভাই! মরে যাই, মরে যাই!

মানিক এবার বললো, যাক ভাই, এবার আমাদের প্রজাভোগকে নিয়ে একটু আনন্দ ভোগ করা যাক।—বলেই বাসনাময়ীর দিকে মদের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, ভাই প্রজাভোগ, আমার এই পানপাত্রে তোমার রসালো ঠোঁট দিয়ে একটু পেসাদ করে দাও, আমি খেয়ে সগগে চলে যাই!

বাসনাময়ী দেখলো আপত্তি করে কোনো লাভ নেই। তাই মানিকের মদের গেলাসে ঠোঁট ঠেকালো সে। মানিক সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিজের গলায় ঢেলে দিলো।

সেই দেখাদেখি আর দুজনও বাসনাময়ীর প্রসাদ-সুরা পান করে ধন্য হলো।

বাসনাময়ী দেখলো, এই সব লোকগুলোর কাছে আপত্তি করে কোনো লাভ হবে না। মানুষের চামড়ায় ঢাকা পশু এরা। সিংহের থাবার তলায় পড়েছিলো সে, এখন ক'টা শেয়ালের ধারালো দাঁতের সঙ্গে তার বোঝাপড়া!

বাসনাময়ী দেখলো মুক্তির কোনো আশাই নেই। যদিও বাবুর শক্ত দেওয়ালের বাইরে এসেছে তবু শক্ত পাহারায় আছে সে। মুক্তি, একমাত্র মুক্তি পেতে পারে সে মা গঙ্গার বুকে। কিন্তু সে ভাগ্যও বুঝি তার নেই। অথচ বজরার দুপাশের খোলা জানলা দিয়ে সে দেখলো, পাশ দিয়েই মা গঙ্গা তরতর করে বয়ে যাচ্ছেন।

বজরা তরতর করে এগিয়ে চলেছে জোয়ারের মুখে, রিষড়ার দিকে। বাইরে মাঝিরা দাঁড় ছেড়ে দিয়ে পাটাতনে শুয়ে আরাম করছে, কেউবা বজরার ছাদে। হাল ধরে বসে আছে একটা মাঝি।

বাসনাময়ী জানে বেশি মদ খেলে অজ্ঞান হয়ে যায়! তবে এদের মদ খাওয়া অভ্যেস আছে। সহজে কী আর অজ্ঞান হবে? তবে বাসনাময়ী এই বজরাতেই বন্দী হয়ে আসবার সময় দেখেছে মদ খেয়ে সেই গানাবাবু আর বাকি সবাই কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে ছিলো।

বাসনাময়ী মনে আশা নিয়ে এগিয়ে বসলো তিনজনের কাছে। বললো, আমাকে বোতল গেলাস দাও ভাই, আমি তোমাদের নিজের হাতে মদ খাইয়ে দিই। দেখো কতো মিষ্টি লাগবে।

—ঠিক ঠিক, তাই দাও।—সবাই রাজি হয়ে গেলো।

বাসনাময়ী ছোটদের বাটিতে করে দুধ খাওয়াবার মতোই বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে-ঢেলে এক-একজনকে খাইয়ে দিতে লাগলো। আর সকলেই সেটি গলাধঃকরণ করেই জড়ানো সুরে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো: মরে যাই মাইরি!

মানিক হঠাৎ বললো, প্রজাভোগ! ধ্যেৎ! রাধাবল্লভীই ভালো। একটু নোনতা চাট দরকার বৈকি! ভাই রাধাবল্লভী, তুমিও একটু একটু সোমরস চাখো না ভাই?

—চাখবো বৈকি।—বাসনাময়ী বোতল থেকে খানিকটা মদ গেলাসে ঢেলে নিজের মুখের কাছে তুলে আস্তে করে ঢেলে ফেললো নিজের বুকে। মানিকরা কেউই তাদের ঘোলাটে চোখে বাসনাময়ীর এই কারসাজি ধরতে পারলো না।

ক্রমেই মানিক আর তার দুই বন্ধুর চোখগুলো ভারি হয়ে এলো, আরো ঘোলাটে হয়ে এলো, আবছা অন্ধকার নেমে এলো চোখে। আর চোখ চেয়ে থাকতে পারলো না তারা। আর সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারলো না। যে যার তাকিয়ায় নেতিয়ে পড়লো।

বাসনাময়ী এবার এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। না, বজরার মধ্যে কেউ আর জেগে নেই। বাসনাময়ী বসে বসেই সরে আসতে লাগলো বজরার একটা জানলার কাছে। একবার ভালো করে দেখে নিলো, জানলার ফোকরটা দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে পড়তে পারবে কি না। পারবে বোধহয়; এমন তো মোটা নয় সে। বরং ছিপছিপে রোগাই।

বাসনাময়ী সভয়ে আবার দেখতে লাগলো এদিক-ওদিক।

বাইরে কালো অন্ধকার।

গঙ্গার জলও কালো। শব্দ হচ্ছে ছলছল ছলাৎ। তাকে যেন ডাকছে সে জল হাতছানি দিয়েঃ আয়, তোর কালোমুখ ঢাকবি যদি আয় নেমে আয়!

মাগো, তোমার কোলে টেনে নাও!—বাসনাময়ী মা গঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলোঃ মাগো, আমার অপবিত্র দেহকে পবিত্র করো মা! পতিতপাবনি গঙ্গে, তোমার বুকে স্থান দাও মা!

বাসনাময়ী জানলার ফোকরের মধ্যে তার দুটো পা ধীরে ধীরে বার করে দিলো। পরে একটু-একটু করে নিজের দেহটা। হ্যাঁ, গলে গেলো দেহটা। আরো একটু—আরো, আরো! বাসনাময়ী জানলার চৌকাঠ থেকে হাত ছেড়ে দিতেই টুপ করে তলিয়ে গেলো জলের মধ্যে।

বজরাটা একবার দুলে উঠলো।

দুলে উঠতেই দুটো মাঝি উঠে বসলো। কী ব্যাপার?

কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে পারলো না। কী জানি কি! আবার শুয়ে পড়লো তারা।

কিন্তু একটু পরেই একজনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। আবার উঠে বসলো সে। তাড়াতাড়ি বজরার বন্ধ দরজায় সে ধাক্কা দিতে লাগলো বাইরে থেকেঃ বাবু বাবু, ও বাবুরা সব!

দরজার ধাক্কায় মানিকেরই প্রথমে ঘুম ভাঙলো। চেঁচিয়ে বললো, কে? কে রে?

—দরজা খোলেন।

উঠে দরজা খোলার আগেই হঠাৎ খেয়াল হলো—কই, সেই মাগীটা কই? কোথায় গেলো? অথচ বজরার দরজা বন্ধ।

বুঝতে দেরি হলো না মানিকের। জানলা দিয়ে পালিয়েছে! পাখি পালিয়েছে।

—এই হারামজাদারা ওঠ!—আর দুজনের গায়ে দুটো লাথি মেরে মানিক বললো, মাগী পালিয়েচে।

বলেই বজরার দরজা খুলেই তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে দরজার নীচু চৌকাঠে খেলো ঠকাস করে এক ঠোক্কর কপালে। উঃ, করে উঠলো সে। তারপর বাইরে এসেই শুধু একবার জিগ্যেস করলো, কোথায়? কতোক্ষণ?

আর দেরি করলো না সে। ঝপাং করে লাফিয়ে পড়লো জলে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন মাঝিও।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

তাছাড়া জোয়ারের থৈ থৈ জল। বহু খুঁজেও পাওয়া গেলো না বাসনাময়ীকে। মানিক হাঁপিয়ে উঠলো। মাঝি দুজন তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গঙ্গার তীরে এনে ফেললো।

বজরাও ততক্ষণে গঙ্গার তীরে এসে থেমেছে।

৬০

ত্রিবেণী থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে গোবিন্দ সারাটা পথ গুম হয়ে রইলো।

বিন্দুর নারীরূপ দেখবার পর থেকেই গোবিন্দর বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। বেন্দা বোষ্টম বলে যে এতদিন তার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে, তাকে মনে হয়েছে তার পরম সহায়। আজ তাকে দেখে এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেলো গোবিন্দর। কেন ঐ বোষ্টম সত্যিই বেন্দা বোষ্টমই থেকে গেলো না? কেন তার সামনে খুলে গেলো ঐ বোষ্টমের ছদ্মবেশ? তাকে শাস্তি দেবার জন্যে? হ্যাঁ, তাই।

সামনেই এক সুন্দরী নারী। দুকুল ছাপানো যৌবনে ঢলঢল। অথচ শুধু চেয়ে দেখাই সার। আকুল নয়নে চেয়ে থাকা। এক অজীর্ণ রোগীর সামনে যেন থরে থরে চর্বচুষ্য-লেহ্য-পেয় সাজানো!

গোবিন্দ ভাবলো, ঐ নারীর সঙ্গ ত্যাগ করাই দরকার। তাকে দেখলেই

যেন বৃশ্চিক-জ্বালায় মনটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? যেখানে ইচ্ছে যাবে। যেদিকে দুচোখ যায় যাবে। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে, যেখানে হোক। অন্তত যেখানে কোনো মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে না।

তবে তার আগে ঐ মেয়েমানুষটিকে পেঁৗছে দেওয়া দরকার তার স্বামীর কাছে। কথা দিয়েছে সে। সেও ভরসা করে আছে তার উপর। তার উপকার করেছে সে। সে উপকারের ঋণ যতোটুকু পারা যায় শোধ করা দরকার। তারপর, তারপর যা হয় করা যাবে।

গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলো।

অবশ্য. বিন্দুও গোবিন্দর অলক্ষ্যে লক্ষ্য করলো তার ভাবান্তর। কারণটা বুঝতে তার মোটেই দেরি হলো না। মনে মনে দুঃখও পেলো বিন্দু। আহা, যে কারণেই হোক লোকটা তার পুরুষত্বের গর্ব অহংকারটুকু হারিয়ে বেঁচে মরে আছে! অমন বেঁচে থাকার চাইতে—হ্যাঁ, মরাই ভালো!

গোবিন্দর উপর কেমন যেন অনুকম্পায় বিন্দুর মনটা ভরে গেলো। গোবিন্দকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে তার সঙ্গে আজেবাজে গল্প শুরু করলো সে। কিন্তু গোবিন্দর সে সব গল্পে কোনো উৎসাহই দেখা গেলো না। যেখানে কিছু না বললে নয় সেইখানে সেইটুকু বলেই চুপ করে যায়। এমন হলে গল্প করাই দায়। একতরফায় বকবক করে বকে যাওয়া যায়, গল্প জমানো যায় না।

চন্দননগরে নৌকো থামলে আর সব যাত্রীদের সঙ্গে বিন্দুও খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করলো। কিন্তু গোবিন্দ তেমন কিছুই মুখে দিলো না। অগত্যা বিন্দুরও খাওয়া হলো না ভালো করে। একটা লোক না খেয়ে থাকবে আর সে মেয়েমানুষ তার সামনে গপগপ করে গিলবে, তা তো আর হয় না। রান্না করাই সার হলো।

—কিছুই তো খেলে না?—বিন্দু বললো।

গোবিন্দ বললো, খিদে নেই।

বিন্দু বললো, খাওয়া তো বন্ধ হলো। তা কথাও বন্ধ হয়ে গেলো নাকি?

—না তো।

—দেখচি তো তাই।

গোবিন্দ সে কথার কোনো জবাব দিলো না।

বিন্দু ভাবলো, যাকগে। ওকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। নিজের

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওকে নিজেকেই করতে হবে। সে আর কি করতে পারে। এও বুঝলো বিন্দু, তার আসল রূপটা ঐ লোকটার কাছে ধরা পরার জন্যেই ঐ ভাবান্তর। হাতের কাছে মেয়েমানুষ দেখে ঐ খোজা লোকটার মনের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। যাবারই কথা।

যাক, ওসব ভেবে লাভ নেই। এখন ভালোয়-ভালোয় স্বামীর ওখানে গিয়ে পেঁছাতে পারলে হয়। তারপর সে তার পথ দেখবে। ঐ লোকটাও নিশ্চয়ই।

তা মানিক মুখুজ্জের বাসা খুঁজে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। কলকাতায় নেমে গানাবাবুর বিরাট বাড়ির খোঁজ সহজেই পাওয়া গেলো। আর সেখানে গেটের সামনে দেখা পাওয়া গেলো এক ইয়া লম্বা চওড়া ভোজপুরী দারোয়ানের। হাতে মোটা লাঠি।

বাড়িখানা দেখেই দুজনে চমকে গেলো। কারোর সামনে যাওয়ার সাহস হলো না। কিন্তু ফিরে যাওয়াও তো চলে না। এত দূর এত কষ্ট করে এলো তবে কি জন্যে? তাই বিন্দুই আরো একটু এগিয়ে গেলো। দেখে গোবিন্দকেও এগুতে হলো।

বিন্দু চন্দননগরে একটু আড়ালে গিয়ে তার কোমরের গেঁজে থেকে বার করেছিলো স্বামীর ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা। সেটা চাদরের খুঁটে সযত্নে বেঁধে রেখেছিলো বিন্দু।

এবার সেখানা বার করে গোবিন্দর হাতে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, নামটা পড়ে ওকে জিগ্যেস করো, ভদ্দরলোকের বাসাটা কোথায়।

গোবিন্দ পড়ে দারোয়ানকে জিগ্যেস করতে গিয়ে প্রথমে ধমক খেলো : পয়লা একপাশ হোকে ঠারো।

দুজনের কেউই তার কথা বুঝলো না। তবে তার হাতের ঠেলা খেয়ে বুঝলো, একপাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই দাঁড়ালো তারা।

—কেয়া মাংতা হ্যায়?

গোবিন্দ বুঝলো কিছু হয়তো জিগ্যেস করলো। তাই কাগজটা এগিয়ে বললো, আমরা মানিক মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করতে এয়েচি।

দারোয়ান বুঝতে পেরে বললো, মানিকবাবু? উ তো হিঁয়া নাহি র'তা হ্যায়।

—কী বললে ভাই? নেই?—গোবিন্দ জিগ্যেস করলো।

দারোয়ান এবার তেড়ে এলো ঃ কেয়া, বাৎ নাহি সমঝাতা হ্যায় ? ভাগো হিঁয়াসে।

এমন সময় দেখা গেলো একটা লোক বিরাট বাড়িটা থেকে বেরুচ্ছে। দেখে বাঙ্গালী বলেই মনে হলো।

লোকটা গেটের বাইরে আসতেই দুজনেই তার কাছে এগিয়ে গেলো। তাদের দেখে, বিশেষ করে বিন্দুর বোষ্টম-বেশ আর হাতের একতারা দেখে বললো, এখানে ভিক্ষে-টিক্ষে কিছু হবে না। সরে পড়ো বাবাজী!

লোকটার মুখে সহজ বাংলা শুনে ধড়ে প্রাণ পেলো দুজনেই। বিন্দু বললো, আমরা ভিক্ষে চাইতে আসিনি ভাই।

—তবে ?

গোবিন্দ বললো, আমরা এখেনে মানিক মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করি।

লোকটা হেসে বললো, ইচ্ছে করলেই হলো ? তেনারা কি সব যা-তা লোক! খোদ বাবুর সঙ্গে ওঠাবসা করেন!

বিন্দু অধৈর্য হয়ে উঠলো ঃ ভাই, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও। তোমার ভালো হবে।

—বটে! আমার ভালো হবে, না, তোমাদের ভালো হবে ? মানে, টাকা-পয়সা চাইবে তো ?

—না ভাই, কথা দিচ্চি।—বিন্দু আবার বললো, ভাই, দয়া করে তার সঙ্গে একবার—.

—কিন্তু দেখা করাবো কি করে ?—লোকটা উদাস হয়ে বললো।

—কেন ? কেন ?

—এখানে তেনারা সব আছেন নাকি!

—কোথায় গেচেন ?

—রিষড়েয় বাবুর বাগানে ফুর্তি করতে গেচেন।

শুনেই বিন্দু হতাশ হয়ে পড়লো। পরে একটু ভেবে নিয়ে বললো, তবে, তবে তার বাসাটা কোথায় একবার দেখিয়ে দাও। তোমার এ উপকার আমি আজীবন মনে করে রাখবো।

লোকটা বললো এত কষ্ট করে আমার লাভ ?

—লাভ ?—বিন্দু বুঝলো লোকটা কী বলতে চায়। বললো, এদিকে এসো, বলচি।

একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বিন্দু তার ঝুলি থেকে চার গণ্ডা পয়সা বার করে তার হাতে দিতে গেলো ঃ ভাই, এই উপকারটা করো। তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটু মিষ্টি—

—বটে!—লোকটা ফুঁসে উঠলো ঃ তোমার ভিক্ষের পয়সা দিয়ে আমি ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাওয়াবো? আমাকে হাঘরে পেয়েচো!—বলেই কী ভেবে বললো, চলো, তোমাদের এমনিই দেখিয়ে দেবো তাঁর বাসা।

বিন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ঃ জয় রাধে। তোমার জয় হোক!

লোকটা বললো, এসো আমার সঙ্গে।

তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে, কয়েকটা ডোবার পাশ দিয়ে, একটা কাঁচা নর্দমার কাছ দিয়ে, ক'টা কাঁচা হোগলা চালের বাড়ির ধার ঘেঁসে এসে পড়লো তারা একটা পুরোন একতলা বাড়ির সামনে।

বিন্দু লোকটার দিকে চোখ রেখে সমানে তার পেছনে-পেছনে চলছিলো। মানিক মুখুজ্জের বাড়ির সামনে এসেই তার বুকখানা ধড়াস করে উঠলো। আশংকায়, উত্তেজনায়! এক অজানা কারণে?

লোকটা বললো, এবার আমি চললাম।

লোকটা আর দাঁড়ালো না সেখানে। বিন্দু এতক্ষণে পেছন ফিরে দেখলো।

কিন্তু, আশ্চর্য, গোবিন্দকে দেখতে পেলো না। কোথায় সে?

লোকটা হারিয়ে গেলো নাকি? না, পালিয়ে গেলো? কিন্তু এখন লোকটাকে খোঁজবার আর সময় নেই। খুঁজতে গিয়ে সে-ই হারিয়ে যেতে পারে। আর, আর, খোঁজবার দরকারই বা কি?

সে তার নিজের পথ দেখে নিয়েছে।

বিন্দুকেই বরং এখন এক নতুন পথে পা দিতে হবে।

৬১

বিন্দু বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। নিজের সাজের দিকেও চেয়ে দেখলো। বোষ্টমের সাজ। কাঁধে ঝুলি, হাতে একতারা, মাথায় চুড়ো, পরনে আলখাল্লা। এ সাজে লোকের বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করা চলে, হুটহুট করে বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায় না।

বিন্দু ঠিক করলো, এবার খোলস ছাড়তে হবে।

সে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। দেখলো, একটু দূরেই একটা পুকুর। তার পাশেই কোনো বাবুদের বাগান। বাগানটার খানিকটায় একটা ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং আড়াল করাও। তাছাড়া ঐদিকটায় লোকজনও নেই।

বিন্দু আর দেরি না করে বেন্দা বোষ্টমের বেশে সেই পাঁচিলের আড়ালে গেলো, এবং কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো বিন্দি বামনীর বেশে। ঝুলির মধ্যে থেকে বেরুলো বিন্দুর শাড়ি, আর ঢুকলো বেন্দার আলখাল্লা। একতারাটাও ঝুলির মধ্যে ভরে ফেললো, পরে লাগতে পারে হয়তো।

বিন্দু আগেই শুনেছে, তার স্বামী গেছে বাবুর বাগানে স্ফুর্তি করতে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। সে কথা জেনেশুনেও বিন্দু ঐ বাড়িতেই যাওয়া ঠিক করলো। ওখানে না গেলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে যাবে কোথায়? আর এ বাড়ি যখন তার স্বামীর বাড়ি, তখন তারও বাড়ি।

বিন্দু ঝুলি হাতে সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। সামনেই উঠোন। একবার দাঁড়ালো সেখানে। কাউকে দেখতে পেলো না। বাড়িটায় কেউ থাকে না নাকি?

বিন্দু আবার এগোতে যাবে ডান দিকের ঘরখানার দিকে, এমন সময় সামনে এসে পড়লো এক বুড়ী। তাকে দেখেই জিগ্যেস করলো, কে, কে তুমি?

—আমি বিন্দু।

বুড়ী বললো, তা মানিকবাবু তো বাড়ি নেই।

তখনও বিন্দু বোঝেনি, বুড়ীটা কানে কম শোনে। তবে বুড়ীর কথায় বুঝলো, বাড়িটা মানিকবাবুরই।

বিন্দু জিগ্যেস করলো, তিনি কবে আসবেন?

বুড়ী উত্তর দিলো, আমি ঝি। চাকরও আছে একটা। তবে বাবু নেই দেখে সে বাবু হাওয়া খেতে বেরিয়েচে। কথায় বলে না, বামুন গেচে ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর।

বিন্দু বললো, তোমাদের বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার যে!

বুড়ী বললো, বাবুর খাবারদাবার বড়োবাবুর বাড়ি থেকেই আসে। চাকরে নিয়ে আসে। তাছাড়া বাবুকে তো বেশির ভাগ সময় বড়োবাবুর কাছে কাছেই থাকতে হয়। বড়োবাবুর ভালোবাসার লোক কিনা—

বিন্দু এবার বুড়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, তোমাদের বাবু না আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই।

এবার বুড়ী শুনতে পেলো। শুনেই বেশ ভালো করে একবার দেখে নিলো বিন্দুকে। উহুঃ, যে সব মেয়েমানুষকে বাবু এ বাড়িতে আনে তার সঙ্গে যেন এ মেয়েমানুষটার মিল নেই। এ তো বাজারের মেয়েমানুষ বা বাঈজী নয়।

—তা তুমি বাবুর কেউ হও?—বুড়ী জিগ্যেস করলো।

বিন্দু কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, বউ হই।

— কি হও?

— বউ।

— এ্যাঁ, বলো কি?—বুড়ী অবাক হলো: তা হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে?

—দেশ থেকে।

ঠিক এমন সময় সদর দরজার কাছে লোকজনের গলা পাওয়া গেলো। মানিক মুখুজ্জে পাল্কি থেকে নেমে একটা মাঝির কাঁধে ভর দিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। কপালে ফেটি বাঁধা, বেশবাসে বিশৃঙ্খলা। খালি পা, খালি গা। কাপড়টা যেমন তেমন করে কোমরে জড়ানো। চুল উসকো-খুসকো। বাবুকে আসতে দেখেই বুড়ী ছুটে এলো। বাড়ির চাকরটাও জুটে গেলো। বিন্দু একপাশে সরে দাঁড়ালো।

মানিক দুর্বল পায়ে নিজের শোবার ঘরের সামনে আসতেই বিন্দু আর দ্বিধা না করে ইশারায় মাঝিকে সরে যেতে বলেই নিজে গিয়ে স্বামীকে ধরলো ভালো করে।

মানিক তখন প্রকৃতিস্থই, তবে দুর্বল। কাজেই বেশ সাদা চোখেই যখন দেখলো কালো কুৎসিৎ পুরুষ-মাঝির জায়গায় তার পাশে এক রূপসী যুবতী, তখন আশ্চর্যই হলো সে।

—তুমি, তুমি কে?

—আমি একটা মেয়েমানুষ।

মানিক থমকে থেমে বিন্দুর দিকে একবার চেয়ে বললো, সে তো দেখতেই পাচ্চি। তা তুমি এখানে?

—তোমাকে ভালোবাসি বলে।

—বটে!

—কেন, বিশ্বাস হচ্চে না?—স্বামীকে মৃদু ঠেললো বিন্দু: চলো, বিছানায় শোবে চলো।

মানিক বললো, চলো, কিন্তু—

মানিক মুখুজ্জের মনে সন্দেহের দোলা। এ মেয়েমানুষটা কে? বলে 'ভালবাসি'। আরো মনে হলো তার—একটা মেয়েমানুষকে ধরতে গিয়ে নাকানি-চোবানি, তবু হাতছাড়া হয়ে গেলো। অথচ বাড়িতে এসে দেখে আর একজন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। তাও আবার রূপসী, যুবতী। এমন কি হাত ফসকানো মাগীটার চাইতেও সরেস। আর বোধহয় আনকোরাও।

এ যেন মাছ ধরতে গিয়ে ছিপ থেকে ছিঁড়ে পালালো বটে মাছ, তবে আর একটা বড়ো মাছ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে ঢুকলো পাশে খালুইয়ের মধ্যে।

আশ্চর্য!

বিন্দু সযত্নে স্বামীকে খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে বুড়ীকে বললো. বাবুর জন্যে গরম দুধ নিয়ে এসো, আর মিষ্টি। আর পালকি বেয়ারাদের যেতে বলো।

বিন্দু রীতিমতো হুকুমই করলো।

আর মানিক মুখুজ্জের কানেও গেলো সে হুকুম। একটু বেসুরোও লাগলো। গানাবাবুর বাড়িতে সে হুকুম শুনতে অভ্যস্ত, মানতেও। কিন্তু এ বাড়িতে? সে-ই তো শুধু হুকুম করবার মালিক! কিন্তু—

বিন্দু মানিকের গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে, তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চুলগুলোয় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, এভাবে ফিরলে, কী হয়েছিলো?

আরে, মেয়েমানুষটা জেরাও করে যে!—তবে বিন্দুর হাতের ছোঁয়ায় মানিক মুখুজ্জে নরম হয়ে গেছলো হয়তো, তাই উত্তরও দিলো, তবে রেখে-ঢেকে: বজরা থেকে নদীতে পড়ে গেছলাম, মাঝিরা টেনে তুললো।

বিন্দুর আবার জেরা: কপালে ফেটি বাঁধা, লেগেছিলো বুঝি?

—হ্যাঁ। নৌকোয়—বলেই মানিক মুখুজ্জের নিজের কাছেই কেমন বেসুরো লাগতে লাগলো জেরার উত্তর দেওয়া। অথচ খুব শক্ত হতেও পারলো না সে। এবার সে জেরা করতে শুরু করলো:

—তা, তুমি আমাকে এতো সেবা করচো কেন?

—ভালো লাগচে।

—মানে?

—মানে, ভালোবাসার লোককে সেবা করতে ভালোই লাগে।

—বুঝলাম না কথাটা।—মানিক বললো, আমাকে তো কারোর ভালো লাগে না। তাই তো জোর খাটিয়ে ভালো লাগাবার চেষ্টা করি।

বিন্দু হেসে বললো, জোর করে ভালোবাসানো বা ভালোলাগানো যায়?

—যায় না?

—না।

—টাকা দিয়েও না?

—না।—বিন্দু বললো, ধন নয়, মন দিয়ে মন নিতে হয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষের মন।

মানিক মুখুজ্জের আবার সন্দেহ: তা আমি তো তোমাকে মন দিইনি।

—আমি দিয়েচি যে!

—তুমি কে?

এমন সময় বুড়ী গেলাসে দুধ আর রেকাবিতে মিষ্টি নিয়ে এলো।

বিন্দু দুধের গেলাস হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলো, একটু উঠে বসতে পারবে, না, শুয়ে শুয়েই খাবে?

—পারবো বোধহয় বসতে।

বিন্দু তখন স্বামীর ঘাড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে তাকে উঠিয়ে বসালো। কিন্তু দেখলো গা-টা যেন গরম।

চিন্তিত হয়ে বললো, গা-টা গরম যে?

—বোধহয় জ্বর হয়েচে।

বিন্দু বুড়ীর কানের কাছে গিয়ে বললো, এখানে কাছাকাছি কোবরেজ আছে?

—আছে।

—চাকরটাকে পাঠাও, তাঁকে ডেকে আনুক।—স্বামীকে বললো, নাও দুধটুকু খেয়ে নাও।

ইস। সব হুকুম!

তা হুকুম মানলো মানিক মুখুজ্জে।

বিন্দুর কথায় মিষ্টিগুলোও খেলো সে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মুখে ধরলো বিন্দু। ঢকঢক করে জল খেলো মানিক মুখুজ্জে। বিন্দু আলনা থেকে গামছা নিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলো তার।

মানিক মুখুজ্জে শুয়ে পড়লো আবার। এবার চোখ বুঁজে। ভাবতে লাগলো, এর আগেও তো কতো মেয়েমানুষ তার মুখে মদের গেলাস তুলে দিয়েছে, গায়ে ঢলে এসে পড়েছে, নেচে গেয়ে হেসে গড়িয়ে আদর করে গলা জড়িয়ে কতো কী করেছে, কিন্তু তবু সব তাতেই কেমন যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে—একটা ফাঁকি যেন দেখতে পেয়েছে সে সব কিছুরই ফাঁকে-ফাঁকে। একটা লেনদেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুধু।

আর এই নারী? কিছু নিতে চায় না, দিতে চায়। সেবা করতে চায়। আপন করতে চায়। যেচে এসে উপকার করতে চায়। না, কোনো মতলব আছে বলে তো মনে হয় না। মিষ্টি মুখখানায় সহজ সরল হাসি। কথাগুলো মধু-ঝরানো। বুক-জুড়োনো সেবা।

মানিক মুখুজ্জে পেলো এক নতুন আস্বাদ। এতোদিন নারীমাংসের স্বাদ-টাকেই পরম পাওয়া বলে মনে করে এসেছে, আজ নারীর লক্ষ্মীরূপ তার চোখের সামনে দেখা দিলো। তার দেহ-মন জুড়িয়ে গেলো সেবা আর পরম যত্ন পেয়ে।

কিন্তু কে এ?

মানিক মুখুজ্জে জিগ্যেস করলো, তুমি কে বললে না তো? তোমার নাম কি?

—বিন্দু।

—বিন্দু?

—হ্যাঁ, চিনবে না।—বিন্দু হেসে স্বামীর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর খোঁজ পাওয়া যায় না।

—তার মানে?

—তোমার চারপাশে কতো রূপসী সুন্দরী নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েমানুষ। তাদের মাঝে আমি তো নগণ্য! তবু তুমি আমাকে সেবা করবার সুযোগ দিলে, এতেই আমি সুখী। আর আমি তো তাদের মতো ভালোবাসার কায়দা কানুনও জানিনে।

এবার মানিক মুখুজ্জে হাসলো: ভালোবাসবার আবার কায়দা-কানুন আছে নাকি?

—হয়তো আছে এই শহর-বাজারে।

—না নেই।—মানিক মুখুজ্জে বিন্দুর হাতখানা নিয়ে নিজের কাছে টানলো। কাছে সরে এলো বিন্দু। তার হাতখানা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে মানিক মুখুজ্জে বললো, ভালোবাসা প্রাণের জিনিস। তারা আমাকে কেউই ভালোবাসে না।

—তবে?

—তারা ভালোবাসা বেচতে আসে। আমি তাই কিনে খাই বা কেড়ে খাই খিদের জ্বালায়। আজ তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিলে ভালোবাসা কেনা যায় না, বেচাও যায় না। কিন্তু বিন্দু—

—বলো?

—তুমি কে ? গেরস্তের বউ বলেই তো মনে হচ্চে ।

—ঠিকই ধরেচো ।

—তবে এখেনে কেন ? এই পাষণ্ডের ঘরে ?

—বললাম যে, তোমাকে ভালোবাসি বলে ।

—আর, আর আমি যদি তোমাকে ভালো না বাসি ?

—তুমি তো আর পাষাণ নও ।

—কে বললে নই ?

—জানি আমি ।

—জানো ?

—হ্যাঁ ।

—এসো, কাছে এসো ।

মানিক মুখুজ্জে বিন্দুকে আরো কাছে টেনে নিলো, বিন্দুর গায়ে মাথায় গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, তুমি আমার কে বিন্দু ?

—দাসী ।—বিন্দর দুচোখে জল ।

মানিক মুখুজ্জে তা দেখে বিন্দুর মাথাটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরলো ।

বিন্দু সজল গলায় বললো, যতদিন পায়ে রাখবে দাসী হয়েই থাকবো । ঠেলে দিলে মা গঙ্গা নেবেন নিশ্চয়ই তাঁর কোলে টেনে—

শুনে চমকে উঠলো মানিক মুখুজ্জে । এরা সব পারে । নিজের চোখে দেখেছে সে, জয় করতে গিয়ে হার মানতে হয়েছে । তাই হার মেনেই বুঝি জয় করতে হয় । তাই করতে হবে । আর ভুল করা নয়—

—বিন্দু ?

—কি ?

—তুমি বিশ্বাস করো, আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেচি ।

—আমার ভাগ্য ।

—অথচ তুমি পরস্ত্রী ।

বিন্দু এবার মাথা তুলে বললো, ধরো নিজেরই ।

মানিক মুখুজ্জে আশ্চর্য : মানে, তুমি আমার—

—বউ !

—বলো কি !—চমকে উঠে বসলো মানিক মুখুজ্জে ।

—হ্যাঁ, তোমাদের বংশেরই বউ । বল্লভপুরের লোহারাম বাঁড়ুজ্জের মেয়ে বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়ে ?

উত্তেজনায় মানিক মুখুজ্জের মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছে না।

—কিন্তু, তুমি, তুমি, মানে, তুমি এখানে ?

—তোমাকে পাবো বলে।

—কি করে এলে ?

রাধা যেমন কৃষ্ণের কাছে গেছলেন সব ভয় লজ্জা ঠেলে ফেলে। তেমনি করে, আর ভগবানকে ভরসা করে।

—কিন্তু ভগবান আমার মতো পাপীকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কার দিলেন যে! দেবতা, তোমার লীলা বোঝা ভার!

মানিক মুখুজ্জের চোখ দুটো ছলোছলো

সে তার দুহাতে বিন্দুকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বললো, বউ, আমার বউ!

এমন সময় দরজার কাছে বুড়ী এসে খবর দিলো : কোবরেজ এয়েচে।

বিন্দু লজ্জা পেলেও মানিক মুখুজ্জে তাকে তেমনি করেই জড়িয়ে ধরে বললো, বলগে যা, আমার রোগ সেরে গেচে। সব রোগ সেরে গেচে!

